

কলকাতা কালচার

কালপেঁচা

কলকাতা কালচার

কলকাতা কালচার

কালপেঁচা

বিহার সাহিত্য ভবন লিমিটেড
২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা-৪

প্রথম সংস্করণ ঃ শ্রাবণ ১৩৬০

প্রকাশক ঃ শ্রীশক্তিকুমার ভাদ্দ্বড়ী

বিহার সাহিত্য ভবন লিঃ

২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা-৪

প্রচ্ছদচিত্র ঃ

খালেদ চৌধ্বরী

ব্লক ও প্রচ্ছদ ম্বদ্রণ ঃ

স্ট্যান্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং

১, রমানাথ মজ্বমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বাঁধাই ঃ

বাসন্তী বাইন্ডিং ওয়ার্কস

৬১।১, মির্জাপ্বর ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ম্বদ্রাকর ঃ

শ্রীস্বখলাল চট্টোপাধ্যায়, **লোক-সেবক প্রেস**

৮৬-এ, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-১৪

চার টাকা আট আনা

বক্তব্য

'কলকাতা কালচার' সম্বন্ধে বক্তব্য বিশেষ কিছু নেই। 'কালপেঁচার নক্‌শা' যাঁরা পড়েছেন তাঁরা লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয় যে কলকতার লোকসমাজকে একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবার চেষ্টা করেছি নক্‌শাগুলির মধ্যে। গোড়া থেকেই আমার লক্ষ্য ছিল কলকাতা শহর—যে কলকাতা শহরে আমি জন্মেছি, যে কলকাতার লোকসমাজে আমি মানুষ হয়েছি এবং যে কলকাতা কালচারের আমি একজন নিম্ন-মধ্যবিত্ত উত্তরাধিকারী। ছেলেবেলা থেকে আমার অস্পষ্টভাবে মনে হয়েছে, কলকাতা শহরটাই যেন সারা বাংলাদেশ। পরে দেখেছি, কলকাতার বাইরেও বাংলাদেশ আছে। কিন্তু তবু মনে হয়েছে, বাঙালী জীবনের প্রধান রঙ্গমঞ্চ কলকাতা শহরকে বাদ দিয়ে নবযুগের বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ধারা বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়! এই রঙ্গমঞ্চের অভিনয় সাধারণ দর্শকের দৃষ্টিতে দেখেছি 'কালপেঁচার নক্‌শায়', আর তার বিচার-বিশ্লেষণ করেছি 'কলকাতা কালচারে'। দৃষ্টিভঙ্গী বদলায়নি, প্রকাশভঙ্গী বদলেছে, যতটুকু না বদলালে নয় ততটুকু। রুক্ষ-মূর্তি 'ইতিহাসের' চোখরাঙানি নেই কোথাও, যদিও 'কলকাতা কালচার' আগাগোড়া ইতিহাসের ধারা ছাড়া কিছু নয়।

'কালপেঁচার নক্‌শার' পরবর্তী স্তর 'কলকাতা কালচার'। এখনও অবশ্য লক্ষ্যে পেঁছানো সম্ভব হয়নি। 'কলকাতার ইতিহাস' লেখা বাকি আছে, লিখছিও। প্রাচীন কাহিনীর বিবরণ নয়—আধুনিক যুগের বাংলার রাজধানী কলকাতা শহরে বাঙালীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের উত্থান-পতনের, ঘাত-প্রতিঘাতের নাটকীয় কাহিনী। 'কালপেঁচার নক্‌শা'য় যার শুরু, 'কলকাতা কালচারে' যার অগ্রগতি, 'কলকাতার ইতিহাসে' হবে তার পরিণতি। মধ্যে 'কালপেঁচার দু'কলম'-কে ইন্টারল্যুড বলতে পারেন। তারপর আসল 'বঙ্গদর্শন'।

বিনয় ঘোষ
—(কালপেঁচা)

১লা শ্রাবণ, ১৩৬০
যাদবপুর কলোনি
কলিকাতা-৩২

অন্যান্য বই ঃ

কালপেঁচার নক্‌শা—৫৲
কালপেঁচার দু'কলম—৩৲
কলকাতার ইতিহাস (যন্ত্রস্থ)
বাংলার নবজাগৃতি—৩৷৹
শ্রীবৎসের নানাপ্রসঙ্গ—২৲
ইত্যাদি।

পাঠ্যবিষয়

কলকাতা কালচার (১)
কলকাতা কালচার (২)
কলকাতা কালচার (৩)
কলকাতা কালচার (৪)
কলকাতা কালচার (৫)
খানসামার কলকাতা
সম্পাদকীয়
বিজ্ঞাপনে সেকাল (১)
বিজ্ঞাপনে সেকাল (২)
জেণ্টুদের দুর্গোৎসব
পাণ্ডুলিপির রোমান্স (১)
পাণ্ডুলিপির রোমান্স (২)
গ্রন্থনগরী কলকাতা (১)
গ্রন্থনগরী কলকাতা (২)
কাগজের কলকাতা
বাংলা বইয়ের সন্ধানে
বটতলার সাহিত্য (১)
বটতলার সাহিত্য (২)
বটতলার সাহিত্য (৩)
বটতলার সাহিত্য (৪)
কালীঘাটের পট (১)
কালীঘাটের পট (২)
বটতলার যাত্রাগান
বটতলার ছবি
বটতলার থিয়েটার
বটতলার কথি

(এক)

"কলকাতা কালচার" বা "ক্যালকাটা কালচার" ব'লে একটা স্বতন্ত্র বস্তু আছে যেটা ঠিক বাঙালী কালচারও নয়, সাহেবি কালচারও নয়। একদিকে বাঙালীয়ানা, অন্যদিকে সাহেবিয়ানা, এই দুইয়ের জ্যোতিষিক টানাটানির ফলে "কলকাতা কালচারের" উৎপত্তি। "কলকাতা কালচারের" এই বৈশিষ্ট্য আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে এবং সম্প্রতি ইংরেজী শিক্ষার ব্যাপারে ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠছে। আমরা ছেলেমেয়েদের আজও ফিরিঙ্গী বা পাদ্রিদের স্কুলে পড়াবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠি। কোনদিন যাঁরা লেখাপড়া করেননি, তাঁরাও ছেলেমেয়েদের ফিরিঙ্গী মাষ্টারের কাছে ইংরেজী শিক্ষা দেবার জন্য উদ্‌গ্রীব। তাঁরা বলেনঃ "এডুকেশন দিতে হ'লে ফিরিঙ্গীদের কাছে।" তাঁদের মতে বাঙালী শিক্ষকরা নাকি 'মেথড' জানেন না। বাতিকটা কিন্তু নতুন নয়, বহু পুরাতন। সেই কলকাতা কালচারেরই একটা বিকৃত ধারা আজও প্রবল রয়েছে একশ্রেণীর বাঙালীর মধ্যে। পুরনো ইংরেজী-শিক্ষার ও সাহেবিয়ানার সেই বাতিকের কথা কিছু বলা তাই এখানে প্রয়োজন।

বাঙালী ও সাহেবের যে জ্যোতিষিক টানাটানির কথা বলেছি তার অর্থ হ'ল এই যে, সাহেবেরা শুধু যে বাঙালীদের টেনেছেন তা নয়, বাঙালীরাও সাহেবদের টেনেছেন। "টানে প্রাণ যায় রে ভেসে"র মতন বাঙালীদের প্রাণ যেমন সাহেবদের দিকে ভেসে গেছে, সাহেবদের প্রাণও ঠিক তেমনি বাঙালীদের দিকে ভেসে এসেছে। শ্রীমতী গণেশসুন্দরীর যেমন মিসেস ভন হবার ইচ্ছা হয়েছে, মিস গিলবার্টেরও তেমনি ইচ্ছা হয়েছে শ্রীমতী আনন্দময়ী হতে। দুই পক্ষের ইচ্ছার ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া নিউটনের তৃতীয় সূত্রানুসারে ইকুয়াল ও অপোজিট হবার কথা, এবং ঠিক তাই হয়েছিলও। তারই 'নীট' ফলাফলরূপে দেখা দিয়েছিল "কলকাতা কালচার"। এইটাই

হ'ল 'কলকাতা কালচারের' গোড়ার কথা। বাঙালীর সাহেবিয়ানা ও ইংরেজী শিক্ষা এবং সাহেবের বাঙালীয়ানা ও বাংলা শিক্ষা—এই নিয়ে "কলকাতা কালচার"। প্রথমে বাঙালীদের কথা বলব।

শ্রীমতী গণেশসুন্দরীর কথাটা কিন্তু মিথ্যা নয়। এক সময় কলকাতা শহর এই গণেশসুন্দরীকে নিয়ে কেঁপে উঠেছিল। এমন কোন খবরের কাগজ ছিল না যা গণেশসুন্দরীর আন্দোলনে যোগ দেয়নি। যে কলেজ স্কোয়ার অঞ্চলে এখনও প্রায়ই কিছু-না-একটা নিয়ে হৈচৈ হয়, সেই কলেজ স্কোয়ারেই একদিন গণেশসুন্দরীকে নিয়ে তুমুল কান্ড ঘটে গিয়েছিল। একালের কোন সুন্দরীকে নিয়ে এমন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়নি, এমনকি "মিস ক্যালকাটাকে" নিয়েও না। কান্ডটা কি বলছি। গণেশসুন্দরী কলকাতার কোন বাঙালী পরিবারের বিধবাকন্যা। তখনকার দিনে, বাঙালীদের যখন সাহেব হবার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠেছিল তখন পাদরি মহিলারা বাঙালীদের বাড়ীতে গিয়ে মেয়েদের পড়িয়ে বেড়াতেন, অর্থাৎ ইংরেজী শেখাতেন। এখনকার মেমসাহেব গবর্ণেসদের মতন তাঁদের বেতন খুব বেশী দিতে হ'ত না। সেকালের পাদরি মেমরা অল্প টাকাতেই বাড়ীতে গিয়ে পড়াতে রাজী হতেন, কারণ তখন ইংরেজী শেখানোটাই ছিল তাঁদের 'মিশন'। এইজন্যই গোড়ার দিকের বাঙালী-সাহেবরা সহজেই তাঁদের বাড়ীতে ডেকে মেয়েদের পড়াতে দিতেন। শ্রীমতী গণেশসুন্দরীও এইরকম একজন পাদরি মেমসাহেবের কাছে পড়তেন। এই পাদরি মেম নাকি পড়াতে পড়াতে তাঁকে প্রায়ই বলতেন যে, বিধবা হয়ে গণেশসুন্দরী অনন্ত নরকের ধারে দাঁড়িয়ে আছেন। নরকের বর্ণনাও তিনি দিতেন, কতকটা মিল্টনের মতন ক'রে। শুনতে শুনতে গণেশসুন্দরীর ভয় হ'ত এবং একদিন নরকের ভয়ে ভড়কে গিয়ে একজন পাদরি সাহেবের সঙ্গে কাউকে না ব'লে ক'য়ে তিনি গৃহত্যাগী হন। গণেশসুন্দরীরও পাদরি মেম হবার ইচ্ছা হয়। মেমসাহেবিয়ানার টানে গণেশসুন্দরীর গৃহত্যাগ নিয়ে কলকাতা শহরে হুলস্থূল প'ড়ে যায়, হাইকোর্টে মোকদ্দমা হয়, খবরের কাগজে তীব্র সমালোচনা শুরু হয়। যে পাদরি সাহেবের কাছে গণেশ-সুন্দরী আশ্রয় নিয়েছিলেন সেই ভন সাহেব একদিন বিকেলে কলেজ স্কোয়ারের এককোণে খৃষ্টধর্ম প্রচার করছিলেন। এমন সময় গণেশসুন্দরীর এক ভাই কোথা থেকে চেলাচামুন্ডা জুটিয়ে নিয়ে এসে পাদরির উপর চড়াও হলেন। কিল-চড়-ঘুষির সঙ্গে

(তখন পট্‌কা-ফট্‌কা ছিল না) ইঁটপাটকেলও চলল। পাদরি সাহেব দৌড়ে পালিয়ে গিয়ে সংস্কৃত কলেজের সামনে শ্যামাচরণ দে বিশ্বাস মশায়ের (যাঁর নামে এখন শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট হয়েছে) বাড়ীতে আশ্রয় নেন। ছেলেপিলেরা সেই বাড়ী চড়াও করবার পর বেশ খানিকটা হাতাহাতি হয়, তারপর যে যার চ'লে যায়। পরে গণেশসুন্দরী নিজেই অনুতপ্ত হয়ে অবশ্য ফিরে আসেন এবং শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁকে আশ্রয় দেন। তখন তাঁর গণেশসুন্দরী নাম বদলে মনোমোহিনী নাম রাখা হয়। এইভাবে অনেক শ্রীমান গণেশ ও শ্রীমতী গণেশসুন্দরী সাহেবিয়ানার টানে ভেসে গেছেন এবং তাঁদের মধ্যে অনেকেই ফিরে আসেননি। সুন্দরীরাই যদি এতদূর পর্যন্ত এগিয়ে থাকেন, তাহলে গণেশরা যে কি করেছেন, তা না বলাই ভাল। গণেশবাবুদের সাহেবিয়ানার কথা সকলেই জানেন ব'লে সেটা আর বললাম না।

ইংরেজী শিক্ষার কথা বলি। বাঙালী ছেলেরা প্রথমে গুরুমশায়ের কাছে বাংলা শিখত, তারপর মুন্সীর কাছে শিখত ফারসী, এবং সবার শেষে সাহেবের কাছে ইংরেজী শিখে বিদ্যাশিক্ষা শেষ করত। এই শিক্ষা সম্বন্ধে ভবানীচরণ বলেছেনঃ "সাহেবের মেজের সজ্জা এবং খানা ও টিফিন খাওয়া দেখিয়া বাবুরদিগেরো প্রায় তদনুরূপ ব্যবহার হইল, আর সাহেবের সহিত সর্বদা কথোপকথন দ্বারা গাডামী, রাসকেল, বেরিগুড, হুট, নানসেন্স, গোটে হেল এইরূপ কতকগুলিন কথা অভ্যাস করিয়া বাঙ্গালা কথায় মিশাইয়া কহিতে লাগিলেন......"। রাজনারায়ণ বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ সেকালের বাঙালীদের রচনায় ও আত্মচরিতে এই ইংরেজী শিক্ষার ভারী সব চমৎকার গল্প আছে। তার কিছু কিছু এখানে বলছি। বাঙালী বাপ-মা যাঁরা প্রাণ-যায়-তাও-স্বীকার পণ ক'রে আজও ফিরিঙ্গী ও পাদরিদের স্কুলে ছেলেমেয়েদের ইংরেজী শেখাচ্ছেন, তাঁরা বিশেষ মনোযোগ দিয়ে গল্পগুলো পড়বেন।

সেদিন এক ভদ্রলোক বলছেন (তাঁর পুত্র ফিরিঙ্গী স্কুলে পড়ছে)ঃ "আমার ছেলের স্কুলে মশায়, সিস্টাররা পিয়ানো বাজিয়ে নাচে, আর তারই সুরে তালে তালে ইংরেজী কবিতা ছেলেদের পড়ায়। আশ্চর্য মেথড মশায়, কোন বাঙালী স্কুলে পারবে করতে কোনকালে?" জানি না পারবে কি না পারবে, তবে সেকালের গুরুমশায়রা যে নামতা ও ছড়া পড়াতেন সুর ক'রে, তা বিলেতী পিয়ানো বা দেশী

ঢোল সংযোগে না হলেও, তা ঐ একই পদ্ধতি কতকটা নয় কি? তাছাড়া, ফিরিঙ্গী স্কুলে ইংরেজী শেখানোর ব্যাপারটাও এইভাবে অনেককাল ধ'রে চ'লে আসছে কলকাতায়। শুধু ফিরিঙ্গী স্কুলে নয়, সব স্কুলেই এই পদ্ধতিতে ইংরেজী শেখানো হ'ত। স্কুল পরিদর্শন করতে গেলে মাষ্টার মশায়রা জিজ্ঞাসা করতেন যে ছাত্রদের কি ঘোষাবেন। যেমন তাঁরা বলতেনঃ "গার্ডেন ঘোষাব, না স্পাইস ঘোষাব?" অর্থাৎ বাগানের বিভিন্ন সব্জীর ইংরেজী নাম মুখস্থ বলাব, না মশলার নাম? হয়ত বললেনঃ গার্ডেন ঘোষান? মাষ্টার মশায় অমনি ছাত্রদের বলতেন ঃ গার্ডেন ঘোষাও। ছাত্ররা বলত—

পম্‌কিন্ লাউকুমড়ো, কোকোম্বর শসা।
ব্রিঞ্জেল বার্তাকু, প্লোমেন চাসা॥

কখন কখন হয়ত বা খাম্বাজ রাগিণীতে, ঠুংরী তালে ইংরেজী শব্দের বাংলা অর্থ গান ক'রে বলা হ'ত। যেমন—

নাই (Nigh) কাছে, নিয়ার (Near) কাছে, নিয়রেষ্ট আর কাছে,
কট্ (Cut) কাট্ কট্ (Cot) খাট, ফলোয়িং (Following) পাছে।

এছাড়া হয়ত আরেবিয়ান নাইটের গল্প বা ঈশপের গল্প তবলা ঢোলক মন্দিরা সহকারে ইংরেজী পয়ারে লিখে বাড়ী বাড়ী গান গেয়ে শুনিয়ে বেড়ানো হ'ত। সুতরাং আমার সেই পরিচিত ভদ্রলোক ইংরেজী শেখানোর যে মেথডের কথা বলছিলেন সেটা হালের নয়, অনেককালের। কিন্তু এই পদ্ধতিতে বেশীর ভাগ বাঙালী ছেলেরা ইংরেজী শিখল কেমন? ফিরিঙ্গী স্কুলে ইংরেজী-শেখা এক বঙ্গনন্দনকে একবার এক সাহেব আমাদের রথযাত্রার রথ জিনিসটা কি জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তাতে তিনি উত্তর দিয়েছিলেনঃ "উডেন চর্চ্চ স্যার!" অর্থাৎ রথটা অনেকটা গির্জার মতন দেখতে ব'লে এই কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু সাহেব কিছু বুঝতে পারেননি। তাই তাঁকে আরও ব্যাখ্যা ক'রে ইংরেজী-শিক্ষিত বঙ্গনন্দন বললেন ঃ "থ্রি ষ্টোরিস হাই (তিনতলার মতন উঁচু), গাড আলমাইটি সিট্ আপন (অর্থাৎ উপরে জগন্নাথদেব ব'সে থাকেন), লাং লাং রোপ (লম্বা দড়ি সামনে), থৌজন্ত ম্যান ক্যাচ (হাজার লোক ধরে), পুল পুল পুল (খুব জোরে টানে), রানাওয়ে রানাওয়ে, হরি হরি বোল, হরি হরি বোল।" আর এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক এক সাহেবের ফার্মে কাজ করতেন, কিন্তু তাঁর ষ্টোর থেকে প্রায় মাল সরিয়ে ফেলতেন। একদিন সাহেব তাঁকে ডেকে বললেনঃ তুমি

ডিজঅনেষ্ট কেন? মাল চুরি করো কেন? তিনি বললেনঃ "ডে এ্যাণ্ড নাইট, টুয়েণ্টি টুয়েণ্টি ফাট্টি লীভস ফল (অর্থাৎ দুবেলা বিশটা ক'রে চল্লিশজনের পাত পড়ে), লিটল মনি (অল্প টাকা বেতন), হাউ ম্যানেজ? দেয়ারফোর ডিজঅনেষ্ট, (কি ক'রে চালাব? তাই চুরি করি)"। সাহেব প্রথম "টুয়েণ্টি টুয়েণ্টি ফাট্টি লীভস ফলের" ব্যাপারটা বুঝতে পারেননি, পরে বুঝতে পেরে বেতন বাড়িয়ে দেন। এই ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালীদের কথাবর্তার নমুনা হ'লঃ

আমার father yesterday কিছু unwell হওয়াতে Doctor-কে Call করা গেল, তিনি একটা Physic দিলেন। Physic বেশ operate করেছিল, four-five times motion হল, আজ কিছু better বোধ করছেন"।

এঁদেরই দেখাদেখি তখনকার কবিয়ালরাও ইংরেজী-বাংলা মিশিয়ে ছড়া বাঁধতে আরম্ভ করলেন। যেমন—

শ্যাম going মথুরায়,
গোপীগণ পশ্চাৎ ধায়,
বলে your অক্রুর uncle
is a great rascal

তবু তো যেকালের কথা বলছি সেকালের জীবনের মন্ত্র ছিল—

হেয়ার কল্বিন পামরশ্চ কেরি মার্শমেনস্তথা।
পঞ্চ গোরাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনং॥

একালে সেই হেয়ার, কল্বিন, পামর, কেরী বা মার্শম্যান সাহেবরা আর নেই। আছে অজ্ঞাতকুলশীল ফিরিঙ্গীরা। তাদের কাছে ইংরেজী শিখতে আরম্ভ করলে শেষ পর্যন্ত তার ফল যে কি দাঁড়াবে তা বলা কঠিন। ছেলেরা বাইবেলের গল্প জানে, মহাভারতের গল্প জানে না; ড্যাম হেল বলতে পারে, কিন্তু দশবছরেও একলাইন শুদ্ধ ইংরেজী লিখতে পারে না; হয়ত সেক্সপীয়রের নাম শেখে, কিন্তু মাইকেল মধুসূদন কে জিজ্ঞাসা করলে বলে ফিল্ম এ্যাক্টর; দু' লাইন ইংরেজী হয়ত কোন রকমে "টুয়েণ্টি লীভস ফলের" মতন লিখতে পারে, কিন্তু এক লাইন বাংলা লিখতে গেলে "ও, সিস্টার, হয়ার দাউ আর্ট" ব'লে কেঁদে ফেলে। এ শিক্ষার শেষ কোথায়? এ-কালচারের পরিণতি কি? ফিরিঙ্গীর স্কুলে দু' ঘণ্টা থেকে ইংরেজী গান শুনে বাড়ীতে ফিরে এসে যদি বাকি বাইশ ঘণ্টা "লারে লাপ্পা" শোনে, তা হ'লে ছেলের কি শিক্ষা হ'তে পারে?

(দুই)

বাঙালী-সাহেব ও সাহেব-বাঙালীরাই ক্যালকাটা কালচারের আদিস্রষ্টা, একথা আগে বলেছি। "কলকাতা কালচারের" গোড়া-পত্তনের যুগে এই ইঙ্গ-বঙ্গ ও বঙ্গ-ইঙ্গদের দান অবিস্মরণীয়। সম্প্রতি বাঙালীর সাহেবিয়ানা ও সাহেবের বাঙালীয়ানার সঙ্গে বেশ কিছুটা "হিন্দুস্থানী" উপাদান মিশে ক্যালকাটা কালচারের ভোল পাল্টে যাচ্ছে। সেকথা পরে আলোচ্য। বাঙালীর সাহেবিয়ানার কথা বলেছি। কিন্তু ক্যালকাটা কালচারের প্রথম পর্বে সাহেবের বাঙালীয়ানাটাও কম উল্লেখযোগ্য নয়। সেই কথা এখানে বলব। তা না হ'লে "দেবে আর নেবে, মিলাবে মিলিবের" গভীর তাৎপর্য আমাদের কালচারের ক্ষেত্রে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে না।

বাঙালীরাই যে ইংরেজদের জামাই হয়েছে তা নয়, ইংরেজরাও বাঙালীদের ঘরজামাই হয়েছে। জব চার্নক সাহেবকে যদি সত্যিই কলকাতা শহরের প্রতিষ্ঠাতা ব'লে স্বীকার ক'রে নেওয়া যায়, তাহ'লে স্বয়ং কলকাতার প্রতিষ্ঠাতাই যে বাঙালীর ঘরজামাই ছিলেন সেকথাও অস্বীকার করার উপায় থাকে না। এইদিক দিয়ে বিচার করলে, এ-দেশের প্রথম বড়লাট বাহাদুর ওয়ারেন হেষ্টিংসকেও আমাদের ঘরের জামাই বলতে হয়। কালচারের ক্ষেত্রেও ইংরেজদের সঙ্গে বাঙালীর এই জাতীয় শ্বশুর-জামাই-সুলভ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার ফলে বিচিত্র এক হিংটিং-ছট "কলকাতা কালচারের" সৃষ্টি হয়েছে। সেই আজব কালচারই ইংরেজোত্তর হিন্দুস্থানী যুগে বর্তমানে এক কিম্ভূতকিমাকার ইঙ্গ-বঙ্গ-বিহারী কালচারে পরিণত হচ্ছে।

কলকাতা শহরকে লর্ড ক্লাইভ বলেছিলেনঃ "One of the most wicked places in the Universe". অনেক দুঃখে ভূতের মুখ দিয়ে ভৌতিক রাজ্যের এই বর্ণনা বেরিয়েছিল। মিসেস শেরউডও "the splendid sloth and languid debauchery of European Society in those days" সম্বন্ধে লিখে গেছেন। তাছাড়া হিকির গেজেটে, ফর্বিসের "ওরিয়েণ্টাল মেময়েসে", হেবারের জার্নালে, হেষ্টিংসের ও ক্লাইভের জীবন-চরিতে, সেকালের কলকাতা শহর ও কলকাতার ইংরেজ-নবাবদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে চমৎকার

সব বর্ণনা আছে, যা পড়তে পড়তে ক্যালকাটা কালচারের উদ্‌যোগ-পর্বের রূপটা চোখের সামনে ছবির মতন ভেসে ওঠে। মনে হয়, আধুনিক কলকাতায় না জন্মে যদি সেকালের কলকাতায় জন্মাতাম! তাহ'লে কি দেখতাম? দেখতাম, একালে যাঁরা ঝুন্‌ঝুনওয়ালা ও দুন্দুভিপ্রসাদের অনুরক্ত নোকর, তাঁদের পূর্বপুরুষরাই সেকালের ইংরেজ-নবাবদের দেওয়ান, সরকার, মুন্‌শী, এমন কি হুঁকোবরদার পর্যন্ত। একালের ক্যালকাটা কালচারের যেসব ইংরেজ হবুচন্দ্ররা নায়ক, সেকালের ক্যালকাটা কালচারের প্রতিষ্ঠাতা তাঁদেরই পূর্ব-পুরুষরা। রাজনারায়ণ বসু লিখেছেনঃ "সে কালে সাহেবরা অর্ধেক হিন্দু ছিলেন। পূর্বে মুসলমানেরা এই ভারতবর্ষকে আপনাদের গৃহস্বরূপ জ্ঞান করিতেন। তাঁহাদের অনুরাগ এইখানেই বদ্ধ থাকিত। ইংরেজের আমলের প্রথম সাহেবেরা অনেক পরিমাণে ঐরূপ ছিলেন।"

এই সাহেবদের কথাই আমি বলছি, ইংরেজ আমলের প্রথম সাহেবরা। কারণ এই সাহেবরাই ক্যালকাটা কালচারের বনিয়াদ তৈরী ক'রে গেছেন, অষ্টাদশ শতাব্দী ও উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। আজকাল সাহেবরা যেমন ঘন ঘন বিলেত যান ও আসেন, তখনকার দিনে কালেভদ্রেও যাতায়াতের সুযোগ ঘটত কি-না সন্দেহ। যাঁরা যেতেন তাঁরা লুঠপাটের পালা যতদূর সম্ভব সাঙ্গ করেই একেবারে যেতেন, এবং যাঁরা আসতেন তাঁরাও এক ধনরত্নের স্বর্গে এলেন মনে ক'রে ফেরবার কথা প্রায়ই ভাবতেন না। বাধ্য হয়ে তাঁদের এদেশের লোকের সঙ্গে আত্মীয়তা করতে হ'ত। আর্যরাও তাই করেছিলেন, মুসলমানদের তাই করতে হয়েছিল, এবং ইংরেজদেরও তা না ক'রে উপায় ছিল না। কারও পক্ষেই দলে দলে পরিবার স্ত্রী-পুত্র নিয়ে আসা সম্ভব হয়নি, এদেশের বাসিন্দাদের সঙ্গেই সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়েছে। তার ফলে যা হয়েছে তা হ'ল এইঃ

আর্য+প্রাক্‌-আর্য=হিন্দু
মুসলমান+প্রাক্‌-মুসলমান=মুসলমান বা হিন্দু
ইংরেজ+প্রাক্‌-ইংরেজ বা হিন্দু-মুসলমান=এ্যাংলো বা ফিরিঙ্গী

হিন্দু ও মুশ্লিম কালচারের কেন্দ্র ইন্দ্রপ্রস্থ বা দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ, অর্থাৎ উত্তর ভারত এবং এ্যাংলো-কালচারের অন্যতম আদিকেন্দ্র (বোম্বাই ছাড়া অবশ্য) পূর্বভারত, তথা কলকাতা। ক্যালকাটা

কালচারের সঙ্গে এ্যাংলো-কালচারের তাই এত নিকট আত্মীয়তা ও বিচিত্র সাদৃশ্য।

যাই হোক, প্রথম যুগের সাহেবরা মেমসাহেব ঘাড়ে ক'রে তো আসতেনই না, বিশেষ কোন লটবহর নিয়েও আসতেন না। বিলেত থেকে কোন জাহাজ এসে পৌঁছলে কলকাতার সাহেব মহলে তখন সাড়া প'ড়ে যেত, বিশেষ ক'রে যদি কোন নতুন লেডী বা 'মিস্' আসতেন তাহ'লে চাঞ্চল্যের সীমা থাকত না। নবাগত সাহেব মেমদের সঙ্গে এখানকার সাহেব-সমাজের আলাপ হ'ত রবিবার সকালে খৃষ্ট-ভজনের সময়। তখন ভজনের জন্য কোন গির্জা ছিল না, কাষ্টম্‌স অফিসের নীচের হলঘরে সকলে জমা হতেন রবিবার সকালে, সেখানে নবাগতরাও আসতেন। নতুন মেমসাহেব এলে সাহেবদের মধ্যে আলাপ-পরিচয় করা নিয়ে অনেক সময় হাতাহাতি ডুয়েল হয়ে যেত। এই যখন সাহেব-সমাজের অবস্থা তখন এদেশী লোকের সঙ্গে না মিশে উপায় কি? শুধু পুরুষ নয়, এদেশের নারীদের সাহচর্য ছাড়াও তাই সাহেবদের চলত না। মেমসাহেবরা যেমন অনেক বাঙালীকে আধা-সাহেব করেছেন তেমনি বাঙালী মেয়েরা অনেক সাহেবকে আধা-বাঙালী করেছেন। সাহেবী কালচার ও বাঙালী কালচারকে বৈবাহিক বন্ধনে বাঁধবার জন্য বিলেতের মেমসাহেব ও বাংলাদেশের মেয়েরাই করেছে ঘটকাগিরি। সুতরাং ক্যালকাটা কালচারের ক্যাটালিটিক এজেণ্ট তাঁদেরই বলা উচিত। এটা অবশ্য নতুন কোন ব্যাপার নয়। ইতিহাসে দেখা যায়, দুটি বিভিন্ন কালচারের সংঘর্ষ যখনই হয়েছে তখন সমন্বয়ের কাজ শুরু করেছে মেয়েরা। ইংরেজের আমলে এদেশে তার ব্যতিক্রম হবার কথা নয়। সাহেবরা, প্রধানতঃ এদেশী মেয়েদের পাল্লাতে পড়েই পান খাওয়া শিখেছেন, আলবোলা গড়গড়া হুঁকো ফুঁকেছেন, উৎসব-পার্বণে যোগ দিয়েছেন, হোলী খেলেছেন, মল্লযুদ্ধ করেছেন, পালকিতে চড়েছেন। কালীঘাটে কালীপুজো তো অনেকে করতেনই, কোন কোন সাহেব বাড়ীতে শালগ্রামশিলা পর্যন্ত রাখতেন এবং ব্রাহ্মণ দিয়ে তার পুজোও করাতেন। বাঙালী দেওয়ান মুন্‌শী আমলাদের বাড়ীতে সাহবেরা মধ্যে মধ্যে কুশল খোঁজখবর করতে যেতেন এবং তাঁদের ছেলেমেয়েদের হাঁটুর উপর বসিয়ে আদর করতেন। বাঙালী গিন্নীরা চন্দ্রপুলি, নারকেলের লাড়ু দিয়ে সাহেবদের জলযোগ করাতেন, পাখার বাতাস করতেন, পান সেজে দিতেন খেতে।

শেষে একটু তামাক টেনে সাহেবরা বাড়ী ফিরতেন। এইভাবেই সাহেবদের বাঙালীকরণ প্রথম শুরু হয়।

চূড়াকরণ, নামকরণের মতন সাহেবীকরণ ও বাঙালীকরণও রীতিমত কষ্টকর প্রথা। ভিন্‌দেশী কালচারের প্রত্যেকটি উপাদান নিজের কাছে খাপ্‌ খাইয়ে নেওয়া সহজ নয়। সুতরাং বাঙালীদের মতন সাহেবদেরও আধা-বাঙালী পর্যন্ত হতে বেশ কষ্ট করতে হয়েছিল। যেমন, পান খেতে গিয়ে সাহেবরা এমন বিষম খেতেন যে, তার ধকল সামলাতে তাঁদের প্রায় হিক্কা উঠে যেত। তারপর থেকে পান দেখলেই তাঁদের ঘাম ছুটত শরীরে। পালকি-চড়া অভ্যাস করতেও তাই হয়েছিল। জনৈক ক্লীভল্যান্ড সাহেব কলকাতায় প্রথম এসে নৌকো থেকে নেমেই পালকিতে চড়েছিলেন। পালকি-বেয়ারারা যখন তাঁকে কাঁধে ক'রে ছুটে চলেছে তখন তাদের চলার শব্দ হচ্ছে—হুন্‌ হুন্‌ না, হুন্‌ হুন্‌ না, ঘাট পেরিয়ে, হুন্‌ হুন্‌ না—জোর সে চলো, হুন্‌ হুন্‌ না—হেঁই আর এ—হেঁই আর এ—ইত্যাদি। সাহেব এই ধরনের অদ্ভুত শব্দ শুনে ভয় পেয়ে পালকি থেকে লাফ দিয়ে পড়লেন—ভাবলেন বেয়ারাগুলো বোধ হয় ধুঁকছে ও গোঁঙাচ্ছে, এখনই প'ড়ে মরে যাবে। তাঁর সঙ্গী এক কর্ণেল সাহেব ছিলেন, তিনি বললেন বুঝিয়ে যে এইটাই পালকি-বেয়ারাদের পথচলার গানের ধরন, যা তারা সামনে দেখে তাই বলতে বলতে যায়। ক্লীভল্যান্ড সাহেব সহজে বুঝতে চান না। পরে বেয়ারারা যখন তাঁকে বুঝিয়ে দিল হাত-পা নেড়ে তখন তিনি ধাতস্থ হয়ে পালকি চড়লেন। এইভাবে প্রত্যেক সাহেবকেই পালকি-চড়া ধাতস্থ করতে হয়েছে, কখন লাফিয়ে পড়ে হাত-পা ভেঙে, কখন বা ভয়ে চেঁচিয়ে উঠে। তামাক টানা শিখতে অবশ্য বেশী সময় লাগেনি, যদিও মৌজ ক'রে ওয়ারেন হেষ্টিংসের মতন আলবোলায় তামাক টানতে খুব কম সাহেবই পারতেন। এদেশী রাজা মহারাজাদের মতন ইংরেজ নবাবদেরও আভিজাত্যের প্রধান লক্ষণ ছিল সোনাবাঁধানো রূপোর গড়্‌গড়া ও আলবোলা এবং তার সঙ্গে দশগজী এক নল ও অন্ততঃ প্রত্যেকের চারজন ক'রে হুঁকোবরদার। হুঁকোবরদাররা যে বাড়ীতেই থাকত তা নয়, সাহেবদের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত তামাকের সরঞ্জাম নিয়ে তাদের বাইরেও যেতে হ'ত। তখনকার দিনে গবর্ণমেণ্ট-হাউসে যে ডিনার পার্টি হ'ত সেখানে পর্যন্ত নিমন্ত্রিত সাহেবদের সঙ্গে হুঁকোবরদাররা যেত। ভোজনান্তে লেডীরা অন্য ঘরে চ'লে গেলে

প্রত্যেকের হঁকোবরদার আলবোলা ও নল হাতে ক'রে এসে সারবন্দী হয়ে দাঁড়াত হলঘরে এবং একে-একে প্রভুদের কাছে গিয়ে নল হাতে দিয়ে যেত। হঁকোর নল খুব সাবধানে ছড়িয়ে রাখা হত, কারণ একজনের হঁকোর নল অন্য কেউ ডিঙিয়ে বা মাড়িয়ে গেলে সেটা ইন্‌সল্টিং মনে করা হ'ত। এই নিয়ে তখনকার সাহেবদের মধ্যে অনেক "hookah—bowl" "হঁকো নিয়ে হাতাহাতি" হয়ে গেছে। আলবোলা ও নলের লম্বাকৃতি চেহারা দেখে প্রথমটা মেমসাহেবরা ভড়্‌কে যেতেন, ইচ্ছা হলেও টান দিতে সাহস করতেন না। কিন্তু প্রাইস সাহেব তাঁর "ট্রাক্টস্‌"-এর মধ্যে লিখে গেছেন যে, ক্রমে লেডীরাও নানারকমের সুগন্ধি তামাকের লোভ সামলাতে পারলেন না এবং সাহেবদের সঙ্গে মেমরাও হঁকো ফুঁকতে শুরু করলেন। প্রাইস লিখেছেনঃ

> "The mixture of sweet-scented Persian tobacco, sweet herbs, coarse sugar, spice etc., which they inhale, comes through clean water and is so very pleasant that many ladies take the tube and draw a little of the smoke into their mouths."

মেমরাও হঁকো খান, এটা অনেক সাহেব পছন্দ করতেন না। তামাক খাওয়ার জন্য নয়, বোধ হয় আলবোলার চেহারার জন্য। কিন্তু মেমসাহেবরা লোভ না সামলাতে পেরে, সাহেবরা টেনে যাওয়ার পরে লুকিয়ে নল মুখে দিয়ে টানতেন। ছেলেবেলায় বাপের হঁকোয় লুকিয়ে তামাক টেনে আমাদের দেশে অনেককে যেমন নাজেহাল হতে হয়েছ, তেমনি অনেক মেমসাহেবকেও সাহেবের কাছে ধাতানি খেতে হয়েছে তামাক টানার জন্য। শেষ পর্যন্ত লেডীরাই জয়ী হয়েছেন এবং সভাসমিতিতে ক্রীটান নাগিনীদেবীর মতন আলবোলার নল কোমরে জড়িয়ে ব'সে তামাক ফুঁকেছেন, সাহেবদের নল বাড়িয়ে অফার করেছেন।

এইভাবে বাঙালী কালচারের প্রত্যেকটি উপকরণ নয় শুধু, বাঙালী জীবনধারাটাকেও সাহেবদের ধাতস্থ করতে হয়েছে। সেটা অবশ্য আমাদের দেশের রাজা মহারাজা আমীর ওমরাহদের জীবনধারা। সেইজন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের বণিক সাহেবদের ইংরেজ 'নবাব' বলা হ'ত। হিকির মতন একজন সাধারণ সাহেবেরও (যাঁর গেজেট 'হিকির গেজেট' ব'লে পরিচিত) তেষট্টিজন চাকর ছিল। অবস্থাপন্ন সাহেব বণিকদের অনেকের

একশজনেরও বেশী চাকর থাকত। সকালবেলা সাহেবের ঘুম ভাঙাত চাকরে এবং ঘুম ভাঙাবার পর নাপিত এসে দাড়ি কামিয়ে, নখ কেটে, কান খুটে দিত। তারপর ব্রেকফাস্ট চা টোস্ট খেয়ে সাহেব টেবলের সামনে বসতেন চুল ঠিক করতে। হেয়ারড্রেসাররা চুল ঠিক করে দিত। সাহেব অফিসে যেতেন, সঙ্গে চাপরাশি, হরকরা, পিওন, হুঁকোবরদার নিয়ে প্রায় জন কুড়ি নোকর যেত। গ্রীষ্মকালে অফিস চলত বেলা ন'টা থেকে বারোটা, শীতকালে দশটা থেকে দেড়টা পর্যন্ত। তারপর দ্বিপ্রহরে খাওয়া এবং সে খাওয়াও ছিল রাক্ষুসে খাওয়া। সেই খাওয়া দেখে "কুইজ" ছদ্মনামে কোন ইংরেজ কবি লিখে গেছেন—

Their masticators they employ,
On curry, rice and beef and goat,
Voraciously they cram each throat.

মধ্যাহ্নভোজের পর লম্বা ঘুম। সন্ধ্যার আগে সাহেব ও মেমদের ঘুম ভাঙত। ড্রেসাররা এসে সাহেবদের পরচুলো ও মেমদের চূড়াকার খোঁপা বেঁধে দিত। তারপর বিকেলের টিফিন খেয়ে সাহেব মেমরা নৈশ-বিহারে বেরুতেন, কেউ পালকিতে, কেউ ফিটনে চ'ড়ে। বড় বড় কোম্পানীর সাহেবরা জুয়াখেলাতেও জমে যেতেন, প্রধানতঃ তাসের জুয়া এবং অনেকের দেশী রাজা রাজড়াদের বাড়ীতে নৈশভোজের ও বাইনাচের নিমন্ত্রণ থাকত। এই নৈশভোজ ও নাচের সভাটাই "কলকেতা কালচারের" একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য, যা কোম্পানীর আমল থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় একই ধারায় চ'লে আসছে বলা যায়।

(তিন)

ইংরেজ হঠাৎ-নবাবরাও যে এদেশী নবাবদের মতন শতাধিক চাকর রাখতেন, সেকথা আগে বলেছি। বিখ্যাত ফ্রান্সিস সাহেবের শ্যালক ম্যাক্‌রাবি লিখে গেছেনঃ

"One hundred and ten servants to wait upon a family of four people, and yet we are economists"—

অর্থাৎ "আমাদের চারজনের পরিবারে একশ'দশজন চাকর চাই, তবু আমরা নাকি ইকনমিষ্ট"। চাকরদের অবস্থা অনেকটা ক্রীতদাস-

দাসীর মতন ছিল। প্রভুদের অত্যাচারে মধ্যে মধ্যে তারা পালিয়ে যেত এবং ধরা পড়লে আদালত থেকে হুকুম জারী করা হ'ত, দশঘা কি বিশঘা চাবুক মেরে তাদের মাষ্টারদের কাছে ফিরিয়ে দেবার জন্য। চাকররা চুরিচামারি করলে সাহেব মাষ্টাররা ব্রাহ্মণ পুরোহিত ডেকে ডেকে তাদের চালপড়া খাওয়াতেন এবং পুরুত চালপড়ার পরীক্ষায় যাকে চোর ব'লে সাব্যস্ত করতেন তাকে ধ'রে সাহেব উত্তম মধ্যম চাবুক মারতেন। এই ব্যাপারটা থেকে বোঝা যায় যে, সাহেবরা আমাদের দেশী কালচার কতদূর পর্যন্ত গ্রহণ করেছিলেন। শুধু যে সাহেবরা কালীমন্দিরে মানত করতে যেতেন বা শালগ্রামশিলা রেখে পুজো করতেন তা নয়, চালপড়া, ঘটিচালা, নলচালা, ইষ্টকবচধারণ বশীকরণ পর্যন্ত তাঁরা বেশ রপ্ত ক'রে ফেলেছিলেন। কালচারের ক্ষেত্রে দেবে-আর-নেবের মহিমা বোঝা সত্যিই মুশকিল!

কলকাতার প্রথম যুগের সাহেবদের দৈনন্দিন জীবন ও দিবানিদ্রার কথা বলেছি। দিবানিদ্রাটি নবাবী আমলের কালচার-ট্রেট্, ইংরেজ-আমলের সাহেব-নবাবরা স্বচ্ছন্দে আত্মসাৎ ক'রে ফেলেছিলেন। ১৭৮৯ সালে জনৈক ইংরেজ কাহিনীকার লিখছেনঃ

"The custom of reposing if not sleep after dinner is so general that the streets of Calcutta, in the afternoon, are as empty of Europeans as if it were midnight."—

"মধ্যাহ্নভোজনের পর দিবানিদ্রাটা সাহেবসমাজে এতটা প্রচলিত ছিল যে, অপরাহ্নে কলকাতার রাস্তায় সাহেবদের টুপি পর্যন্ত দেখা যেত না—মধ্যরাত্রির মতন কলকাতা শহর নিস্তব্ধ থাকত।" সন্ধ্যার দিকে শহর আবার সরগরম হয়ে উঠতো, ফীটন বগির ঘোড়ার ক্ষুরের টপ্-টপ্ শব্দে। অভিজাত সাহেবরা ফীটনে ক'রে বেরুতেন, স্বল্পবিত্তরা শেয়ারে পাল্কি ভাড়া ক'রে শহর চক্কর দিতেন। লর্ড ও লেডীরা নিজেরাই ফীটন হাঁকিয়ে যেতেন, কচুয়ান বেয়ারারা পিছনে থাকত। যার যত ভাল ফীটন বগি হবে এবং যে যত কায়দা ক'রে ঘোড়ার রাশ টেনে গাড়ী হাঁকিয়ে যেতে পারবে, প্রেমের বাজারে তার দর বাড়বে তত বেশী। একালের বুইক হাম্বারের মতন ভাল ফীটন বগিই ছিল আভিজাত্যের লক্ষণ। একালে যাঁরা ট্রামে বাসে রিকশায় চ'ড়ে বেড়ান তাঁদের প্রেমে যেমন কোন মেয়েই সহজে পড়তে চান না, সেকালেও তেমনি লেডীরা ভাল ফীটনের

মালিক না হ'লে কারও সঙ্গে বাক্যালাপই করতে চাইতেন না। সাহেবসমাজেই এটা বিশেষ ক'রে দেখা যেত। তখন বিলেত থেকে অনেক লেডী কলকাতা শহরে আসতেন শুধু ভাল ব্যবসায়ী সাহেব পাকড়াবার জন্য। কলকাতার রাস্তায় ফীটন-চালক লর্ড ও ফীটন-চালিকা লেডীদের সঙ্গে মোলাকাৎ হ'ত, টিম্‌টিমে কেরোসিন তেলের আলোয় ঘোড়ার রশ্মি টেনে ধ'রে প্রেমালাপ চলত। জনৈক সাহেব কাহিনীকার লিখেছেনঃ

"No gentleman could hope to win a young lady's favour unless he had a smart carriage."

সুতরাং যে সব সাহেব শেয়ারে পাল্‌কি চ'ড়ে সান্ধ্যভ্রমণে বেরুতেন তাঁদের পালকির ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে ফীটনের মাথায়-চড়া লর্ড-লেডীদের প্রেম দেখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলা ছাড়া উপায় ছিল না। অর্থাৎ তখন তলার পালকি থেকে উপরদিকে চেয়ে ফীটনের মাথায় লর্ডলেডীদের প্রেম দেখতে হ'ত, এখন দেখতে হয় উপরের ডবল-ডেকার বাস থেকে নীচের দিকে চেয়ে ষ্ট্রীমলাইন্ড বুইকের ভেতর লর্ডলেডীদের প্রেম। কালের যাত্রায় দৃষ্টির পরিবর্তন যে হয়েছে তাতে কোন সন্দেহই নেই।

সান্ধ্য কলকাতার ফৈটনিক প্রেমই যে একমাত্র দ্রষ্টব্য বিষয় ছিল তা নয়। লর্ডলেডীরা বন্ধুবান্ধবদের গৃহে চায়ের আসরে যেতেন, জুয়া খেলতেন, হোটেলে নাচগানহল্লাও করতেন। এদেশী রাজা-মহারাজা, নবাব ও জমীদারদের বাড়ীতেও নৈশভোজ ও বাইনাচের নিমন্ত্রণ থাকত সাহেবদের। এই নাচের ব্যাপারটা সবচেয়ে ইণ্টারেষ্টিং। বিলেতে নাচা আর কলকাতায় নাচা এক ব্যাপার নয়। কলকাতা শহরের প্রচণ্ড গরমে সাহেব মেমদের নাচার অসুবিধা হ'ত খুব। সামান্য একটু নাচলে কুঁদলেই সমস্ত গা দিয়ে ঘাম ঝ'রে পড়ত, কালা ক্রীতদাসদের হাতপাখার বা টানাপাখার হাওয়ায় সে ঘাম সহজে শুকুত না। অনেক সাহেব প্রথম যুগের এই নাচের কথা তাই দুঃখ ক'রে লিখে গেছেন। এদেশের অঢেল খাদ্য সস্তায় পেয়ে সাহেবরা যেমন ভীমের মতন গিলে অসুখবিসুখে ভুগেছেন, তেমনি এদেশের নাচওয়ালী বাইজীদের নাচ দেখে নাচতে গিয়ে ঘেমে ঘায়েল হয়ে গেছেন। ১৭৮৮ সালের ৯ই অক্টোবর, "ক্যালকাটা গেজেট" পত্রিকায় 'গাইডস্ টু হেল্‌থ' নির্দেশের মধ্যে সাহেবদের তাই জানানো হয়ঃ

"The Gentlemen are particularly entreated not to eat above four pounds of solids at a meal, or drink above six bottles of claret. Dancing will be extremely fatal to the ladies, if taken more than three times a week, and they are positively forbid to wear full dresses of either satin or velvet until the 1st. November."

চার পাউণ্ড সলিড বস্তু ও ছ' বোতল মদ খেতে বলা হ'লেও, নাচ সম্বন্ধে বলা হ'চ্ছে যে, সপ্তাহে তিনদিনের বেশী নাচলে লেডীদের প্রাণ নিয়ে টানাটানি হ'তে পারে, এবং নাচের সময় ভেলভেট বা সাটীনের পোষাক-পরা একেবারে নিষেধ, অন্ততঃ পহেলা নভেম্বর শীতের আমেজ না আসা পর্যন্ত। সব ছাঁটাকাঁটা প্রায়নগ্ন নাচের পোষাকের প্রচলন এর পর থেকে শুরু হয়। তার আগে আমাদের দেশের বাইজীদের পোষাক ইংরেজ লেডীরা নকল করবার চেষ্টা করতেন এবং তার ফলে গলদঘর্ম হয়ে নাচের ঘরে প্রায় দাঁত লেগে অজ্ঞান হয়ে পড়তেন।

নাচের ভেতর দিয়ে এইভাবে পূব-পশ্চিমের কালচারের লেনদেন চলতে থাকে। দেশী রাজামহারাজা ও নবাবরা যাঁরা সাহেবদের ভোজে নিমন্ত্রণ করতেন, তাঁরা লক্ষ্ণৌ বারাণসীর বিখ্যাত বাইজীদের নিয়ে এসে নাচ দেখাতেন। সাহেবরা তখন এদেশী বাইজীনাচের রীতিমত ভক্ত ছিলেন। অবশ্য ভক্ত না হয়ে তখন উপায়ও ছিল না, কারণ বিলেতী নাচওয়ালী তখন কলকাতা শহরে খুব বেশী আমদানি হয়নি। দেশীয় রাজাদের ভোজসভায় বাইজীদের নাচ দেখে জনৈক ফিরিঙ্গী কবি বর্ণনা করেছেনঃ

"Then suddenly sounded a loudclanging gong
And there brust on the eyes of the wondering throng
A bevy of girls
Dressed in bangles and pearls
And other rich gems,
With fat podgy limbs . .
And sang a wild air
Which affected your hair"—

অর্থাৎ বাইজীদের নাচ দেখে সাহেবদের মাথার চুল পর্যন্ত খাড়া হয়ে উঠত। সেই নাচ ইংরেজ লেডীরা নকল করতে গিয়ে ঘেমে অজ্ঞান হয়ে যেতেন। আর বাইজীরা কি করতেন? ভোজসভা থেকে যখন সাহেব মেমরা ফীটনে ক'রে বাড়ী ফিরে যেতেন, তখন হলঘরের দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে বাইজীরা কৌতুক ক'রে রাজামহারাজাদের বিলেতী

নাচ নকল ক'রে নেচে দেখাতেন। তাই নিয়ে হাসাহাসি ঠাট্টাবিদ্রূপও চলত। ক্রমে যত দিন যেতে লাগল তত বাইজীরা বিলেতী নাচ ব্যঙ্গ ক'রে নাচতে লাগলেন এবং ইংরেজ লেডীরা এদেশী বাইজী-নাচ নকল ক'রে ঘামতে আরম্ভ করলেন। উভয়পক্ষের নাচের অনুকরণ থেকে, বিলেতী ও দেশী নাচের ভঙ্গিমার লেনদেন থেকে, এক বিচিত্র ইঙ্গবঙ্গ বা ইঙ্গ-ভারতীয় নাচের উৎপত্তি হ'ল। এই এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান নাচই হ'ল 'কলকাতা কালচারের' অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। মধ্যরাত্রে কলকাতার হোটেলে আজও এই নাচ দেখা যায়।

"কলকাতা কালচারের" উদ্‌যোগপর্বের এই হ'ল বৈশিষ্ট্য। নকলনবীশী ও উচ্ছৃঙ্খল বিলাসিতা ছাড়া তার মধ্যে আর বিশেষ কিছু ছিল না। এই উচ্ছৃঙ্খল হালকা ধারার পাশাপাশি আর একটি স্বতন্ত্র ধারা ছিল, কালচারের লেনদেনের ব্যাপারে যার গুরুত্ব আরও বেশী। ফ্রান্সিস ও হিকি সাহেব যে-সমাজে মেলামেশা করতেন সেখানে নাচগানহল্লা, মদ্যপান, জুয়াখেলা ঘুষখাওয়া, ফীটন-চড়া, নৌকাবিহার ইত্যাদি ছাড়া আর কিছু ছিল না। হেষ্টিংস ও তাঁর বন্ধুবান্ধবরা কবিতা লিখতেন, সংস্কৃত ফারসী শিখতেন, মহাভারত রামায়ণ পড়তেন। বাংলাদেশের ধানক্ষেতের উপর দিয়ে পালকি চ'ড়ে যেতে যেতে হেষ্টিংস অনেক কবিতা লিখেছেন, যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণের কথা পড়তে পড়তে কেঁদে ফেলেছেন। দৈনন্দিন জীবনযাত্রাও তাঁর খুব সাদাসিধে ছিল। তাহলেও, খুব সংকীর্ণ একটা গোষ্ঠীর বাইরে হেষ্টিংস বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। দেশী-বিদেশী-খুদে নবাবদের আয়ত্তে আনতে তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন। এ-দেশী লোকদের সঙ্গে তিনি যথেষ্ট মেলামেশা করতেন, এবং তাঁর আমলেও ইংরেজদের সঙ্গে আমাদের একটা প্রীতির সম্পর্ক ছিল। সম্পর্কটা অবশ্য লুটের মালের ভাগবাঁটোয়ারার ভেতর দিয়েই স্থাপিত হয়েছিল। ওয়েলেস্‌লির আমলে এই সম্পর্কে ভাঙন ধরতে থাকে, রাজা-প্রজা প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক কায়েম হয়। কর্ণওয়ালিসের আমলে উচ্ছৃঙ্খলতার বন্যায় ভাঁটা পড়ে, নবাবী আমলের অস্তগামী সূর্য একেবারে ডুবে যায়। ক্যালকাটা কালচারের এক নতুন পর্ব শুরু হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে।

১৮০৭ সালের ২৪শে ডিসেম্বর "ক্যালকাটা গেজেট" পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ছাপা হয়ঃ

"To be sold by public auction by Tullon & Company on Monday, the 25th January, 1808 at his house adjoining the Supreme Court, the truly elegant property of William Hickey, Esq. returning to Europe."

হিকি সাহেব তাঁর জিনিসপত্তর নিলেমে বেচে ১৮,৩০০৲ টাকা পেয়েছিলেন, তাও নাকি আসল দামের তুলনায় অনেক কম পেয়েছিলেন। হিকির কলকাতা ত্যাগের পর "ক্যালকাটা কালচারের" একটা যুগ শেষ হয়ে গেল বলা যায়। সেটা বনেদী দেশী নবাব ও ইংরেজ হঠাৎ-নবাবদের পারস্পরিক লেনদেন ও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রাথমিক যুগ। ১৮০৮ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী হিকির জাহাজ কলকাতার বন্দর ছাড়ল। এদেশী পুরাতন ভৃত্য মন্নু, হিকির সঙ্গে বিলাত যাত্রা করল। পশ্চিমের সঙ্গে পূবের, বিলেতের সঙ্গে বাংলার তথা ভারতের মিলন হ'ল এইভাবে। বিলেতে পৌঁছে হিকি সাহেব মন্নুকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষা দিয়ে নাম দিলেন "উইলিয়াম মান্নিউ"। বিলেতে পাম্ গাছের তলায় ব'সে হিকি সাহেব বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে সন্ধ্যার সময় মজলিসি গল্প জমাতেন "ক্যালকাটা কালচার" সম্বন্ধে, উইলিয়াম মান্নিউ ওরফে মন্নুও তাতে যোগ দিত। "কলকাতা কালচারের" প্রথম পর্বটা এইভাবেই শেষ হয়ে গেল।

(চার)

হিকি সাহেবের বিলাতযাত্রার পর থেকেই কলকাতা কালচারের প্রথম পর্ব শেষ হয়ে গেল। সেটা কলকাতার ইংরেজ হঠাৎ-নবাবদের কালচার, বৃটিশ মুচি, নাপিত ও অকাল-কুষ্মাণ্ডরা—যারা কোম্পানীর আমলে 'ফ্যাক্টর' ও 'রাইটার' হয়ে এদেশে আসত, তাদের কালচার। সে-কালচার হিকির গেজেট বা হেজেসের ভ্রমণকাহিনীর মতন বিবরণলিপিরই খোরাক যোগাতে পারে। সেকালের একজন মাদ্রাজের গবর্ণর, জনৈক বৃটিশ জুতো-পালিশওয়ালা রামবোল্ড সাহেব, যখন এদেশ থেকে বিলেতে ফিরে যান, তখন তাঁর নবাবী চালচলন দেখে বিলেতী পত্রিকায় একটি ব্যঙ্গকবিতা লেখা হয়ঃ

When Mackreth served in Arthur's crew.
He said Rumbold, "Black my shoe".

He humbly answered, "Yea Bob".
But when returned from India's land,
And grown too proud to brook command,
His stern reply was "Na-bob".

বাংলাদেশের একজন 'ফ্যাক্টর' (রেশমের কুঠির অফিসারদের 'ফ্যাক্টর' বলা হ'ত, আর কেরানীদের 'রাইটার') স্যার ফ্রান্সিস সাইক্স যখন প্রচুর ধনসম্পত্তি নিয়ে বিলেতে ফিরে যান, তখন তাঁকেও নবাব নাপিতনন্দন ব'লে বিদ্রূপ করা হয় সংবাদপত্রেঃ

"Worthy offspring of a barber,
Squeez'd twixt powder-puffs and lather".

হেষ্টিংস, ক্লাইভ সকলেই 'রাইটার' বা কেরানী হয়ে বাংলাদেশে এসেছেন, লর্ড বা নবাব হয়ে স্বদেশে ফিরে গেছেন। প্রথম যুগের কলকাতা কালচার ছিল প্রধানতঃ এই সব ইংরেজ ফ্যাক্টর ও রাইটারদের কালচার, অর্থাৎ সাধারণতঃ তৃতীয় শ্রেণীর ইংরেজদের কালচার। কিন্তু এ হ'ল বাংলাদেশের ইংরেজদের কালচারের কথা। তখনকার নতুন বাঙালী কালচার কি রূপ ধারণ করেছিল? অষ্টাদশ শতাব্দীর, অর্থাৎ ইংরেজযুগের প্রথম পর্বের কলকাতা কালচারের বাঙালী রূপের প্রতিভূ ছিলেন শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর।

হিকি সাহেবের পুরাতন ভৃত্য মন্নুর মতন যাঁরা উইলিয়াম মান্নিউ হ'য়ে খোলস পাল্টাচ্ছিলেন, তাঁদের সংখ্যা অষ্টাদশ শতাব্দীতে খুব বেশী ছিল না। ১৭৬৩ সাল পর্যন্ত যে-সব বিবরণী পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় কয়েকজন মাত্র বাঙালী তখন পর্যন্ত খৃষ্টান হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ফ্রান্সিস রামচরণ, জনসন্ রামকৃষ্ণ, জনাথন গঙ্গাগোবিন্দ, হুইলার জনার্দন, ম্যাথিউ মুল্লুকচাঁদ, টম্‌কিন কাশীনাথ, ফিলিপ গঙ্গারাম, টমাস ঘনশ্যাম প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। সুতরাং নবকৃষ্ণের আমলে (১৭৩২—১৭৯৭ খৃঃ অব্দ) বাঙালী খৃষ্টানরা বা বাঙালী সাহেবরা খুব বেশী প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। এই সময় ইংরেজ হঠাৎ-নবাবদের মতন বাঙালী হঠাৎ-রাজাদের প্রাধান্যই কালচারের ক্ষেত্রে বজায় ছিল এবং কালচারের ভারকেন্দ্র মুর্শিদাবাদ, শান্তিপুর, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম থেকে কলকাতা শহরে স্থানান্তরিত হচ্ছিল। বাঙালীদের মধ্যে যাঁরা ইংরেজযুগের প্রথম পর্বে নতুন কলকাতা কালচারের গোড়াপত্তন করেছিলেন কলকাতা শহরে, শোভাবাজারের

মহারাজা নবকৃষ্ণ তাঁদের অন্যতম ও প্রতিনিধিস্থানীয়।

শোভাবাজারের রাজবাড়ী শহরের লোক সকলেই নিশ্চয়ই জানেন। মহারাজা নবকৃষ্ণ তাঁর স্বনামখ্যাত রাস্তা "রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট" নিজেই খরচ ক'রে তৈরী করেছিলেন। চিৎপুর রোড থেকে অপার সার্কুলার রোড পর্যন্ত এই রাস্তা একসময় বিস্তৃত ছিল। কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট হবার পর এর পূর্বাংশের নাম হয় হাতীবাগান ষ্ট্রীট এবং পরে আরও কিছু অংশ গ্রে ষ্ট্রীটের অন্তর্ভুক্ত হয়। সুতরাং এখনকার 'রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট' আদি রাজপথের অর্ধেকেরও কম। হেষ্টিংস যখন কোম্পানীর কেরানী ছিলেন—তখন নবকৃষ্ণ ছিলেন তাঁর মুন্শী বা ফারসী ভাষার প্রাইভেট টিউটর। পরে হেষ্টিংস যখন বড়লাট হন তখন নবকৃষ্ণ হন সুতানুটির (সমস্ত উত্তর কলকাতা) তালুকদার। প্রাইভেট টিউটরের এরকম সম্মান ও পদোন্নতির কথা নিশ্চয়ই আজকাল কেউ ভাবতে পারেন না। কিন্তু তখন মাষ্টারদের পোয়াবারোর যুগ ছিল। নবকৃষ্ণের দত্তকপুত্র গোপীমোহনের পুত্র রাধাকান্ত দেবের যিনি ইংরেজীর প্রাইভেট টিউটর ছিলেন, তিনি জরির জুতো আর মতির মালা প'রে পড়াতে আসতেন। মনে করুন, আজকাল যদি এরকম পোষাক প'রে কেউ ছাত্রদের এলিয়টের কবিতা পড়াতে আসেন, তাহ'লে কি-রকম অবস্থা হয়! তখন এ-রকম হ'ত না। বাঙালী মাষ্টার যাঁরা রামমোহন-রাধাকান্তের যুগে ইংরেজী শেখাতেন, তাঁরা জরির জুতো পরে মতির মালা গলায় দিয়ে বুক চিতিয়ে পড়াতে যেতেন। কারণ, নিজেদের তাঁরা সমাজের মধ্যে অমূল্য রত্নস্বরূপ মনে করতেন। রাধাকান্তের ঠাকুর-দা নবকৃষ্ণের আমলে ইংরেজীর চেয়ে ফারসীর সম্মান ছিল বেশী, ফারসী না শিখলে ভাল সরকারী চাকরীও কারও হ'ত না, শিক্ষিত বলেও কেউ গণ্য হ'ত না। নবকৃষ্ণ ভাল ফারসী পড়াতেন, তবে কি পোষাক প'রে পড়াতে যেতেন জানি না। জরির জুতো ও মতির মালা নিশ্চয়ই নয়, পণ্ডিত মুনশীদের মতন সাদা-সিধে পোষাকই হবে। পরে কোম্পানীর মুনশী তোজাউদ্দীন খাঁর বদলে ড্রেক সাহেব নবকৃষ্ণকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মুনশীর পদে নিযুক্ত করেন। তখন থেকেই তিনি "নব মুনশী" নামে পরিচিত। ইংরেজদের পক্ষে যা কিছু লেখালেখি, আবেদন-নিবেদন, সন্ধি-ষড়-যন্ত্রের কাজ সবই মুনশীদের করতে হ'ত নবাবদের সঙ্গে এবং নবকৃষ্ণ ইংরেজদের পক্ষে সেই কাজ করতেন। সুতরাং পলাশীর যুদ্ধের

পর ইংরেজদের যখন ভাগ্য ফিরে গেল, তখন নবকৃষ্ণেরও ভাগ্য সুপ্রসন্ন হ'ল। ক্লাইভ দিল্লীশ্বরের কাছ থেকে নবকৃষ্ণকে প্রথমে "রাজা বাহাদুর" পরে "মহারাজা বাহাদুর" উপাধির সনন্দ আনিয়ে দিলেন। নবকৃষ্ণকে এই উপাধি ও খেলাৎ দান উপলক্ষে ক্লাইভ কলকাতায় যে দরবার করেন, তাতে শহরের কোন ইংরেজ অনুপস্থিত ছিলেন না। দরবার শেষ হবার পর নবকৃষ্ণকে একটা সুসজ্জিত হাতীর পিঠে রুপোর হাওদায় চড়িয়ে দিয়ে মহাসমারোহে অশ্বারোহী, গজারোহী, পদাতিক ও তূর্যজীবের শোভাযাত্রা সহকারে শোভাবাজারের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। প্রায় দু'শ বছর আগে কলকাতা শহরের বুকের উপর দিয়ে হাতীর পিঠে চ'ড়ে নবকৃষ্ণ এইভাবে শোভাযাত্রা ক'রে "মহারাজা বাহাদুর" উপাধি নিয়ে ঘরে ফিরে যান—অর্থাৎ শোভাবাজারে। তখন কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট বা চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউয়ের মতন কলকাতার রাস্তাঘাট বা ঘর-বাড়ী কিছুই ছিল না। মেঠোপথ, চালাঘর, কিছু কিছু ইটের বাড়ী ছিল শ্যামবাজার বাগবাজারের অনেক জায়গায়, অর্থাৎ সেকালের সুতানুটীর নানাস্থানে চাষবাসও করত লোকে। খুব বেশী শহরের লোকসংখ্যা ছিল না, যারা ছিল তারা প্রায় সকলেই ভিড় ক'রে শোভাযাত্রা দেখতে এসেছিল। ইংরেজযুগের প্রথম পর্বে যে কয়েকজন বাঙালী এইভাবে হঠাৎ-রাজা হয়েছিলেন, মহারাজা নবকৃষ্ণ নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আন্দুলনিবাসী দেওয়ান রামচাঁদ রায়, ভূকৈলাসের দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষাল, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, কাশীমবাজারের কান্তবাবু প্রমুখ সমসাময়িক প্রতিপত্তিশালী বাঙালীদের মধ্যে কেউই নবকৃষ্ণের মতন বাঙালী সমাজ ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। তার কারণ তিনি তাঁর শোভাবাজারের রাজবাড়ীটাকে নতুন বাঙালী সমাজ ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল ক'রে তুলেছিলেন। কলকাতা শহরের বাইরে থাকলে হয়ত এতটা প্রভাব বিস্তার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হ'ত না, কারণ নতুন বাঙালী কালচারের সূত্রপাত হচ্ছে তখন কলকাতায় এবং নতুন যুগের বাঙালী কালচার মানেই "কলকাতা কালচার"। প্রকৃতপক্ষে নবকৃষ্ণই (সুবর্ণবণিক ও শেঠ বসাকদের বাদ দিলে) তখন অধিকাংশ কলকাতার মালিক ছিলেন। আগে বলেছি, হেষ্টিংস এদেশের শাসনকর্তা হয়ে নবকৃষ্ণকে সুতানুটীর তালুকদারী দেন। তালুক সুতানুটীর উত্তর-সীমা ছিল

বাগবাজারের খাল, পূর্ব-সীমা সার্কুলার রোড, পশ্চিম-সীমা ভাগীরথী, দক্ষিণ-সীমা বড়বাজারের রতন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রীট। সূতানুটী বাদ দিয়ে "কলিকাতায়" (ধর্মতলা পর্যন্ত মধ্য-কলকাতা) একদিকে সুবর্ণবণিক ও অন্যদিকে শেঠ বসাকদের প্রতিপত্তি ছিল। তার দক্ষিণে "গোবিন্দপুরে" ছিল নতুন ইংরেজদের আধিপত্য। আরও দক্ষিণে ভবানীপুরে ও কালীঘাটে ছিল ধনিক ও মধ্যবিত্ত হিন্দুদের প্রভাব। আধিপত্যটা 'কালচার জোন্' হিসেবে বলা হচ্ছে। অর্থাৎ এই ছিল নবকৃষ্ণের আমলের কলকাতার "কালচার জোনস্" বা সাংস্কৃতিক অঞ্চল ঃ

সূতানুটী (উত্তর কলকাতা)ঃ নবকৃষ্ণ প্রবর্তিত তালুকদারী কালচার—অর্থাৎ নতুন যুগের বাঙালী রাজার সামন্তযুগীয় কালচার।

কলিকাতা (মধ্য-কলকাতা)ঃ সুবর্ণবণিক ও শেঠ বসাকদের বণিক-কাল্চার—সেকাল ও একালের বণিকের এক মিশ্রিত মার্কাণ্টাইল কালচার।

গোবিন্দপুর (নিম্ন-মধ্য-কলকাতা)ঃ নতুন যুগের ইংরেজী কালচার—তৃতীয় শ্রেণীর ইংরেজ হঠাৎ-নবাবদের কালচার।

ভবানীপুর-কালীঘাট (দক্ষিণ কলকাতা)ঃ হিন্দু ধনিক ও মধ্যবিত্তের কালচার।

এই সব মিলিয়েই প্রথম যুগের "কলকাতা কালচার"। প্রত্যেক অঞ্চলের প্রভাব ছিল অন্য অঞ্চলের উপর, কিন্তু তার মধ্যে নবকৃষ্ণ প্রবর্তিত ইংরেজযুগের উত্তর-কলকাতার তালুকদারী কালচারের প্রভাব ছিল বোধ হয় সবচেয়ে বেশী। নবকৃষ্ণের আমলের ক্যালকাটা কালচারের সেই তালুকদারী—তথা—ফিউডাল বৈশিষ্ট্য আজও অনেকটা বজায় আছে। পরাধীন দেশের কালচারে তাই থাকবার কথা, কারণ নতুন যুগে এদেশী বণিকরা বাণিজ্য-প্রসার বা পণ্য-উৎপাদনের সুযোগ পাননি, ইংরেজরা তাতে বাধা দিয়েছিলেন। তাই আধা-মার্কাণ্টাইল, আধা-ক্যাপিটালিষ্ট ও আধা-ফিউডাল উপাদান নিয়ে এক বিচিত্র 'কলকাতা কালচারের' সৃষ্টি হয়েছে। এই বিচিত্র "কলকাতা কালচারের" ফিউডাল রূপের প্রবর্তক ছিলেন নবকৃষ্ণ।

তাই সারাজীবন ইংরেজদের সাহচর্যে থেকেও এবং হেষ্টিংস, ক্লাইভের সংগী হয়েও, মহারাজা নবকৃষ্ণ তাঁর বেহারা-কামানো মাথার "কেশ-শিখাটি" শেষ পর্যন্ত কাটতে পারেননি। ধুতি প'রে, কাঁধে গামছা নিয়ে তিনি রোজ গঙ্গাস্নান করতে যেতেন,—কান্ত খানসামা মাথায় ছাতি ধ'রে যেত। যখন তিনি রাজকাজে যেতেন, তখন জোড় পরে, মাথায় খিড়কীদার পাগড়ী বেঁধে লপেটা-পাদুকা পরে,

ঝালরদার পাল্কী চড়ে যেতেন। ইংরেজ রাজার আদেশ ছাড়া কেউ তখন ঝালরদার পাল্কী চড়তে পারত না। ১৭৬৫ সালে "রাজা বাহাদুর" উপাধি পাবার পর নবকৃষ্ণ এই পাল্কী চড়ার ক্ষমতা পান। ইংরেজ নবাবদের মতন তিনি যে অশ্ব-শকটে চড়েননি, তা নয়। ১৭৭৫ সালে যখন ষ্টুয়ার্ট কোম্পানীর কারখানা হয়, তখন সেখান থেকে তিনি একখানি শকট তৈরী করান। তিনিই নাকি বাঙালীদের মধ্যে প্রথম ঘোড়াগাড়ীতে চড়েন এবং যে-দিন প্রথম চড়েন, সেদিন উত্তর-কলকাতার রাস্তায় তাঁকে দেখবার জন্য ভীড় জমে গিয়েছিল। একটি দু'টি নয়, নবকৃষ্ণ সাতটি বিবাহ করেন। পলাশীর যুদ্ধের পরে সেই বৎসরেই নতুন পূজার দালান তৈরী ক'রে নবকৃষ্ণ সমারোহে দুর্গোৎসব করেন। তাঁর দুর্গোৎসব কতকটা "কালচারাল উৎসবের" মতন, হিন্দু-মুসলমান, ইংরেজ আরমানি ইহুদী, শহরের সকল সম্প্রদায়ের লোক তাতে যোগ দিত। জলের স্রোতের মতন তিনি টাকা খরচ করতেন। শ্রীশ্রীগোপীনাথ জীউ ও শ্রীশ্রীগোবিন্দ জীউ নামে দেব-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করতেও তিনি লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করেছিলেন। দোলযাত্রা, জন্মাষ্টমী, চড়কের সময় তিনি মুক্তহস্তে খরচ করতেন। মাতৃ-শ্রাদ্ধের সময় তিনি নয় লক্ষ টাকা ব্যয়ের ফর্দ করেন, খরচ করেন তারও বেশী।

এ সবই হ'ল তালুকদারী—তথা—ফিউডাল কালচারের নমুনা, ইংরেজযুগের বাঙালী কালচার—তথা—কলকাতা কালচারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। টমাস ঘনশ্যাম বা ফিলিপ গঙ্গারামের কালচার নয়, এ হ'ল খাঁটি বাঙালী হিন্দুর কালচার। কিন্তু তবু হিন্দু বা মুসলমানের যুগের হিন্দু কালচার এটা নয়, এ হ'ল ইংরেজ-যুগের নতুন হিন্দু কালচার। নবকৃষ্ণের বিদ্যোৎসাহ ও কাব্যপ্রীতির মধ্যে তা আরও স্পষ্টাকারে ফুটে উঠেছে। নবকৃষ্ণের আমল থেকেই কলকাতা শহরে পণ্ডিতদের সমাদর বাড়ল এবং আখড়াই ও কবি-গানের ধুম পড়ে গেল। শান্তিপুর, নবদ্বীপের কালচার কিভাবে "কলকাতা কালচারে" পরিণত হ'ল, প্রধানতঃ নবকৃষ্ণের উদ্‌যোগে, তাও জানা প্রয়োজন। কারণ মধ্যযুগের কালচারকে কিভাবে আধুনিক যুগের "কলকাতা কালচারের" সঙ্গে কচু-আলু ও আদার মতন মিশিয়ে ফেলা হ'ল তা না জানলে প্রথম পর্বের বাঙালী কালচারের বিবরণ অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

ক'রে, জোরে জোরে চণ্ডীপাঠ করতে লাগলেন। কিন্তু উথ্‌লানো তাতে বন্ধ হ'ল না। ক্রমেই তিনি আরও দ্রুত চণ্ডীপাঠ করতে লাগলেন। এমন সময় ভট্‌চাজ গিন্নী পুকুর থেকে ফিরে এলেন এবং ব্যাপার দেখে বললেনঃ "এ কি? ডালে একটু তেল ফেলে দিতে পারনি?'' এই ব'লে তিনি ডালে একটু তেল ফেলে দিলেন, উথলানো থেমে গেল। ভট্‌চাজ অবাক হয়ে ব্রাহ্মণীর দিকে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন, তারপর গললগ্নীকৃতবাস হয়ে করযোড়ে বললেনঃ "তুমি কে বলো নারীরূপে আমার গৃহে অধিষ্ঠাতা? নিশ্চয়ই তুমি মানবী নও, দেবী—তা না হ'লে চণ্ডীপাঠে যা হ'ল না, ব্রাহ্মণ্যশক্তি যেখানে হার মেনে গেল, তুমি তা কি ক'রে সামান্য এক ফোঁটা তেল দিয়ে জয় করলে বলো?'' বলা বাহুল্য, ব্রাহ্মণী 'আ মরণ!' বলে এক ঝাম্‌টা দিয়ে চলে গেলেন। আর এক ভট্‌চাযের পুঁথি পড়তে পড়তে অনেক রাতে তামাক খাবার ইচ্ছা হ'ল। তিনি পুঁথি ছেড়ে উঠে টিকে হাতে ক'রে আগুনের খোঁজে বেরুলেন। মাইল খানেক হেঁটে দেখলেন, দূরে একটা পাঁজা পুড়ছে। সেখান থেকে টিকে ধরিয়ে ঘরে ফিরে দেখেন যে, তাঁর পুঁথির সামনে প্রদীপের বুক দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে। তখন তাঁর খেয়াল হ'ল, তাই তো, টিকে তো প্রদীপেই ধরানো যেত। এই হ'ল ভট্‌চাজ পণ্ডিতদের অবস্থা—একেবারে চরম তুরীয় অবস্থা। কিন্তু তবু তাঁরা সত্যিকারের শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। মহারাজা নবকৃষ্ণ এই ধরনের অনেক পণ্ডিতের পেট্রন ছিলেন। তাঁরই সাহায্যে অনেক পণ্ডিত ইংরেজ কোম্পানীর জন্য শাস্ত্র অনুবাদের ও পণ্ডিতের কাজে নিযুক্ত হয়েছেন। কিন্তু পণ্ডিত হলেও তর্কবাগীশ-বিদ্যাবাগীশরা "কলকাতা কালচারের" উপর খুব বেশী প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি।

তাঁদের চেয়ে অনেক বেশী প্রভাব বিস্তার করেছিল গোঁসাই ও বাবাজীদের আখড়া-কালচার। "কলকাতা কালচারের" উপর টুলো-পণ্ডিতদের কালচারের চেয়ে বোষ্টম বাবাজীদের আখড়াই কালচারের প্রভাব অনেক বেশী। কলকাতার আশে-পাশে নদীয়া, হাওড়া, হুগলী, বর্ধমানে তখন বাবাজীদের আখড়া ব্যাঙের ছাতার মতন গজিয়ে উঠেছিল। প্রেমানন্দ ভক্তানন্দ বাবাজীরা এবং ব্রজেশ্বরী রাইকিশোরী সেবাদাসীরা আখড়াগুলো সরগরম ক'রে রেখেছিলেন। এই সব আখড়া থেকে প্রধানতঃ কৃষ্ণলীলাকে কেন্দ্র করেই আখড়াই

সংগীত-সংগ্রামের বিকাশ হয়। দুই দলে গানের লড়াই হ'ত—একদল "প্রশ্নকারী", আর একদল "উত্তরী"। প্রথমে মঙ্গলগীতি, পরে সখিসংবাদ, তারপর মান ও শেষে মিলন গাওয়া হ'ত। আখড়াই সঙ্গীতে চিতেন, পরচিতেন, ফুকা, ডবল ফুকা, মেলতা, মহড়া, সোয়ারী, মেলতা, মহড়া ও তেহারাণ দিয়ে ফিরে মেলতার পর মহড়া দিয়ে গান শেষ করা হ'ত। এই হ'ল গানের নমুনাঃ

চিঃ—আচম্বিতে একি প্রাণ
সই সই করি দরশন ?
পঃ চিঃ—আমি ও নারী চিনতে নারি,
কে ও নারী, না জানি বিবরণ।
ফুকা—কিবা কামিনীর হাস্যানন,
লাজে পূর্ণশশী মেঘে অদর্শন,
শতদল প্রায় দুনয়ন।
ডবল ফুকা—কটিতে কেশরী মানে হার,
কিবা পীনোচ্চ কুচাকার।
রূপে রক্ষা নাই, তায় অলংকার,
এমন নারী বুঝি নাই আর।
—ইত্যাদি

এই আখড়াই গানের প্রধান জন্মস্থান ছিল শান্তিপুর এবং রাজা-রাজড়া, জমিদাররা ছিলেন তার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণবধর্ম যখন অবশেষে বাবাজী ও সেবাদাসীদের আখড়া-কালচারে পরিণত হ'ল, তখন আখড়াই সংগীত হ'ল তার অন্যতম মাধ্যম। ধনীদের অবসর-বিনোদনে এই আখড়াই-গান প্রধান সহায়ক হ'ল। হিন্দুদের দেখাদেখি সাধারণ অশিক্ষিত মুসলমান স্বভাবকবিরা এর বিকৃত অনুকরণ ক'রে "তর্জার লড়াই" শুরু করল। শান্তিপুরের পর যখন সপ্তগ্রামের প্রাধান্য বাড়ল, তখন সপ্তগ্রাম হ'ল আখড়াই সংগীত, কবিগান ও তর্জার লড়াইয়ের প্রধান কেন্দ্র। পরে সপ্তগ্রাম থেকে আর্থিক ভারকেন্দ্র যখন হুগলী চুঁচুড়ায় স্থানান্তরিত হ'ল তখন আখড়াই গানের আসরও জমে উঠলো চুঁচুড়ায়। তারপর যখন কলকাতা শহর প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ও রাজধানী হ'য়ে উঠলো, তখন এই সব গানেরও প্রধান আখড়া হ'ল কলকাতা। আখড়া কলকাতা শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে গজিয়ে উঠলো এবং তার পৃষ্ঠ-পোষক হলেন শহরের নতুন বাঙালী বড়লোকেরা। এই সব আখড়ার মধ্যে শোভাবাজারের রাজবাড়ী অন্যতম এবং কলকাতার নতুন তালুকদার মহারাজা নবকৃষ্ণ বোধ হয় তার সর্বপ্রধান পৃষ্ঠপোষক।

হরু ঠাকুরের দল, নিতাই বৈরাগীর দল, ভবানী বেনের দল, জোড়াসাঁকোর দল, পাথুরেঘাটার দল, বাগবাজারের দল, শোভা-বাজারের দল, ভবানীপুরের দল প্রভৃতি আখড়াই-গানের সখের ও পেশাদারী দল কলকাতা শহরে দেখা দিল। মহারাজা নবকৃষ্ণ হরু ঠাকুর, নিতাই বৈষ্ণব প্রভৃতি কবিয়ালদের যথেষ্ট সাহায্য করতেন ও প্রচুর উৎসাহ দিতেন। তাঁকেই কলকাতার আখড়াই ও কবি-কালচারের প্রধান প্রবর্তক বললে ভুল হয় না।

ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেনঃ "ধনী লোক মাত্রেই কোন পর্বাহ উপলক্ষে কবিতা শুনিবার ইচ্ছা হইলে অগ্রেই নিতাই দাসকে বায়না দিতেন। ইঁহার সহিত ভবানী বেনের সঙ্গীত-যুদ্ধ ভাল হইত। এক দিবস ও দুই দিবসের পথ হইতেও লোক সকল নিতে ভবানের লড়াই শুনিতে আসিত। যাঁহার বাটীতে গাহনা হইত তাঁহার গৃহে লোকারণ্য হইত, ভিড়ের মধ্যভেদ করিয়া প্রবেশ করিতে হইলে প্রাণান্ত হইত। তৎকালে যদিও অন্যান্য দল ছিল, কিন্তু হরু ঠাকুর, নিতাই দাস এবং ভবানী বণিক এই তিনজনের দল সর্বাপেক্ষা প্রধানরূপে গণ্য ছিল"। এই সব স্বভাবকবির কবিত্বশক্তি নেহাৎ উপেক্ষণীয় ছিল না। দু'একটা দৃষ্টান্ত দিলে বোঝা যাবে। যেমন "প্রেম" সম্পর্কে হরু ঠাকুর বলছেনঃ

"নাম প্রেম তার, সাকার নহে,
বস্তুটি সে নিরাকার,
জীবন যৌবন ধন কিবা মন,
প্রাণ বশীভূত তার।"
অথবা—"প্রেম কি যাচলে মিলে,
খুঁজলে মিলে?
সে আপনি উদয় হয়
শুভ যোগ পেলে।"

রাম বসু বিরহী স্ত্রীর বিরহ-যন্ত্রণা বর্ণনা করছেনঃ

"মনে রইল সই মনের বেদনা।
প্রবাসে যখন যায় গো সে, তারে বলি বলি,
আর বলা হলো না।
সরমে মরমে কথা কওয়া গেল না।"

গোঁজলা গুঁইয়ের প্রেমের কবিতা আরও গরম ও চরম অবস্থায় উত্তীর্ণ হয়েছে। যেমন, প্রেমিক বলছে প্রেমিকাকে—

"তোমাতে আমাতে একই অঙ্গ,
তুমি কমলিনী আমি সে ভৃঙ্গ,

অনুমানে বুঝি আমি সে ভুজঙ্গ,
তুমি আমার তায় রতনমণি।
তোমাতে আমাতে একই কায়া,
আমি দেহ, প্রাণ! তুমি লো ছায়া,
আমি মহাপ্রাণী, তুমি লো মায়া,
মনে মনে ভেবে দেখ আপনি।”

কবিগানের প্রধান উপাদান হ'ল, কৃষ্ণলীলা কেন্দ্র ক'রে নর-নারীর প্রেমের ব্যাখ্যান। হরু ঠাকুর, নিতাই দাস, রাম বসু, ভোলা ময়রা, ভবানী বেনে, এণ্টুনি ফিরিঙ্গী, গোঁজলা গুঁই প্রভৃতি স্বভাব-কবিদের পাল্লায় প'ড়ে এই প্রেমের ব্যাখ্যান ও লীলামাধুর্য যে-কোন স্তর পর্যন্ত যে গড়াতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায়। তার উপর কলকাতার বাঙালী হঠাৎ রাজারা এই সব স্বভাবকবির আখড়াই ও কবিগানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তাঁদের রুচি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে প্রথম যুগের ইংরেজ হঠাৎ-নবাবদের বিকৃত রুচির বিশেষ তারতম্য ছিল না। হতভাগ্য স্বভাবকবিরা এই সব বাঙালী হঠাৎ-রাজাদের বিকৃত রুচি চরিতার্থ করত পেটের দায়ে কবিগান গেয়ে। যে বৈষ্ণব-কালচার কালক্রমে বাবাজী-সেবাদাসীদের আখড়াই-কালচারে পরিণত হয়ে, কৃষ্ণনগর শান্তিপুর সপ্তগ্রাম হুগলী চুঁচুড়ার বাঙালী ধনীদের চিত্তবিনোদন করত, সেই আখড়াই কালচারই হাফ-আখড়াই ও কবিগানের ভিতর দিয়ে কলকাতা শহরের নব্যযুগের বাঙালী হঠাৎ-জমিদার ও দেওয়ানদের বিকৃত রুচির ইন্ধন যোগাত। ইংরেজ হঠাৎ-নবাবরা এবং বাঙালী হঠাৎ-রাজারা এইভাবে 'কলকাতা কালচারের' গোড়াপত্তন করলেন। 'কলকাতা কালচারের' প্রথম পর্বের কাহিনী এইখানেই শেষ হ'ল।

খানসামার কলকাতা

"আমি যদি জন্ম নিতাম
ছকু খানসামার কালে"

—মধ্যে মধ্যে 'ছকু খানসামা লেন' দিয়ে চলতে চলতে এই কথাটা আমার অনেকদিন মনে হয়েছে। ভেবেছি, নবাবী আমলের খানসামাদেরও একটা ষ্ট্যাটাস ছিল, ভুঁইফোড়দের আমলে আমাদের তাও নেই। মুসলমান নবাবদের মতন ইংরেজ নবাবরাও একটা খানসামা-খিদমৎগারী কালচারের সৃষ্টি করেছিলেন কলকাতা শহরে। তার কাহিনী বাদ দিয়ে 'কলকাতা কালচারের' ইতিহাস বলা যায় না।

নবাবী আমলের হারাম বা দরবারী পরিবেশে খানসামা-খিদ্‌মৎগাররা কি অভিনয় করত, তা নিয়ে কোন রঙীন রূপকথা রচনা করতে চাই না। নবাবী আমল তখন অস্তাচলে, মুসলমান নবাবী আমল। তার সঙ্গে ঢাকাই ও মুর্শিদাবাদী কালচারও অস্ত যাচ্ছে। কিন্তু তার অস্তগামী বর্ণচ্ছটা নতুন ইংরেজ-নবাবী আমলের কলকাতা কালচারের উপর প্রতিফলিত হচ্ছে। খানসামারা এখন আর মুর্শিদাবাদের বাবুর্চিখানার নায়ক নয়, কলকাতার ইংরেজদের কিচেনের নায়ক। ইংরেজ নবাবদের এই আদিযুগটাকে প্রায় খানসামাদের যুগ বলা চলে। ছকু খানসামা কে ছিল জানি না, কোন জীবনীকোষে তার জীবনচরিত কেউ লিপিবদ্ধ ক'রে যাননি। তবে কোন ইংরেজ-নবাবের পিয়ারের খানসামা যে ছকু ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। হয়ত কোন এদেশী বাঙালী নবাবেরও হতে পারে। যারই খানসামা হোক, সেটা বড় কথা নয়। কথা হ'ল খানসামাগিরি বা খিদমৎগারীর স্বর্ণযুগের কথা। কলকাতা শহর আজও সেই স্বর্ণযুগের স্মৃতিচিহ্ন বুকে ক'রে রয়েছে। বরণীয় ও স্মরণীয়ের সংখ্যা তারপর অনেক বেড়েছে, দিন দিন আরও বাড়ছে, পথঘাটের নামও বদলাচ্ছে, আরও বদলাবে। চিরস্মরণীয় হবার আকাঙ্ক্ষা মানুষের যতদিন থাকবে (অনন্তকাল থাকবে), ততদিন একজন স্মরণীয়ের স্মৃতিপথ ও স্মৃতিস্তম্ভকে ধূলিসাৎ ক'রে দিয়ে অন্য

আর-একজন চিরস্মরণীয় হবার চেষ্টা করবেন। ছকু খানসামার বদলে কোন গফুর খানসামা বা দিলদার জমাদারের নামে কোন এ্যাভিনিউ ভবিষ্যতে তৈরী হবে কিনা জানি না। তবে, একটা কথা মনে হয়, খানসামাগিরি যে-যুগের স্মরণীয় কীর্তি ব'লে গণ্য হ'ত, আজও কি সে-যুগের শেষ হয়েছে ? এ-যুগের নবাবরা তা জানেন, আর জানে তাদের খানসামারা।

রাজা-বাদশাহের যেমন ইতিহাস আছে, খানসামারও তেমনি একটা ইতিহাস আছে। জনৈক ইংরেজ শিল্পী প্রায় এক শতাব্দী আগে তাঁর মাকে খানসামাদের সম্বন্ধে চিঠিতে লিখে জানাচ্ছেন ঃ

> Khansamanship, like Malvoilo's, greatness, commeth in three wise: some are **Born** Khansamans—some **Achieve** Khansamanship, and others have Khansamanship **Thrust** upon them.

খানসামাগিরি তিন উপায়ে করার সৌভাগ্য হয়। কেউ খানসামা হয়ে জন্মায়, কেউ খানসামাগিরির যোগ্যতা অর্জন করে, আবার কারও স্কন্ধে সেটা চাপিয়ে দেওয়া হয়। মোটকথা, খানসামাগিরি রীতিমত একটা লোভনীয় পেশা, যা ইংরেজ আমলে মুসলমানদেরই একচেটে ছিল। খানসামারাই ছিল ইংরেজ নবাবদের ঘরের গিন্নী। শুধু রান্নাঘরের নয়, ভাঁড়ারের চাবিকাঠিও তাদের হাতে থাকত। বাড়ীর অন্যান্য চাকর-বাকর সকলে খানসামার হুকুমের অধীন থাকত এবং তার মন যুগিয়ে চলত। খিদমৎগার আর খানসামায় তফাৎ আছে, পদমর্যাদার তফাৎ। খিদমৎগার খানা টেবিলের চাকর, সাহেবদের টেবিলে খানা 'সার্ভ' করাই তার প্রধান কাজ। কাজ ক'রে সাহেব প্রভুকে খুশী করতে পারলে খিদমৎগিরি থেকে খানসামাগিরিতে পদোন্নতি হ'ত। ঘরের ব্যাপারে খানসামা হ'ল প্রধানমন্ত্রী, আর তার ডেপুটি হ'ল খিদমৎগার। তারপর অবশ্য মন্ত্রিমণ্ডলীর মধ্যে পদের তারতম্য আছে গুরুত্ব হিসেবে। খিদমৎগারের পরেই বাবুর্চি। মুসলমান ছাড়াও মগ, পর্তুগীজ ও কেওড়া জাতির হিন্দুরা বাবুর্চির কাজ করত। মগ বাবুর্চিরাই নাকি সাহেবদের খুব প্রিয় ছিল। স্টকলার সাহেব এই কথা তাঁর "Calcutta as it is" (by J. H. Stocqueler) গ্রন্থে দীর্ঘ দিন আগে ব'লে গেছেন ঃ

> "The Mugs are esteemed by us in the culinary department, being heaven-born cooks from the Burmese quarter."

এবং একথাও বলেছেন যে এই মগরা "flat-faced specimen of the unfeathered biped—is ready not only to cook you a chop of pork, but to eat it into the bargain." অর্থাৎ হিন্দুরা বাবুর্চির কাজ করত না, কারণ গরু মহিষ শুয়োর, অনেক কিছুতে তাদের আপত্তি ছিল। মুসলমান বাবুর্চিরাও শুয়োর নিয়ে গণ্ডগোল করত। একমাত্র মগ বাবুর্চিদের গাধা গরু শুয়োর কিছুতেই আপত্তি ছিল না, রন্ধনে তো নয়ই, ভক্ষণেও না। সুতরাং মগ বাবুর্চিদের ইংরেজ নবাবরা "heaven-born cooks" মনে করতেন। পদমর্যাদায় খিদমৎগারের পরে ছিল এই বাবুর্চিদের স্থান। চতুর্থ স্থান ছিল মশালচিদের। সাহেব নবাবের ভ্রমণ বা শিকারের সময় মশাল জ্বালিয়ে ধ'রে যারা তাঁর সঙ্গে যেত, তাদের বলা হ'ত মশালচি। কিন্তু ভ্রমণ বা শিকার সব সময় করা হ'ত না এবং মশালও সর্বক্ষণ জ্বালাবার দরকার হ'ত না। অন্য সময় মশালচিরা বাবুর্চি ও খিদমৎগারদের সহকারীর কাজ করত, যেমন কাঁটাচামচ কাপপ্লেট পরিষ্কার করা ইত্যাদি। পঞ্চম স্থান ছিল বেয়ারাদের এবং তার মধ্যে উড়িয়া ও বাঙালী হিন্দু বেয়ারাই ছিল বেশী। বেয়ারাদের মধ্যে কেউ পালকি বইত, কেউ হয়ত সাহেবদের ব্যক্তিগত হুকুম খাটত, বিছানা ঝাড়ত, জুতো ঝাড়ত, হুঁকোর কলকে বদলে দিত। টুকিটাকি যাবতীয় ফরমায়েস খাটা, পালকি বহন করা অথবা ব্রাউনবেরী ও চৌঘুরী ঘোড়ার গাড়ীর পিছনে দাঁড়িয়ে থাকাই ছিল বেয়ারাদের কাজ। এছাড়া দ্বারোয়ান বরকন্দাজরা ছিল, মেথর মেথরাণীরা ছিল, মালী ও আয়ারা ছিল, হুঁকোবরদার ও ধোপারা ছিল, জলটানার জন্য ভিস্তীরা ছিল, দরজীরা ছিল, জমাদাররা ছিল। ইংরেজ নবাবদের বসতবাড়ীটা ছিল যেন একটা বিরাট প্রতিষ্ঠানের মতন। খিদমৎগার বাবুর্চি মশালচি বেয়ারা দ্বারোয়ান বরকন্দাজ ভিস্তী হুঁকোবরদার জমাদার দরজী মালী আয়া মেথর মেথরাণী নিয়ে বিরাট একটা জম-জমাট কারবার। সবার উপরে চরম সত্যের মতন ছিল খানসামা। ছিল না শুধু, বিরাজ করত বলা চলে। সুতরাং খানসামাকে কেবল খানসামা মনে করা ভুল। কলকাতার ইংরেজ নবাবদের অন্দরমহলের দোর্দণ্ডপ্রতাপ অধীশ্বর ছিল খানসামা। তাকে ক্ষুদে-নবাব বললেও ভুল হয় না। সেকালের কোন মুনশী বা বেনিয়ানের চেয়ে সাহেবদের কাছে খানসামার প্রতিপত্তি কম ছিল না। 'ছকু খানসামা লেন' সেই প্রচণ্ড প্রতিপত্তির নগণ্য নিদর্শন মাত্র।

খানসামাদের তন্‌খাও সবচেয়ে বেশী, মাসে আট টাকা থেকে পঁচিশ টাকা পর্যন্ত। খিদমৎগারদের মাইনে ছ'টাকা থেকে দশ টাকা, বাবুর্চিদেরও তাই, মশালচিদের চার টাকা। কিন্তু খানসামার তন্‌খাটাই আসল রোজগার নয়, দস্তুরিটাই আসল। এই দস্তুরির জন্যই খানসামার খানসামাত্ব বজায় রাখা সম্ভব হ'ত। দৈনন্দিন হাটবাজারের ভার খানসামার উপর। বাজার থেকে প্রত্যেক বিক্রেতার কাছে তার দস্তুরি বাঁধা। টিরেটা বাজার হোক, আর জ্যাকসনের বা হাটখোলার শোভাবাজারের বাজারই হোক, প্রত্যেক বাজারে বিক্রেতারা খোদ সাহেবকে না চিনলেও, তাঁর বাড়ীর খানসামাকে বিলক্ষণ চেনে এবং দূর থেকে তাকে দেখলেই সেলাম করে। বাজারে ও পথেঘাটে সাহেবের চেয়ে এদেশী খানসামাদের খাতির বেশী। সেলামের ভীড় ঠেলে সাহেবের 'পেট্‌' খানসামাকে পথ চলতে হয়, বাজারঘাট করতে হয়। পদে পদে, প্রত্যেক লেনদেনের সঙ্গে দস্তুরি তার বাঁধা, সরকারী বিনিময়-হারের মতন। না চাইতেই পাওয়া যায়। সাধারণতঃ টাকায় দু'পয়সা ক'রে, বিশেষ ক্ষেত্রে টাকায় চার পয়সাও হ'তে পারে। দশ টাকা যদি মেমসাহেব বাজার করতে দেন, তাহ'লে পাঁচ আনা পয়সা যে খানসামার দস্তুরি হিসেবে প্রাপ্য তা তিনিও জানেন। হিসেব নেবার সময় সেটা বাদ দিয়েই হিসেব নেন। কিন্তু দস্তরি ছাড়াও দরের কারসাজিতে খানসামা আরও কিছু পায়। গড়ে তার 'নীট' রোজগার টাকায় এক আনা ক'রে ফেলেছেড়ে হয়। এ তো গেল বাজারের ব্যাপার। তা ছাড়া খানসামার আরও উপরি রোজগার আছে। ঘরকন্নার ব্যাপার দেখাশুনার ভার সম্পূর্ণ তার উপর। খিদমৎগার থেকে আরম্ভ ক'রে বেয়ারা ভিস্তী ধোপা মেথর-মেথরাণী পর্যন্ত সকলের নোকরি তার কৃপাদৃষ্টির উপর নির্ভর করে। খানসামার পাগড়ি টপ্‌কে সাহেবের অন্দরমহলে কারও কোন কাজে বহাল হবার উপায় নেই। সুতরাং সাহেব-বাড়ীর চাকরি করতে হ'লে (যেন সরকারী চাকরি আর কি!) খানসামাকে কিছু নজরানা দিতেই হয়। না দিয়ে উপায় নেই। মুসলমান খিদমৎগারই হোক, মগ বাবুর্চিই হোক, আর হিন্দু বেয়ারাই হোক, নজরানা না দিয়ে কারও নিস্তার নেই। এই নজরানা থেকেও খানসামার বাৎসরিক 'নীট' রোজগার অল্প নয়। এ ছাড়া 'বকশীস' বা 'টিপ্‌স' তো আছেই। বড় বড় ভোজসভায় বড়সাহেবদের ঝুনো খানসামারা মোটা মোটা বকশীস পেয়ে থাকে এবং অন্যেরা যা পায়

তার বক্‌রাও পায়। সব মিলিয়ে মোটামুটি খানসামার আয় যা হয়, তা দালাল গোমস্তা বেনিয়ান ভদ্রলোক বাবুদের রীতিমত হিংসে করবার মতন। কিন্তু তবু খানসামাদের ইতিহাস লেখা হয়নি, কারণ খানসামারা মধ্যবিত্ত "ভদ্রলোক" নয়। দালাল গোমস্তাদের ইতিহাস লেখা হয়েছে, কারণ তাঁরা মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক।

অনেক মুনশী, অনেক গোমস্তা, দালাল, বেনিয়ান ও বাজার সরকার ইংরেজদের কৃপায় হোমরাচোমরা হয়েছেন, রাজা মহারাজা খেতাব পেয়েছেন এবং প্রায় সেইজন্যই তাঁদের ইতিহাস সযত্নে লেখা হয়েছে। কিন্তু খানসামারা কোন খেতাব পায়নি ব'লে স্বনামধন্য হয়নি। তাদের ইতিহাসও কেউ লেখেননি। শুধু 'ছকু খানসামার' কথা বলছি না। হয়ত এরকম আরও অনেক খানসামা ছিল, যাদের খেতাব না থাকলেও, আর্থিক অবস্থা ভদ্রলোক দালালদের চেয়ে খারাপ ছিল না। বাজারে বেশ তাদের প্রতিপত্তি ছিল বোঝা যায়। বৃদ্ধ 'রিটায়ার্ড' খানসামাকে সামনে সকলেই সেলাম করত এবং পিছনে আঙুল দেখিয়ে বলত—'অমুক সাহেবের খানসামা'। খানসামার সেই 'স্বর্ণযুগ' ছেড়ে কতদূর আমরা এগিয়ে এসেছি তা আজও বিচার করা হয়নি এবং 'কলকাতা কালচারের' গোড়াপত্তনে সেই খানসামা-কালচারের দান কতটা, তাও কেউ ভেবে দেখেছেন বলে মনে হয় না। বিশেষ ক'রে, কলকাতার চাকুরিজীবী মধ্যবিত্ত কালচার এই খানসামা কালচারের কাছে যে কতটা ঋণী, তা বাস্তবিকই ভাববার বিষয়।

সম্পাদকীয়

সম্পাদক নয়, 'সম্পাদকীয়' সম্বন্ধে বলছি। সাংবাদিকের ভাষায় যাকে 'এডিটোরিয়াল' বা 'লীডার' বলা হয়। সাম্প্রতিক কালের 'সম্পাদকীয়' নয়, সংবাদপত্রের জন্মকালের সম্পাদকীয়। সম্পাদকরা তো নিশ্চয় পড়বেন, সংবাদপত্রের পাঠকরাও পড়বেন। শিশু-সংবাদপত্রের শিশু-সম্পাদকদের শিশুসুলভ 'সম্পাদকীয়' পড়লে আজকালকার সবচেয়ে গুরুগম্ভীর সম্পাদকও হেসে ফেলবেন। মহাভারতের কথার মতন 'সম্পাদকীয়ের' কথা অমৃত সমান না হলেও, উপভোগ্য।

আমাদের দেশের প্রথম সংবাদপত্র ইংরেজরা প্রকাশ করেন এবং ইংরেজরাই তার সম্পাদক ছিলেন। সাংবাদিকতা সম্বন্ধে ইংরেজরা আজও শ্রেষ্ঠত্বের গর্ব করেন এবং গর্ব তাঁরা সত্যিই করতে পারেন। ইংরেজরাই আমাদের সাংবাদিকতার দীক্ষাগুরু। এ-হেন গুরু-দেবদের এ-দেশে সাংবাদিকতার যৎকিঞ্চিৎ নিদর্শন দেখলে শিষ্যরা আজ আর হয়ত উপকৃত হবেন না, কিন্তু অবাক হবেন। যাঁরা সংবাদপত্রের প্রথম প্রবর্তক, সেকালের সেই ইংরেজ সাংবাদিকদের সংযম বা শীলনতাবোধ ব'লে বিশেষ কিছু ছিল না। তখন এদেশের ইংরেজ-সমাজের ঠিক যেরকম চেহারা ছিল, তাঁদের প্রথম সংবাদপত্রে আয়নার মতন সেই চেহারাটাই প্রতিফলিত হয়েছে। অবশ্য তাই হবার কথা, কারণ সংবাদপত্র সমাজের দর্পণ ছাড়া আর কি! 'সমাচার-দর্পণ' নয়, সংবাদপত্রকে 'সমাজ-দর্পণ' বলা চলে। হিকি সাহেব প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশ করেন ১৭৮০ সালে, নাম 'বেঙ্গল গেজেট'। কিন্তু তাল সামলাতে পারলেন না। এমন কদর্যভাবে ওয়ারেন হেস্টিংসের স্ত্রী সম্বন্ধে যা-তা লিখে ফেললেন যে, তাঁর কাগজ সরকারী আদেশে বন্ধ হয়ে গেল। একজনের স্ত্রী সম্বন্ধে সংবাদপত্রে লেখা, তাও আবার ওয়ারেন হেষ্টিংসের স্ত্রী সম্বন্ধে—সে যে কি ভয়ানক তাজ্জব ব্যাপার তা আজ আমরা কল্পনাই

করতে পারব না, এমনকি ভোটাভুটির খেউড়-লড়াইয়ের সময়ও নয়। লেডি হেস্টিংস তখনকার কলকাতার ফ্যাশান ও এটিকেট্‌কর্ত্রী ছিলেন, একবার তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য অনেকেই তখন খানা-পিনার সভায় ছোঁক ছোঁক ক'রে ঘুরে বেড়াতেন। শোনা যায়, মিসেস হেস্টিংস নাকি তখন কলকাতায় বসেও লণ্ডন প্যারিসের হাল-ফ্যাশানের খবর রাখতেন, তাঁর বিশেষ সংবাদদাতারা নিয়মিত চিঠিপত্র লিখে তাঁকে এই সব খবর যোগাতেন। একবার তিনি খবর পেলেন যে, লণ্ডনের সবচেয়ে স্মার্ট মেয়েরা নাকি এমন পোশাক পরতে শুরু করেছেন, যে তাঁদের যত বয়সই হোক, দেখলে কচি খুকি ব'লে মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে হেস্টিংসপত্নী একদিন হঠাৎ কচি খুকি সেজে এক ভোজসভায় উপস্থিত হয়ে কলকাতার অন্যান্য ইংরেজ মহিলাদের হকচকিয়ে দিলেন। মিসেস ফে (Fay) ভীষণ চটে' গিয়ে বললেন, ওটা "infantile simplicity" ছাড়া কিছু নয় এবং "her whole dress being at variance with our present modes." আর একবার মিসেস্ হেস্টিংস কোন এক মজলিসে মাথার চুল একেবারে আলুথালু ক'রে জড়িয়ে তাল পাকিয়ে উপস্থিত হলেন। চূড়াকার কবরী বেঁধে ড্রেসারের কাছ থেকে ড্রেসিং ক'রে, বাকি যে মহিলারা এসেছিলেন, তাঁদের তো প্রধানা লেডির এই কেশের অবস্থা দেখে চক্ষু স্থির হয়ে গেল। মিসেস ফে ব্যাপারটাকে "whim of the moment" ব'লে ঠাট্টা করলেন। যাই হোক, এইভাবে লেডি হেস্টিংস কলকাতার প্রধানা মহিলা হয়ে তখনকার কলকাতার ইংরেজ-সমাজকে নাচিয়ে বেড়াতেন এবং হিকি সাহেব হেস্টিংসের প্রতিদ্বন্দ্বীমহলেই বেশী মেলামেশা করতেন। কিন্তু তাহ'লেও হিকি সাহেবের কি হেস্টিংসপত্নী সম্বন্ধে মানহানিকর কিছু লেখা উচিত হয়েছিল ? আজকাল কত মহিলাই তো কতরকমের চাল-চলন ক'রে ঘুরে বেড়ান এবং তাঁরা নিশ্চয় কারও স্ত্রী, কারও ভগিনী বা কারও কন্যা। কিন্তু তার জন্য কি কোন সম্পাদক তাঁদের সম্বন্ধে যা-তা মন্তব্য ক'রে কাগজটাকে বন্ধ ক'রে দিতে চান ? অথচ ইংরেজ গুরুদের অবস্থা সেকালে এইরকমই ছিল। যেমন ছিল তাঁদের ইঙ্গ-সমাজ, তেমনি ছিল তাঁদের সংবাদপত্র। তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের অনাচার, ব্যভিচার, লোভ-হিংসা-বিদ্বেষ, অশিষ্টতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিচ্ছবি ছিল তাঁদের প্রথম যুগের সংবাদপত্রগুলি। মুনাফা নিয়ে মারামারি করা, স্ত্রীলোক ও মদিরা

৩

নিয়ে টানাটানি করা, প্রেম ক'রে নাকানিচোবানি খাওয়া এবং এ-দেশের লোকদের ক্রীতদাসের মতন চাবকানো—এই ছিল তখনকার কলকাতার ইঙ্গ-ভারতীয় সমাজের দৈনন্দিন কর্ম ও ধর্ম। এই সব উপকরণই তখন সংবাদপত্রের খোরাক যোগাত। তখন রাজনীতি বিশেষ ছিল না, পার্টি-পলিটিক্স তো ছিলই না, পার্লামেণ্টের অধিবেশনও ছিল না, কণ্ট্রোল-ডিকণ্ট্রোলের সমস্যা ছিল না, ক্রিকেট-ফুটবল খেলা ছিল না, এমনকি ইলেক্‌শনও ছিল না। সুতরাং সংবাদপত্রের আর কাজ কি? কিছু কিছু বিজ্ঞাপন ও নতুন নতুন ব্যবসার জিনিসপত্তরের খবর ছাপানো, টুকিটাকি নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি ছাপানো, মাঝেসাঝে দু'চারটে বিদেশের ও এদেশের রাজদরবারের চমকপ্রদ সংবাদ দেওয়া, আর লোকজনের পিছনে লাগা, বিশেষ ক'রে ফেউয়ের মতন মহিলাদের পিছনে লাগাই ছিল সম্পাদকদের অন্যতম কাজ। তাতেও তাঁদের কোনরকম সংযম বা শালীনতাবোধ ছিল না। অসংযমের মাত্রা তাঁরা এতদূর ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন যে, ১৭৯৯ সালে ওয়েলেসলি প্রথম প্রেস আইন জারী ক'রে সংবাদপত্রের স্বাধীন মতামত প্রকাশে হস্তক্ষেপ করেন। সেক্রেটারীকে আগে না দেখিয়ে কোন সংবাদপত্রে কিছু ছাপা চলবে না। যদি কোন সম্পাদক নিয়মভঙ্গ করেন, তাহ'লে তাঁকে ইয়োরোপে নির্বাসিত করা হবে। ইয়োরোপে নির্বাসন দেওয়ার কারণ হ'ল, তখনকার ইংরেজী সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন ইংরেজরা, বাংলা সংবাদপত্রও ছিল না, বাঙালী সম্পাদকও ছিলেন না কেউ। যে ইংরেজরা আমাদের দেশে ছাপাখানা ও সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা ক'রে যুগান্তর এনেছিলেন, সেই ইংরেজদেরই অপকর্মের ফলে সর্ব-প্রথম আমরা তার স্বাধীনতা হারালাম।

হিকির কাগজ হেস্টিংসপত্নীকে অপমান ক'রে বন্ধ হ'য়ে গেল। তারপর 'ইণ্ডিয়া গেজেট', 'ক্যালকাটা গেজেট', 'হরকরা' প্রভৃতি আরও কয়েকখানি কাগজ প্রকাশিত হ'ল। ১৭৮৪ সালে 'ক্যালকাটা গেজেট' প্রকাশিত হয় এবং তাতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর খবরাখবর ও বিজ্ঞপ্তি প্রচারের অনুমতি দেন কাউন্সিল। কিন্তু তাহ'লেও, সরকারী বিভাগের সঙ্গে সম্পাদকীয় বিভাগের একটা ব্যবধান ছিল এবং সম্পাদকও তাঁর নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলতেন। সংবাদ-পত্রে সম্পাদকীয় মন্তব্যের বিষয়বস্তু তখন খুব বেশী ছিল না। সেই সময় 'সম্পাদকীয়' স্তম্ভে যা প্রকাশ করা হ'ত তা আজ বোধ হয় কোন সম্পাদকই প্রকাশ করতে সাহস করবেন না, বরং লজ্জা

বোধ করবেন। কিন্তু আগেই বলেছি, তখনকার ইংরেজ সম্পাদকদের লজ্জা, মান, ভয় কোনটারই তেমন বালাই ছিল না এবং কোনটা নিয়েও তাঁরা সাংবাদিকতা করতেন না। সম্পাদকীয় স্তম্ভে মধ্যে মধ্যে যে উল্লেখযোগ্য বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা বা মন্তব্য একেবারেই করা হ'ত না তা নয়। ফরাসী বিপ্লবের খবর, ডাঃ জনসনের শবযাত্রার বর্ণনা, উইলিয়ম জোন্সের মৃত্যুর পর মন্তব্য, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ইত্যাদি বিষয়ও 'ক্যালকাটা গেজেটে' সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশ করা হ'ত। কিন্তু এসব বিষয় নিয়ে কদাচিৎ লেখার সুযোগ হ'ত। শুনলে হয়ত অবাক হবেন, সাধারণতঃ সম্পাদকীয় স্তম্ভে ছাপা হ'ত 'কবিতা' ও 'চুট্‌কি খবর'। আজকাল কবিতা ও কবির প্রাচুর্য নিয়ে আমরা ঠাট্টা বিদ্রূপ করে থাকি, আর সংবাদপত্রে কবিতার বিশেষ আমলও দেওয়া হয় না, সম্পাদকীয়তে তো নয়ই। 'ক্যালকাটা গেজেটে' কিন্তু ফ্রান্সিস গ্লাডউইন সাহেব মনের আনন্দে কবিতা ছাপতেন এবং রীতিমত কবিদের একটা 'কর্নারই' ছিল তাঁর পত্রিকায়। সংস্কৃত কবিতা, ফারসী কবিতা, লাতিন কবিতা বেছে বেছে অনুবাদ ক'রে দেওয়া হ'ত। শুধু অনুবাদ নয়, অরিজিনাল কবিতাও যথেষ্ট ছাপা হ'ত, এবং সত্যিই তার মধ্যে অরিজিনালটি আছে কি নেই, তা নিয়ে সম্পাদক মশায় বিশেষ মাথা ঘামাতেন না। 'ফিলিংটাই' তখন বিচার্য বিষয় ছিল। কেউ যদি সত্যি কোন অকৃত্রিম ফিলিং থেকে হৃদয়ের ভাবানুভাব কবিতায় প্রকাশ করতেন এবং সেই কবিতা--

"To The Editor of the Gazette

Sir,– By inserting the accompanying in your paper, you will oblige."

A well-Wisher."

—শুধু এইটুকু লিখে পাঠিয়ে দিতেন, তাহ'লে সম্পাদক মশায় তা বাতিল কাগজের বাস্কেটে ফেলে দিতেন না, সাগ্রহে ও সযত্নে ছাপাতেন, এমন কি তাঁর নিজের সম্পাদকীয় স্তম্ভে। আজকাল এরকম উদার সম্পাদক বাস্তবিকই দুর্লভ। কি জানি কেন, রাজনৈতিক নেতা, চোর ডাকাত খুনী, ব্যবসায়ী ইত্যাদি শ্রেণীর লোকজন এবং তাদের কার্যকলাপ ছাড়া আধুনিক সম্পাদকরা আর কাউকে বিশেষ আমল দিতে চান না, সম্পাদকীয় স্তম্ভে তো একেবারেই না। কবিদের কোন স্থান নেই, প্রেমিকদের তো একেবারেই নেই। তাই ব'লে আধুনিক সম্পাদকরা যে প্রেমিক বা কবি হ'তে পারেন না তা

নয়। কিন্তু যেকোন কারণেই হোক, সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রেম ও প্রেমিকদের কথা আলোচনা করা একেবারে যেন 'ট্যাবু'। তখনকার ইংরেজ সম্পাদকরাও এরকম বেরসিক ছিলেন না। প্রেমিক-দের ব্যর্থ প্রেমের কবিতা, বিশুদ্ধ প্রেমের কবিতা, তাঁরা সাগ্রহে প্রকাশ করতেন। প্রেমিকদের এইভাবে প্রচুর স্কোপ্ দিয়ে উৎসাহিত করা হ'ত। অবশ্য প্রেমটাও তখন একটা ভয়ানক ব্যাপার ছিল, এখনকার মতন এতটা সড়গড় ছিল না।

কলকাতার ইংরেজ-সমাজে তখন মেয়েরা অত্যন্ত দুর্লভ বস্তু ছিলেন। নবাবের কাছ থেকে নতুন সনদ পাওয়া, জমিদারী পাওয়া বা খিলাৎ পাওয়া তার চেয়ে অনেক সহজ ছিল। কিন্তু প্রেম করার মতন বা বিবাহ করার মতন মেয়ে পাওয়া ছিল অত্যন্ত কঠিন। ক'জন মেয়েই বা বিলেত থেকে বাংলাদেশে আসতেন? কোম্পানীর চাকরি নিয়ে বিলেত থেকে যে সাহেবরা এদেশে আসতেন, তাঁরা যে একটা খুব বেশী টাকা বেতন পেতেন তা নয়। খুব অল্প টাকাই তাঁরা বেতন পেতেন। তার জন্য তাঁদের সকলকেই গোপনে বেনামীতে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে হ'ত এবং সাধারণতঃ এদেশী বাঙালী গোমস্তা ও দালালদের সঙ্গে যোগসাজশ ক'রে তাঁরা উপ্রি অর্থ রোজগারের ব্যবস্থা করতেন। তাছাড়া, একাই তাঁরা আসতেন, অনেকটা দুঃসাহসিক যাত্রীর মতন, "কেরিয়ার" তৈরীর উদ্দেশ্যে। তারপর যখন অনেকে কেরিয়ার তৈরী ক'রে, সামান্য কেরানী থেকে গবর্ণর-জেনারেল পর্যন্ত হয়ে, প্রচুর ধনদৌলত সঞ্চয় ক'রে, দেশে ফিরতে লাগলেন এবং ইংরেজ "নবাব" ব'লে পরিচিত হলেন, তখন বিলেতের অবিবাহিত কন্যাদের বাপমায়েদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'ল। কিছু কিছু কুমারী কন্যা তখন তাঁরা কলকাতা শহরে চালান দিতে লাগলেন এবং সেই সময় থেকে বিলেতী কৌচগাড়ী, বিলেতী মদ, জুয়েলারী ইত্যাদির সঙ্গে বিলেতী তরুণীদেরও এদেশে আমদানি হ'তে থাকল। বিলেতী বাপমারা তাঁদের কন্যাদের পাঠাতেন সিভিলিয়ান, বড় অফিসার ইত্যাদি পাকড়াও করার জন্য। স্বল্প বেতনের যুবক ইংরেজ কেরানী কর্মচারীরা এই সব বিলেতী কুমারী-দের কাছে বিশেষ পাত্তাই পেতেন না। দূর থেকে তাঁরা দেখতেন, আর দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন। পাকা ঝুনো ইংরেজরা, যাঁরা প্রচুর অর্থ জমিয়েছেন, তাঁদের নিয়েই প্রচণ্ড কম্পিটিশান হ'ত এবং তাঁদের সাপ্লাই কম, ডিমাণ্ড বেশী ব'লে বিবাহ-বাজারে দামও চড়ে যেত

খুব। সুতরাং ইংরেজ তরুণীরাও সহজে "হাজব্যান্ড" নির্বাচন করতে পারতেন না এবং ইংরেজ তরুণরাও দূর থেকে হাহুতাশ করতেন। মধ্যে থেকে বিবাহযোগ্য তরুণ ও তরুণী উভয়েরই বয়স বাড়তে থাকত। সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা হ'ত ইংরেজ তরুণীদের। স্বামী-শিকারে ব্যর্থ হয়ে দিন গুণতে গুণতে তাঁরা প্রৌঢ়ত্বের কোঠায় পৌঁছতেন এবং সেটা ঢাকা দেবার জন্য মুখে রং ক'রে ঠিক আজকালকার একশ্রেণীর আধুনিকার মতন বিবাহ-বাজারে ঘুরে বেড়াতেন। এই নিয়ে ঠাট্টা ক'রে জনৈক ইংরেজ কবি একটি সুন্দর কবিতা লিখেছিলেন—

Pale faded stuffs, by time grown faint
Will brighten up through art ;
A Britain gives their faces paint,
For sale at India's mart.

কলকাতার ইংরেজ-সমাজের তখনকার প্রেমের বাজার ও বিবাহের বাজারের এই অবস্থাটা মনে রাখলে, "ক্যালকাটা গেজেট" পত্রিকার 'পোয়েটস্ কর্নার' এবং সম্পাদকীয় স্তম্ভে পর্যন্ত প্রেমের কবিতা ছাপার কারণ অনেকটা বোঝা যায়।

বিজ্ঞাপনে সেকাল

(এক)

সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের বিজ্ঞাপন ঠিক আয়নার মতন। তার মধ্যে সমাজের প্রতিচ্ছবি যেমন দেখা যায়, কোন সংবাদের মধ্যেও বোধ হয় তেমন দেখা যায় না।

এক সপ্তাহের "কর্মখালি" ও "কর্মপ্রার্থী" বিজ্ঞাপনের মধ্যে দেশের প্রকৃত সমস্যা যেমন নানাদিক থেকে ধরা পড়ে, এক বছরের সংবাদের স্তূপের মধ্যে তা পড়ে না। "পাত্র ও পাত্রী চাই" বিজ্ঞাপনগুলি যদি কেউ মন দিয়ে পড়েন তাহ'লে সমাজের নাড়ীর খবর জানতে পারবেন, যা কোনকালে কোন সংবাদের মারফৎ জানা যাবে না! যেমন, একদিন "পাত্র-পাত্রীর" বিজ্ঞাপনের মধ্যে দেখলাম, জনৈকা লেডী ডাক্তার নিজেই নিজের বিবাহের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছেন এই মর্মে যে, তিনি ভাল রোজগার করেন, বয়স তিরিশ প্রায়, স্বাস্থ্যও ভাল এবং বর্তমানে বিবাহ করবেন, সুতরাং রোজগারী, কর্মক্ষম যুবকদের তিনি দরখাস্ত করতে বলেছেন। এই ধরনের বিজ্ঞাপন সাধারণতঃ চোখে পড়ে না। বিজ্ঞাপন পড়ে ভাবলাম, কি হ'তে পারে? কিছুই না, খুব সহজ ব্যাপার। একালের মধ্যবিত্ত সমাজের এটা একটা বিষম সমস্যা। মেয়েদের লেখাপড়া শিখে রোজগার করতে হয়, বয়স বেড়ে যায় এবং বিবাহ আর ঘটে ওঠে না। হঠাৎ একদিন হয়ত যৌবনের প্রান্তে পৌঁছে চম্‌কে উঠতে হয়—তাইতো! লেডী ডাক্তার সেইরকম চম্‌কে উঠে একটা "ডেস্পারেট" সমাধান করেছেন এবং "বিজ্ঞাপন" দেওয়া ছাড়া তাঁর উপায় কি? এখন তো আর স্বয়ম্বরসভা ডাকা যায় না! এইরকম আরও অনেক বিজ্ঞাপনের ভিতর দিয়ে আমাদের সমাজের নানা-রকমের সমস্যা উঁকি মারে। "সংবাদের" মধ্যে যেসব সমস্যা আত্ম-গোপন ক'রে থাকে, "বিজ্ঞাপনের" মধ্যে আত্মপ্রকাশ না ক'রে তাদের

উপায় নেই। কারণ "বিজ্ঞাপন" হ'ল "বিশেষভাবে জ্ঞাপন", লুকোচুরির কোন অবকাশ নেই তার মধ্যে।

এই বিজ্ঞাপনের ভেতর দিয়েই সেকালের সমাজের এমন সব অদ্ভুত বিচিত্র পরিচয় পাওয়া যায়, যা কোন ইতিহাসগ্রন্থে পাওয়া যায় না। কারণ ইতিহাস যাঁরা এতদিন ধ'রে লিখে এসেছেন তাঁরা অধিকাংশই যান্ত্রিক ঘটনাক্রমকে "ইতিহাস" ব'লে মনে করেছেন, মানুষের মনোভাব, রীতিনীতি, আচারব্যবহার, শিক্ষাদীক্ষা ইত্যাদিকে ইতিহাস আখ্যা দেননি। সমাজের ইতিহাস সাধারণ মানুষে কিন্তু নানাভাবে লিখে গেছে। তার মধ্যে "বিজ্ঞাপন" একটি। সংবাদপত্রের "সংবাদ" হ'ল সমাজের হোম্‌রাচোম্‌রা যাঁরা তাঁদের জন্য, সুতরাং তার মধ্যে সমাজের পূর্ণাঙ্গ ছবির বদলে বিকলাঙ্গ ছবি পাওয়াই সম্ভবপর। "বিজ্ঞাপন" সকলের জন্য, পয়সা দিলেই হয়। সুতরাং "বিজ্ঞাপনের" মধ্যে সমাজের যে ছবি ফুটে ওঠে তা "সংবাদের" চেয়ে অনেক বেশী পূর্ণাঙ্গ। এই ধরনের একটা সেকালের ছবি এখানে কয়েকটি টুকরো "বিজ্ঞাপনের" ভেতর দিয়ে কেমন সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে দেখবেন। 'সেকাল' বলতে আমি ইংরেজ আমলের প্রথমপর্বে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, বাংলার সমাজের কথা বলছি। বাঙালীদের কথা নয়, কারণ বাঙালী সমাজের কথা আরও অনেক সূত্রে জানা যায়। এখানে ইংরেজ ও অন্যান্য জাতের কথা বলা হয়েছে। বিজ্ঞাপনগুলি প্রধানতঃ "ক্যালকাটা গেজেট" পত্রিকা থেকে সংকলিত।

১৭৯৪ সালে কলকাতার কোন পত্রিকায় এই মর্মে একটি বিজ্ঞাপন ছাপা হয়ঃ "একজন মহিলার জন্য পরিচারিকা চাই। পরিচারিকার ইংরেজীতে কথাবার্তা বলতে জানা চাই এবং কোন ইউরোপীয়ানের কন্যা, অথচ এদেশী স্ত্রীলোক হলেই ভাল হয়। টিরেটা বাজারের কাছে মিঃ দা সুজার কাছে খোঁজ করুন।" বিজ্ঞাপনটির মধ্যে সেকালের সমাজের এমন একটা ছবি ফুটে উঠেছে যা অনেক সংবাদ ঘেঁটেও পাওয়া যাবে না। "ইউরোপীয়ানের কন্যা অথচ নেটিভ বা এদেশী স্ত্রীলোক" বলতে কি বোঝায় তা ব্যাখ্যা ক'রে বলার নিশ্চয় দরকার নেই। আমাদের দেশী সমাজে তখন ইংরেজদের "ইম্পিরিয়ালিজম" যে পারিবারিক জীবন পর্যন্ত ধাওয়া করেছে তা এই বিজ্ঞাপন থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। তা ছাড়া, ইংরেজদের নৈতিক অবস্থা এবং কতকটা আমাদেরও, বুঝতে কষ্ট হয় না।

আর একটি "বিজ্ঞাপনে" (১৮০১ সালে) দেখা যায়, জনৈক শেরীফ আব্রাহাম শ্রীরামপুর থেকে জানাচ্ছেনঃ "সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে আমার স্ত্রী, শ্রীমতী হর্‌রপসীমি শেরীন, চুঁচড়োর আর্মেনিয়ান মুল্লুকসেটের কন্যা, গত ৪ঠা ডিসেম্বর (১৮০০) আমার বাড়ী থেকে অকারণে, কিছু না বলে ক'য়ে, চম্পট দিয়েছে। সুতরাং শ্রীমতী যদি কারও কাছ থেকে টাকা-পয়সা ধার নেয় তার জন্য আমি দায়ী হব না।" লম্পট না হয়েও গৃহিণীর চম্পট দেওয়ার ব্যাপারটা শুধু আমাদের সমাজে নয়, ওদের সমাজেও বেশ চালু ছিল দেখা যায়। অর্থাৎ উভয় সমাজেরই অবস্থা একই, কে কাকে দেখে ঠিক নেই। তবে বিদেশীদের চারিত্রিক চিত্রটা আরও অনেক স্পষ্ট। তখন অর্থশোষণই যে তাদের জীবনের চরম লক্ষ্য ও কাম্য ছিল, তা এই বিজ্ঞাপনের মধ্যে উগ্রভাবে ফুটে উঠেছে দেখা যায়। স্ত্রী পলাতক, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, সাহেবের মাথায় তখন টাকা ধারের সমস্যা খেলছে। বিজ্ঞাপনও সেই জন্য দেওয়া, পলাতক স্ত্রীর কোন খোঁজখবরের জন্য নয়।

বইচুরিরও একটা মজার "বিজ্ঞাপন" পাওয়া যায়। "Lent or lost some years since" এই হ'ল বিজ্ঞাপনের হেডিং। ভদ্রলোক বইখানা কাউকে ধার দিয়েছেন, কি সত্যি চুরি গেছে, তা সঠিক জানেন না, তাই "Lent or Lost" এবং কবে গেছে তাও জানা নেই ব'লে "some years since." বিজ্ঞাপনটির মর্ম এইঃ "১৭৬০ সালে মিলার কোম্পানীর ছাপা পোপের গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ড। কভারের ভেতরের দিকে মালিকের নাম লেখা আছে। যদি কারও কাছে বইখানা থাকে, তিনি যেন ফেরত দেন। আর তার জন্য যদি কেউ পুরস্কার চান, তাহ'লে বইয়ের মালিক প্রকাশককে জানাতে পারেন। প্রকাশক পুরস্কার হয়ত দিতেও পারেন, কারণ এই বইয়ের অভাবে তিনি পরবর্তী সংস্করণ ছাপতে পারছেন না।" এখানেও লক্ষণীয় হচ্ছে, অর্থলোভ ও কার্পণ্য। বই ফেরত দিলে তার মালিক যিনি তিনি যে কোন পুরস্কার দেবেন, এমন কথা বলছেন না, প্রকাশককে জানাবেন বলছেন। একে "লেণ্ট বা লষ্ট", তার ওপর "কয়েক বছর আগে" এবং সবার উপর, ফেরত দিলে অন্যকে পুরস্কারের জন্য জানানো—সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে একটা বিচিত্র মনোভাব ও চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায় না কি? এই শ্রেণীর বিদেশীরাই প্রথম যুগে আমাদের দীক্ষাগুরু ছিলেন।

জনৈক ডাঃ ডিনউইডি ১৭৯৫ সালে এক বিজ্ঞাপনে জানাচ্ছেন যে, দর্শন ও রসায়ন-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি ২৫ থেকে ৩০টা বক্তৃতা দেবেন। বক্তৃতা শোনার ফি হ'ল ১০ সোনার মোহর। জানি না, এখন কোন দর্শন বা বিজ্ঞানের পণ্ডিতের পক্ষে এই ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়ার সাহস হবে কি না। সাহস হলেও, দশটা পয়সা দিয়েও কেউ তাঁর বক্তৃতা শুনতে যাবে না, মোহর তো দূরের কথা। সিনেমার কোন অভিনেত্রী যদি বক্তৃতা দেন, তাহ'লে হয়ত দশটাকা পর্যন্ত টিকিট বিক্রী হ'তে পারে।

এই সময়কার আর একটি বিজ্ঞাপনের অন্তর্নিহিত রহস্য আমি অনেক ভেবেচিন্তেও উদ্‌ঘাটন করতে পারিনি। বিজ্ঞাপনটির মর্ম এইঃ "বৈঠকখানা রোডে ডিরোজিওর (কোন্ ডিরোজিও?) বাড়ীর ঠিক সামনে নিচের তলায় দু'খানা ঘর, একটা বড় হলঘর, কয়েকটি দোকানঘরসহ একত্রে ভাড়া দেওয়া বা বিক্রী করা হবে। কোন মহিলা ভাড়াটে বা ক্রেতা চাই। বিস্তারিত বিবরণের জন্য বৌবাজারের মিঃ জন এ্যাথানাস সাহেবের কাছে খোঁজ করুন।" এখন বলুন, বৌবাজারের এই সাহেব বাড়ীওয়ালা মহিলা ভাড়াটে বা ক্রেতা চান কেন? "Premises would be a desirable gift to a woman" —কথাটা লেখারই বা উদ্দেশ্য কি? কেরী সাহেব এই বিজ্ঞাপনটি সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন "Rather a strange gift to a woman"! বাস্তবিকই তাই।

এখন তো অনেকেই লণ্ড্রীতে কাপড়চোপড় কাচান এবং অনেকের ষ্টীমে না কাচালে চলে না। তখন এইভাবে কাপড় কাচানো সম্ভব ছিল না। ১৭৮৭ সালে মেসার্স ডেভিডসন এ্যাণ্ড কোং বিজ্ঞাপন দিয়ে জানাচ্ছেন যে, এণ্টালিতে তাঁরা কাপড় ধোলাইয়ের ব্যবসা খুলেছেন। স্বচ্ছন্দে তাঁদের কাছে কাপড় কাচানো যেতে পারে। কাপড় কাচার "রেট" হ'চ্ছে এইঃ পুরুষ বা মহিলা—প্রতি মাসে ৬৲, কিশোর (৭—১২)—প্রতি মাসে ৪৲, বালক (১—৬)—প্রতি মাসে ২৲ এবং ভৃত্য—প্রতি মাসে ১৲—'রেট' মাসিক এবং কাপড় হিসেবে নয়, বয়স ও সামাজিক মর্যাদা হিসেবে।

১৭৯৫ সালের এক বিজ্ঞাপনে বলা হচ্ছে যে, ৫নং কোর্ট হাউস লেনে একটি সুন্দর দোতলা বাড়ী বিক্রী করা হবে। বাড়ীটির অন্যতম সুবিধা হচ্ছে যে কোন ধুলো বা গোলমাল নেই— "Free from dust and noise" —এবং পাশেই রাধাবাজার। বাড়ীটির

সংলগ্ন একটি চমৎকার বাগানও আছে। মাত্র ১৫০ বছর আগে রাধাবাজারের কাছাকাছি জায়গার অবস্থা কি ছিল বুঝুন, এখন ভাবলেও ভয় হয়। এখন রাধা বা শ্যাম যেকোন বাজারের দিকে তাকালে মনে হয়, কোথায় বা বাগান ছিল, আর কোন্ বাড়ীই বা "Free from dust and noise" ছিল!

কলকাতার রাস্তায় তখন গরু বা ষাঁড়ের চেয়ে ঘোড়া চ'রে বেড়াত বেশী। অনেক দিন ধ'রে এই ভ্রাম্যমাণ ঘোড়াদের দেখতে দেখতে এক সাহেবের উর্বর মস্তিষ্কে এক অভিনব প্ল্যান গজিয়ে উঠলো। ১৭৯১ সালের ২৮শে এপ্রিল, 'ক্যালকাটা গেজেটে' সাহেব এই মর্মে এক বিজ্ঞাপন দিলেন ঃ "ঘোড়াগুলো এইভাবে বেফায়দা নিষ্কর্মার মতন ঘুরে বেড়ায়, দেশের কোন কাজে লাগে না। আমি তাই ভেবেছি, যদি ধ'রে ধ'রে তাদের বংশবৃদ্ধি করানো যায়, তাহ'লে তাতে দেশের অনেক উপকার হ'তে পারে। আমার বিশ্বাস ঘোড়ার মালিকরা আমার এই প্রস্তাব সমর্থন করবেন। যদি করেন তাহ'লে ক্যালকাটা গেজেটের প্রিন্টারের কাছে তাঁরা যেকেউ আমার এই বিজ্ঞাপনের খরচটা পাঠিয়ে দেবেন। খরচ পেয়ে গেলেই আমি পূর্ণোদ্যমে আমার প্ল্যান কার্যকর করতে লেগে যাবো।" অভিনব পরিকল্পনা যে কেবল একালেরই একচেটে তা নয়, সেকালেও ছিল এবং সাহেবদের মাথা যে কিরকম সাফ্ ছিল তা তো বুঝতেই পারছেন। "ক্যালকাটা গেজেটের" মতন কাগজেও এই বিজ্ঞাপন ছাপা হ'ত।

(দুই)

সীটন-কার সাহেব 'ক্যালকাটা গেজেট' পত্রিকার সংবাদ, সরকারী নোটিশ, সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ও বিজ্ঞাপন সংকলন করেছেন সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ হিসেবে। আজকাল কোন ঐতিহাসিক বা সমাজবিজ্ঞানী এসব কাজ করা প্রয়োজন বোধ করেন না। এর মধ্যে সীটন-কার সাহেব বলেছেন যে, বিজ্ঞাপনগুলি হ'ল "the most interesting of the whole. It throws light on the minutest details of the inner and domestic life of the English community of Calcutta and the Bengal Presidency."সুতরাং আবার বলছি, বিজ্ঞাপন উপেক্ষণীয় নয়, সামাজিক ইতিহাসের দিক দিয়ে অত্যন্ত মূল্যবান উপকরণ। আরও কয়েকটি বিজ্ঞাপন তাই এখানে সংকলন ক'রে দিলাম।

১লা এপ্রিল, ১৭৮৪ সাল ঃ চীনদেশবাসী টম ফ্যাট কলকাতা শহরের বাসিন্দাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছেন যে, যাঁদের বসত বাড়ীতে, বাগানে বা অন্যত্র কোথাও ডোবা পুষ্করিণী ইত্যাদি আছে তাঁরা যদি তাঁকে জানান তাহ'লে তিনি পরিষ্কার ক'রে দেবার উত্তম ব্যবস্থা করতে পারেন, খুব অল্প খরচে। টম্ ফ্যাট বিজ্ঞাপনে একথাও জানিয়েছেন যে, তিনি যেকোন বাঙালীবাবুর চেয়ে কাজটা আরও সহজে করতে পারবেন, কারণ তাঁর 'চীনা পাম্প' আছে। যদি কোন ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করতে চান তাহ'লে তিনি যেন কলকাতার ঠিক উল্টোদিকে সাল্‌খেতে (হাওড়া) তাঁর রমের (মদ) কারখানাতে খোঁজ করেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ টম ফ্যাট রুটি দিয়ে খাবার মতন বেশ ভাল চিনিও তৈরী করেন, বিদেশী চিনির চেয়ে কোন অংশেই খারাপ নয়। এছাড়া চীনা কারিগরের কাঠের আসবাবও তৈরী করা হয়।

কলকাতার 'চীনা টাউন' গড়ে ওঠার আগেকার ইতিহাসের আভাস এই বিজ্ঞাপনের ভিতর থেকে পাওয়া যাবে। টম ফ্যাটের 'চীনা পাম্পটি' বিশেষ উল্লেখযোগ্য, কারণ এই পাম্প দিয়ে তিনি বাঙালী বাবুদের ট্যাঙ্ক-পরিষ্কার করার কনট্রাক্টরী ব্যবসা থেকে

ছড়িয়ে দিচ্ছেন। তখন কলকাতার অধিকাংশ লোকের বাড়ীতে যে ডোবা, পুকুর, ট্যাংক ইত্যাদি থাকত তাও বোঝা যাচ্ছে। তা ছাড়া, জুতোর ব্যবসা যে চীনাদের প্রথম ও প্রধান ব্যবসা নয়, তাও জানা যায়। টম ফ্যাটের শুধু যে ট্যাংক সাফ করবার 'চীনা পাম্প' ছিল তা নয়, সালখেতে মদ চোলাইয়ের (রম) কারখানা ছিল, চিনির ব্যবসা ছিল এবং ফার্ণিচারেরও কারবার ছিল।

২৯শে এপ্রিল, ১৭৮৪ : একখানা ফীটন গাড়ী, একখানা চার স্প্রীংযুক্ত বগি, একখানা দুই স্প্রিংযুক্ত বগি, একটা সুদৃশ্য পাল্কী (মহিলাদের) এবং একটা চেয়ার বসানো ভদ্রলোকের পাল্কী বিক্রী করা হবে। প্রত্যেকটি গাড়ী ও পাল্কী খুব মজবুত ক'রে তৈরী এবং প্রায় নতুনের মতন আছে। রাধাবাজারে ম্যান সাহেবের কাছে খোঁজ করুন।

আজকালকার সংবাদপত্রে 'বিক্রয়ের' বিজ্ঞাপন খুঁজে এর মধ্যে একটি জিনিসও কেউ বার করতে পারবেন না—ফীটন, বগি, লেডীদের পাল্কী, ভদ্রলোকদের পাল্কী, কোনটাই না।

৩রা জুন, ১৭৮৪ঃ আগামী ১১ই জুন শুক্রবার ডানকান সাহেবের নিলাম ঘরে এই বিশাল বাগানটি বিক্রী করা হবে। বাগানটির বিবরণ এইঃ বাগানটি হ'ল ঠিক 'বৈঠকখানার' মধ্যে—পূর্বদিকে তার মারাঠা-খাত, উত্তরে পিটার সুকিয়ার (যার নামে সুকিয়া ষ্ট্রীট?), পশ্চিমে চৈতন বসাকের এবং দক্ষিণে মুঙ্গরো জমাদারের বাগান। বাগানটি প্রায় চার বিঘা সাড়ে এগার কাঠা জমির উপর এবং তার মধ্যে একটি মাছভরা, সানবাঁধানো ঘাটওয়ালা বেশ বড় ট্যাংক আছে। এ ছাড়া বাগানের মধ্যে ৫০০ ফলের গাছ আছে নানারকমের।

মারাঠা-খাত, পিটার সুকিয়ার বাগান, চৈতন বসাকের বাগান দিয়ে ঘেরা এই বাগানটি বৈঠকখানা অঞ্চলে কোথায় ছিল, কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ খুঁজে বার করতে পারবেন কি? একটা বাগান কেন, চারিদিকেই তো বাগান ছিল, এমন কি মুঙ্গরো জমাদারের বাগান পর্যন্ত। এতগুলি বাগান বৈঠকখানা অঞ্চলে কোথায় ছিল? বেশ বোঝা যাচ্ছে, কলকাতা শহরের বৈঠকখানা অঞ্চল তখন বাগানে বাগানে বাগানময় ছিল, এখন তার কোন চিহ্ন কোথাও নেই।

২রা সেপ্টেম্বর, ১৭৮৪ঃ মেসার্স উইলিয়াম এ্যান্ডলী একটি চমৎকার ঘোড়া বিক্রী করবেন। বগির পক্ষে ঘোড়াটি খুব ভাল,

দৌড়ানোয় ওস্তাদ। মূল্য ৩০০ সিক্কা টাকা।

এই জীবটিও এখন আর বিক্রীর জন্য বিজ্ঞাপিত হয় না। তখন খুবই হ'ত, কারণ বগি, ফীটন বিক্রী হলে, ঘোড়া বিক্রী তো হবেই।

২৫শে নভেম্বর, ১৭৮৪ : আধডজন ভাল লেখক চাই। হাতের লেখার এক পৃষ্ঠা নমুনাসহ দরখাস্ত না করলে, কোন দরখাস্ত বিবেচনা করা হবে না। এজেন্সী অফিসে 'এ বি'র কাছে দরখাস্ত করুন। যাঁদের হাতের লেখা ভাল নয় এবং তাড়াতাড়ি লিখতে পারেন না, তাঁরা দরখাস্ত করবেন না।

আজকাল শুধু এই কোয়ালিফিকেশন নিয়ে চাকুরী পাওয়া খুব মুশকিল।

৩রা মার্চ, ১৭৮৫ : আগামী ৭ই মার্চ সোমবার মিঃ বন্তফিল্ড ওল্ডকোর্ট হাউসে ওয়ারেন হেস্টিংসের এই মূল্যবান জিনিসগুলি নিলামে বিক্রী করবেন। নগদ টাকায় ক্রেতাদের কিনতে হবে, এবং পাঁচ দিনের মধ্যে নিলামঘর থেকে মাল সরিয়ে না নিলে আবার তা নিলাম করা হবে। তার একটা তালিকা দেওয়া হ'ল :

প্লেট, ফার্নিচার, ছবি (অরিজিনাল পেণ্টিং) ও প্রিণ্ট, বড় অর্গান, মূল্যবান অশ্বসজ্জা, কারুকার্যখচিত হাতির হাওদা, ভাল ভাল বাহারে পাল্কী কয়েকটা, দামী কার্পেট ও সতরঞ্চ, বিলাসভ্রমণের উপযুক্ত সাজানো নৌকা, ভাল বিলেতী ঘাসকাটা যন্ত্র, কয়েকটা তাঁবু এবং আরও নানারকমের খুচরো জিনিস। নগদ টাকা ছাড়া কোন জিনিস হাতছাড়া করা হবে না।

নিলেমে বিক্রী হচ্ছে, তবু নগদ টাকার উপর ঝোঁকটা খুব বেশী এবং বিজ্ঞাপনে একটু বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। হয়ত ওয়ারেন হেষ্টিংসের নির্দেশেই নিলামওয়ালা করতে বাধ্য হয়েছেন। যাই হোক, নিলেমের বস্তুগুলি খুব "ইণ্টারেষ্টিং" নয় কি? যেমন, অশ্বসজ্জা, হাতির হাওদা, পাল্কী, নৌকা ইত্যাদি। তখনকার দু'চার জন বাঙালীবাবু (রাজা নবকৃষ্ণের মতন) নিলেম থেকে এসব জিনিস কিছু নিশ্চয় কিনেছিলেন। যদি সেগুলো সঞ্চিত হ'ত এবং মিউজিয়মে আসত, তাহ'লে আজ আমরা দেখতে পেতাম।

কর্মপ্রার্থী—১০ই মার্চ, ১৭৮৫ : বিবাহিত দম্পতি। স্ত্রী যিনি তিনি খুব ভাল "হেয়ার ড্রেসিং" জানেন এবং কোন সম্ভ্রান্ত লেডির পরিচারিকা হতে পারেন। স্বামী জন্ম থেকেই কচুয়ানি বা গাড়োয়ানি শিখেছেন এবং একাজ ভালই করতে পারবেন।

দম্পতি যে দারুণ দম্পতি তাতে কোন সন্দেহ নেই। স্বামী কচুয়ানি করবেন এবং স্ত্রী মনিবপত্নীর কেশপরিচর্যা করবেন, খুব চমৎকার আইডিয়া। আজকাল কোন মোটর ড্রাইভারের স্ত্রীর পক্ষে একাজ পাওয়া সম্ভব নয়, বড় জোর আয়ার কাজ পেতে পারেন। তার কারণ এখনকার মেমসাহেবদের কেশ অধিকাংশই উৎপাটিত, পরিচর্যার সুযোগ নেই। তখন কিন্তু মেমসাহেবরা কায়দা ক'রে চুল বাঁধতেন, খোঁপাও করতেন।

২১শে এপ্রিল, ১৭৮৫ ঃ কলকাতা শহরের ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন ক'রে হোন্ সাহেব তাঁদের অবগতির জন্য জানাচ্ছেন যে, সপ্তাহে তিনদিন ক'রে তিনি তাঁর আস্তানায় ড্রয়িং ও পেণ্টিং শিক্ষা দেবেন। যাঁরা হোন্ সাহেবের কাছে এই সুকুমারকলা শিখতে চান তাঁরা চিঠি পাঠিয়ে তাঁর কাছ থেকে পারিশ্রমিকের রেট জনতে পারেন, অথবা সোজা নিজেরা এসে রাধাবাজারে দেখা করতে পারেন তাঁর বাড়ীতে।

এদেশে আর্ট শিক্ষার সূত্রপাত কিভাবে হয়েছে তা আর্টের ছাত্র, মাষ্টার ও আর্টিষ্টদের জেনে রাখা দরকার। মোটকথা, আর্টস্কুল হবার অনেক আগে থেকেই তা আরম্ভ হয়েছে।

১লা ডিসেম্বর, ১৭৮৫ ঃ ইয়োরোপের বিখ্যাত হেয়ার ড্রেসার মালভের সাহেব কলকাতায় এসে কেবল শহরের সম্ভ্রান্ত লেডিদের জানাচ্ছেন যে, তিনি মাসে দুই সোনার মোহরের বিনিময়ে নিয়মিত কেশপরিচর্যার ভার নিতে রাজী আছেন। ফিতে ও ফুল দিয়ে হালফ্যাশানে চুল বাঁধতে তাঁর সমকক্ষ নাকি আর কেউ নেই। অল্প পারিশ্রমিকে তিনি "স্লেভদের" (দাসদের) শিক্ষা দিতেও পারেন। হার্মনিক ট্যাভার্নের পিছনে খোঁজ করুন।

ইংরেজ মহিলাদের হেয়ারড্রেসিঙের প্রাধান্যটা বুঝুন। ইউরোপ থেকে ড্রেসাররাও আসতেন কলকাতায়, ব্যবসায়ের জন্য! ফিতে ও ফুল দিয়ে মেয়েদের চুল বাঁধতে তাঁরা ওস্তাদ ছিলেন। আবার এদেশের দাসদের শিক্ষাও দিতেন তাঁরা ('স্লেভ' কথাটি এখানে লক্ষ্য করবার মতন)। কোথায় গেলেন এই সব গুণী সাহেব?

৩০শে অক্টোবর, ১৭৮৮ ঃ বিখ্যাত হেয়ারড্রেসার লাফ্লোর সম্প্রতি প্যারিস থেকে কলকাতায় এসেছেন ভদ্রলোক ও মহিলাদের চুল ছাঁটবার জন্য। তাঁর রেট হ'ল এই ঃ

মহিলাদের কেশবিন্যাস	ঃ	৪্ টাকা
ভদ্রলোকের ”	ঃ	৪্ টাকা
চুল ছাঁটাই ”	ঃ	৬্ টাকা

যাঁরা মাসিক হিসেবে তাঁর সঙ্গে বন্দোবস্ত করতে চান তাঁরা আলাদা দেখা করুন—কর্নেল পিটার মারীর বাড়ীর পাশের লেনে ৭৩নং।

শুধু বিলেত থেকে নয়, প্যারিস থেকেও হেয়ারড্রেসার আসতেন। রেট অবশ্য ভয়ানক, তবু যাঁরা চুল ছাঁটতেন ও কেশবিন্যাস করতেন, তাঁদের কাঁচা পয়সার তখন অভাব ছিল না। মগের মুল্লুকের লুটের পয়সা চুল ছেঁটেই তাঁরা যা খরচ করতেন তা থেকে অন্যান্য খরচের বহর বোঝা যায়। এও জানা যায় যে, কলকাতা শহরে হেয়ার-ড্রেসিং অন্যতম ব্যবসা তো বটেই, প্রাচীনতম ব্যবসা।

৬ই সেপ্টেম্বর, ১৭৮৭ ঃ ওয়ারেন হেষ্টিংসের সম্পত্তি—কালো কাঠের একটি ব্যুরো, হয় তাঁর বাংলাদেশ ছেড়ে যাবার সময় চুরি গেছে, অথবা নিলামে অন্যান্য মালপত্রের সঙ্গে ভুলক্রমে বিক্রী হয়ে গেছে। এই কাঠের ব্যুরোর মধ্যে হেষ্টিংস সাহেবের অনেক দরকারী গোপন কাগজপত্র ও চিঠি ছিল এবং কয়েকখানা ছোট ছোট ছবিও ছিল। মিঃ লার্কিনস্ ও মিঃ টম্সন জানাচ্ছেন যে যদি কেউ উক্ত ব্যুরোর সন্ধান দিতে পারেন, অথবা তার ভিতরের কাগজপত্র উদ্ধার করতে পারেন, তাহ'লে তাঁকে দুই হাজার সিক্কা টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

কাগজপত্রগুলো যে রীতিমত দরকারী বা ঐতিহাসিক দলিলের মতন মূল্যবান ছিল, তা ওয়ারেন হেষ্টিংসের ব্যাকুলতা দেখেই বোঝা যায়। পরে হেষ্টিংস সাহেব চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন এই ব্যুরো সম্বন্ধে ঃ "It contained many letters and other papers which I would not for the world have seen by strangers." কিন্তু ব্যুরোটা গেলই বা কোথায়? হয় কেউ নিলেমের মালের সঙ্গে কিনেছিলেন, অথবা চুরি করেছিলেন। অথচ তার খোঁজখবর যদি এখনও কোন সূত্রে পাওয়া যেত তাহ'লে হয়ত ইতিহাসের অনুসন্ধানী ছাত্রদের সুবিধা হ'ত অনেক। অবশ্য দুহাজার সিক্কা টাকা পুরস্কার আর কেউ পাবেন না এখন।

জেণ্টুদের দুর্গোৎসব

Doorga Pujah...is the grand general feast of the Gentoos, usually visited by all Europeans (by invitation) who are treated by the Proprietor of the feast with the fruits and flowers in season, and are entertained every evening whilst the feast lasts, with bands of singers and dancers.

—Holwell : Interesting Historical Events, 1766.

"দুর্গাপূজা 'জেণ্টুদের' বা বাবুদের সবচেয়ে গ্র্যাণ্ড বা জমকালো উৎসব। সাধারণত সাহেবরাও এই উৎসবে যোগদান করার জন্য আমন্ত্রিত হন এবং উৎসবের কর্তারা নানারকমের ফলফুল দিয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা করেন। উৎসবকালে প্রতি সন্ধ্যায় নাচগানের ব্যবস্থাও করা হয়।" আজ থেকে প্রায় দু'শ বছর আগে হলওয়েল সাহেব কলকাতার দুর্গোৎসব সম্বন্ধে এই কথা লিখে গেছেন। কোম্পানীর আমলের কথা, হলওয়েল তখন ছিলেন কলকাতার জমিদার। প্রায় এই সময় দেখা যায়, মহারাজা নবকৃষ্ণ তাঁর কোন এক বন্ধুকে লিখছেন : "এবার পূজার সময় লর্ড ক্লাইভ আমার বাটীতে অনুগ্রহপূর্বক প্রতিমা দর্শন করিতে আসিবেন। তাঁহার সহিত কোম্পানীর বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকিবেন। তোমার আসা চাই," ইত্যাদি। হলওয়েল সাহেবের কথার সমর্থন মহারাজা নবকৃষ্ণের চিঠিতে পাওয়া যাচ্ছে। শোভাবাজারের রাজা মুনশী নবকৃষ্ণ তখন উত্তর কলকাতার তালুকদার। কলকাতার বৃটিশ জমিদার ও বৃটিশের তৈরী দেশী নয়া-তালুকদাররা অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগ থেকে দুর্গোৎসবের রূপ বদলাচ্ছিলেন। বদলাবার প্রধান স্থান হ'ল বৃটিশ আমলের নতুন রাজধানী কলকাতা শহর। অর্থাৎ দুর্গোৎসব শেষ পর্যন্ত বৃটিশ-যুগের নয়াকলকাতা কালচারের একটা প্রধান অঙ্গ হয়ে উঠলো। কলকাতা কালচারের সমস্ত বৈশিষ্ট্য এসে দুর্গোৎসবকে "grand general feast of the Gentoos" ক'রে তুললো। দুর্গোৎসবের এই ভেরিয়েশন বা প্রকরণভেদ বাঙালীর সংস্কৃতির ইতিহাসে নিশ্চয় একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

নব্যযুগের কালচারের এই বিশেষ তরঙ্গও কিন্তু ঐতিহাসিক পথ ধরেই মহানগরের দিকে এগিয়ে এসেছে। অর্থাৎ উত্তর, পূব ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে 'ভায়া' গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর, চুঁচড়ো চন্দননগর, উৎসবের তরঙ্গ এসে মিলিত হয়েছে কলকাতা শহরে। এই নবতরঙ্গের ভগীরথ হলেন কোম্পানীর আমলের ইংরেজ বণিকরা এবং তাঁদের বাঙালী গোমস্তা আমলা উকীল মুন্‌শীরা। আজ থেকে দু'শ বছর আগে, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি থেকে এই নবতরঙ্গের যাত্রা শুরু বলা চলে। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত সেই তরঙ্গেরই বিচিত্র ওঠা-নামা দেখেছি আমরা এবং আজও দেখছি সেই তরঙ্গের নতুন বাঁক ফেরার চেষ্টা। জাতীয় সংস্কৃতির একটা প্রায়লুপ্ত সুস্থ ধারাকে কলকাতার দুর্গোৎসবের মধ্যে পুনরুজ্জীবিত করবার চেষ্টা হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু প্রথম যুগের কলকাতা কালচারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ-রূপে যে দুর্গোৎসবের পত্তন হয়েছিল কলকাতা শহরে, আজ তারও একটা স্বাভাবিক পরিণতি লক্ষ্য করলে নজরে পড়ে। আসল যে দুর্গোৎসব, বাঙালীর নিজস্ব যে ঐতিহাসিক দুর্গোৎসব, তার বনিয়াদ ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে অনেকদিন। অর্থাৎ সে রামও নেই, সেই অযোধ্যাও নেই। সেই আত্মনির্ভর গ্রাম্যসমাজ, সেই গোষ্ঠী-জীবন, যৌথ-পরিবার, সেই সব 'বেনাভলেণ্ট ডেস্পট' টাইপের বাংলার জমিদার, আজ আর নেই। বাঙালীর কৃষ্টিগঙ্গা যখন গৌড়, রাজ-মহল, মুর্শিদাবাদ, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর থেকে কলিকাতাভিমুখী হতে শুরু করেছে, তখন থেকে বাঙালীর জাতীয় উৎসব ও লোকোৎসবে ভাটার সূচনা হয়েছে। বৃটিশ আমলের নতুন জমিদার, তালুকদার ও পত্তনিদাররা এবং হঠাৎ গজিয়ে-ওঠা বিত্তবান 'জেণ্টুরা' কলকাতা শহরে, তার আশেপাশে বা গ্রামাঞ্চলে নতুন যে জোয়ার আনার চেষ্টা করেছিলেন, সেটা আসলে স্বাভাবিক জোয়ার নয়, অস্বাভাবিক একটা বন্যা, একটা তরঙ্গোচ্ছ্বাস,—পাঁক ও আবর্জনাই ছিল তার মধ্যে বেশী। উচ্ছ্বাসের বুদ্‌বুদ্‌ মিলিয়ে যাবার পর সেই আবর্জনার তলানি জমতে খুব বেশী সময় লাগেনি। ক্লাইভ হেস্টিংস হলওয়েল সাহেবের যুগে, শোভাবাজারের রাজা মুন্‌শী নবকৃষ্ণ, আন্দুলের রাজা দেওয়ান রামচাঁদ রায়, ভূকৈলাসের রাজা দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষাল, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ প্রভৃতির আমলেই দেখা যায় বাঙালীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় উৎসব 'গ্র্যান্ড ফীস্ট অফ্‌ দি জেণ্টুস'-এ পরিণত হয়েছে।

বাঙালীর দুর্গোৎসব প্রাচীনতম উৎসব না হলেও, শ্রেষ্ঠ জাতীয় উৎসব। যতদূর জানা যায়, ষোড়শ শতাব্দীতে মোগল আমলেই বাংলাদেশে শারদীয় ও বাসন্তী দুর্গোৎসবের প্রচলন হয়। কেউ কেউ বলেন, রমেশ শাস্ত্রী মশায়ের পরামর্শে তাহেরপুরের রাজা কংশনারায়ণ সাড়ে আট লক্ষ টাকা ব্যয় ক'রে প্রথম শারদীয় দুর্গোৎসব করেন। পরে তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভাদুড়িয়ার (রাজশাহী) রাজা জগৎনারায়ণ প্রায় ন'লক্ষ টাকা ব্যয় ক'রে বাসন্তী দুর্গোৎসব করেন। তারপর থেকে অন্যান্য হিন্দু রাজা ও ভূঁঞারা নিয়মিতভাবে এই দুই পূজা আরম্ভ করেন। তখনকার গ্রাম্যসমাজের বৈশিষ্ট্যের গুণে এই দুর্গোৎসব স্বভাবতই একটা সামাজিক লোকোৎসবে পরিণত হয়। সমাজের গোড়ায় যে পরিবার, সেই বাঙালী পরিবার তখন শাখা-প্রশাখাসহ মহীরুহের মতন বিশাল যৌথ পরিবার। যত মাসি পিসি খুড়ী জেঠী যেখানে আছেন এবং তাঁদের পুত্র-কন্যারা, অর্থাৎ 'তুতো' ভাইবোনেরা সকলে একত্রে নাও বা থাকতেন যদি, পুজোর সময় এসে ঠিক জড়ো হতেন। এইভাবে প্রথমে গৃহে হ'ত পারিবারিক সমাবেশ। তারপর গ্রামের যে যেখানে আছে সকল শ্রেণীর ও সকল জাতের লোকের মধ্যে একটা কাজের সাড়া পড়ে যেত। পুজো যার বাড়ীতেই হোক না কেন (সাধারণত অবশ্য জমিদার বা গ্রামের বড়লোকদের বাড়ীতেই হ'ত), তাতে যোগ দেবার জন্য ডাক পড়ত সকলের। তা সে চণ্ডালই হোক, আর ব্রাহ্মণই হোক। পরিবারের পিসিমা মাসিমা থেকে গ্রাম্য-সমাজের চণ্ডাল, ডোম, বাগ্দী, ব্রাহ্মণ সকলের একটা বিশেষ কাজ, একটা নির্দিষ্ট দায়িত্ব থাকত। সেকালের মেলার মতন দুর্গোৎসবের মধ্যেও আর্থিক লেনদেন ও সহযোগিতার একটা সুযোগ ঘটত। সমস্ত পরিবারের আত্মীয়স্বজন, সমস্ত পরিবারের লোকজন ঠিক একটা 'ইউনিটের' মতন কাজ করত। বাস্তব জীবনের সমস্ত বিরোধের মধ্যেও মনের দিক থেকে রাখীবন্ধনের কাজ করত এই উৎসব। অচল অটল কূপ-মণ্ডূক গ্রাম্যসমাজে প্রাণসঞ্চার করত মধ্যে মধ্যে এইসব উৎসব পাল-পার্বণ। কিন্তু এই গ্রাম্যসমাজে ভাঙন ধরল ক্রমে এবং যার স্রোত নেই, প্রবাহ নেই, গতি নেই তার পচন ধরাও স্বাভাবিক। ধরলও তাই। বর্ণভেদ জাতিভেদের উৎকট চাপে, বৈষ্ণব ও শাক্ত ধর্মের উগ্র যথেচ্ছ-চারিতায় এবং সবার উপরে আর্থিক ক্রমাবনতির ফলে, সেকালের গ্রাম্যসমাজের মধ্যে যেটুকু গতিশীলতা ছিল তাও নষ্ট হয়ে গেল।

গ্রাম হয়ে উঠলো জীবনের কারাগার এবং অর্থ, বর্ণ ও শ্রেণীর গরাদ ভেদ ক'রে আলোর পথ, মুক্তির পথ একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। মোগল আমলেও এক শ্রেণীর নতুন জমিদার আমাদের দেশে তৈরী হয়েছিলেন, মানসিংহ ও তাঁর পরবর্তী শাসকদের কৃপায়, যাঁরা ক্রমে চরম ভোগবিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দিলেন। তাঁদের মধ্যে নদীয়ার রাজা অন্যতম। এই সময় ইংরেজদের আবির্ভাব এবং সেই সঙ্গে একটা নতুন বাণিজ্য-যুগের সূচনা। ইংরেজরা এসে প্রথমে নিজেরাই জমিদার হলেন, তারপর নতুন এক শ্রেণীর জমিদার-তালুকদার সৃষ্টি করলেন এবং নিজেদের লুণ্ঠনের বকযন্ত্র চালু রাখার জন্য দালাল, গোমস্তা, মুচ্ছুদ্দি, দেওয়ান নিয়ে একশ্রেণীর এদেশী 'জেণ্টু' গড়ে তুললেন। জমিদার ও জেণ্টু, উভয়শ্রেণীর হাতে যথেষ্ট পয়সা জমল অবশ্য, কিন্তু পয়সার কোন সদ্গতি হ'ল না। অর্থাৎ স্বাধীন দেশের মতন মজুত পয়সা শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রে অবাধে নিয়োগ করা সম্ভব হ'ল না। সুতরাং হক্কের ধন ফক্কে উড়তে লাগল— বাঁদরের বিয়েয় ও বাপের শ্রাদ্ধে লাখ লাখ টাকা খরচ ক'রে, বাইনাচে, টপ্পা খেউড়ে, বুলবুলির আর মেড়ার লড়াইয়ে, ইংরেজ প্রভুদের উপঢৌকন দিয়ে, উৎসব-পার্বণে বিদেশী প্রভুসেবা ও দেশী দরিদ্রনারায়ণের সেবা ক'রে। এই সময় শুধু দুর্গোৎসবেই কলকাতার ধনী বাঙালীরা যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছেন, তাতে আজকাল তিনটে পঞ্চ-বার্ষিক শিক্ষা-পরিকল্পনার ব্যয় সঙ্কুলান করা যায়।

তাও যদি উৎসবের একটা সুস্থ ধারা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে টাকাটা ব্যয় করা হ'ত, তাহ'লেও না হয় সান্ত্বণা থাকত। কিন্তু তা হয়নি। কেরী সাহেব লিখছেন ঃ

> Nautches used to be given at the different Hindoo houses at the Doorga Pujahs. The most popular of the Hindoo gentlemen was Sookomoy Roy... Here (in 1792) a novelty was introduced in the Poojah ceremonies, namely a combination of English airs with the Hindoostanee songs.

দুর্গোৎসবের সময় শহরের ধনী হিন্দুদের বাড়ী বাইনাচের আসর বসত। রাজা সুখময় রায়ের বাড়ী ছিল তার মধ্যে সবচেয়ে প্রধান। ১৭৯২ সালে তাঁর বাড়ীতে যে নাচগানের আসর হয় উৎসবের সময়, তাতে হিন্দুস্থানী গান বিলেতী ঢঙে গেয়ে এক অভিনবত্ব দেখানো হয়। মহারাজা নবকৃষ্ণের বাড়ীর দুর্গোৎসব সম্বন্ধে কেরী সাহেব বলছেন ঃ "The majority of company crowded

to Raja Nabkessen's where several mimics attempted to imitate the manners of different nations". অর্থাৎ নানা জাতের বিচিত্র ভাবভঙ্গী অনুকরণ ক'রে রঙ্গরসিকতা করা হ'ত, প্রধানত বিদেশী জমিদার ও দেশী জেণ্টুদের খুশী করবার জন্য। এইভাবে বাঙালীর যে দুর্গোৎসব ছিল সর্বপ্রধান 'ন্যাশনাল ফেস্টিভাল', তাকে ইংরেজ আমলের দেশী-বিদেশী জেণ্টু ও জমিদাররা 'গ্র্যান্ড ফীস্টে' পরিণত করেন। উৎসবটা জাতীয় জীবনের বিচিত্র প্রকাশ না হয়ে, ধনদৌলতের বিকৃত ফ্যাশান হয়ে ওঠে।

এর মধ্যে অবশ্য ইংরেজের কমার্স, রেলপথ, জমিদারীপ্রথা, বাংলার গ্রাম্যসমাজকে ধূলিসাৎ ক'রে দিয়েছে। নতুন আর্থিক ও মানসিক পরিবেশের মধ্যে যৌথ পরিবারেও দ্রুত ভাঙন ধরেছে। গ্রাম থেকে শহরের দিকে স্থানান্তরিত হচ্ছে আমাদের কালচারের ভারকেন্দ্র। সুতরাং দুর্গোৎসবের ঐতিহাসিক বনিয়াদ আর নতুন যুগের ধাক্কায় টিকছে না দেখা যাচ্ছে। শহরের "জেণ্টুরা" তাকে যে নতুন রূপ দেবার চেষ্টা করলেন তা অত্যন্ত কৃত্রিম ও প্রাণহীন। মধ্যে আমাদের জাতীয়তাবোধের উদ্বোধনও হ'ল অবশ্য এই দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র ক'রে, মনে হ'ল যেন উৎসবের নবরূপান্তর শুরু হ'ল। কিন্তু ঐতিহাসিক নিয়মেই তা হ'ল না। আজও অবশ্য দুর্গোৎসবকে সত্যকার জাতীয় উৎসবে পরিণত করার চেষ্টা করা হ'চ্ছে বিশেষ ক'রে যাঁদের সুস্থ রুচিবোধ শিক্ষাদীক্ষা আছে, তাঁরা তো করছেনই। নানারকমের মেলা ও প্রদর্শনীর মধ্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এদেশী জেণ্টুদের প্রবর্তিত ধারাও আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। পূজামণ্ডপে "লারে লাপ্পা, লারে লাপ্পা" গান শুনলে, মার্কিণী ঢঙে কোন হিন্দুস্থানী অভিনেত্রীর রেকর্ডের ঘন ঘন আবর্তন কানে এলে মনে হয় যেন সুখময় রায়ের সেই বিলেতী ঢঙের হিন্দুস্থানী গান শুনছি। মনে হয়, "কলকাতা কালচারের" পরিবর্তন হয়েছে, তার সঙ্গে বাঙালীর দুর্গোৎসবেরও —একেবারে "যা দেবী সর্বভূতেষু" থেকে "লারে লাপ্পা" পর্যন্ত, নিধুবাবুর টপ্পা থেকে ফুলকুমারীর হলিউডি গজল পর্যন্ত।

পাণ্ডুলিপির রোমান্স

(এক)

"যে দেশে ছাপার কর্ম চলিত না হইয়াছে সে দেশকে প্রকৃত সভ্য বলা যায় না। এই দেশে পূর্বকালে কতক লোকের ঘরে পুস্তক ছিল এবং অল্প লোক বিদ্যাভ্যাস করিত অন্য সকল লোক অন্ধকারে থাকিত এখন এই দেশে ক্রমে ছাপার পুস্তক প্রায় ছোট বড় ঘর সকল ব্যাপ্ত হইতেছে...যে ব্যক্তি এক পুস্তক লইয়াছে তাহার অন্য পুস্তকের লওনের চেষ্টা জন্মে এইরূপে এদেশে বিদ্যা প্রচলিত হইতেছে।"

—সমাচার দর্পণ, ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৮১৯।

ডাকবিভাগ ও ডাকপিওন না থাকলে যেমন দেশের লোকের মানসিক বৃত্তির স্বাভাবিক বিকাশ হ'ত না, নানারকমের ভাবাবেগ পত্রপক্ষ বিস্তারের অভাবে মনের চৌকাঠে মাথা খুঁড়ে ম'রে যেত—তেমনি যদি ছাপাখানা ও ছাপা বই না থাকত তাহ'লে জ্ঞানবিদ্যার আলো দেশের লোকসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হ'ত না, অসম্ভব হ'ত মানুষকে মানুষ হিসেবে গ'ড়ে তোলা। আমরা যে তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই থাকতাম। সুতরাং ছাপা বইয়ের জন্য যে ''এদেশে বিদ্যা প্রচলিতা হইতেছে'' এবং ''যে ব্যক্তি এক পুস্তক লইয়াছে তাহার অন্য পুস্তক লওনের চেষ্টা'' জন্মাচ্ছে—"সমাচার দর্পণ" পত্রিকার একথা খুব সত্য কথা। কিন্তু তবু যখন প্রেসের কল্যাণে একালের পাণ্ডুলিপির চরম দুরবস্থা দেখতে পাই, কম্পোজিটারের ডেস্ক থেকে কালিঝুলি মেখে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে লেখকের হাতেলেখা পাণ্ডুলিপি প্রুফরীডারের নির্মম নির্যাতনচিহ্ন বুকে ক'রে অবশেষে সম্পাদকের বা প্রকাশকের ওয়েস্টপেপার বাস্কেটের আবর্জনাস্তূপে নিদারুণ অবজ্ঞায় নিক্ষিপ্ত হয়—তখন, একমাত্র তখন মনে হয় সেই পাণ্ডু-লিপির রোমান্সের কথা। মনে হয়, অনর্থক অসহায় পাণ্ডুলিপির উপর ছাপাখানার এই অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে লেখকদের দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ করা উচিত। অবশ্য লেখকদের ক্ষীণকণ্ঠের

to Raja Nabkessen's where several mimics attempted to imitate the manners of different nations". অর্থাৎ নানা জাতের বিচিত্র ভাবভঙ্গী অনুকরণ ক'রে রঙ্গরসিকতা করা হ'ত, প্রধানত বিদেশী জমিদার ও দেশী জেণ্টুদের খুশী করবার জন্য। এইভাবে বাঙালীর যে দুর্গোৎসব ছিল সর্বপ্রধান 'ন্যাশনাল ফেস্টিভাল', তাকে ইংরেজ আমলের দেশী-বিদেশী জেণ্টু ও জমিদাররা 'গ্র্যান্ড ফীস্টে' পরিণত করেন। উৎসবটা জাতীয় জীবনের বিচিত্র প্রকাশ না হয়ে, ধনদৌলতের বিকৃত ফ্যাশান হয়ে ওঠে।

এর মধ্যে অবশ্য ইংরেজের কমার্স, রেলপথ, জমিদারীপ্রথা, বাংলার গ্রাম্যসমাজকে ধূলিসাৎ ক'রে দিয়েছে। নতুন আর্থিক ও মানসিক পরিবেশের মধ্যে যৌথ পরিবারেও দ্রুত ভাঙন ধরেছে। গ্রাম থেকে শহরের দিকে স্থানান্তরিত হচ্ছে আমাদের কালচারের ভারকেন্দ্র। সুতরাং দুর্গোৎসবের ঐতিহাসিক বনিয়াদ আর নতুন যুগের ধাক্কায় টিকছে না দেখা যাচ্ছে। শহরের "জেণ্টুরা" তাকে যে নতুন রূপ দেবার চেষ্টা করলেন তা অত্যন্ত কৃত্রিম ও প্রাণহীন। মধ্যে আমাদের জাতীয়তাবোধের উদ্বোধনও হ'ল অবশ্য এই দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র ক'রে, মনে হ'ল যেন উৎসবের নবরূপান্তর শুরু হ'ল। কিন্তু ঐতিহাসিক নিয়মেই তা হ'ল না। আজও অবশ্য দুর্গোৎসবকে সত্যকার জাতীয় উৎসবে পরিণত করার চেষ্টা করা হ'চ্ছে বিশেষ ক'রে যাঁদের সুস্থ রুচিবোধ শিক্ষাদীক্ষা আছে, তাঁরা তো করছেনই। নানারকমের মেলা ও প্রদর্শনীর মধ্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এদেশী জেণ্টুদের প্রবর্তিত ধারাও আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। পূজামণ্ডপে "লারে লাপ্পা, লারে লাপ্পা" গান শুনলে, মার্কিণী ঢঙে কোন হিন্দুস্থানী অভিনেত্রীর রেকর্ডের ঘন ঘন আবর্তন কানে এলে মনে হয় যেন সুখময় রায়ের সেই বিলেতী ঢঙের হিন্দুস্থানী গান শুনছি। মনে হয়, "কলকাতা কালচারের" পরিবর্তন হয়েছে, তার সঙ্গে বাঙালীর দুর্গোৎসবেরও —একেবারে "যা দেবী সর্বভূতেষু" থেকে "লারে লাপ্পা" পর্যন্ত, নিধুবাবুর টপ্পা থেকে ফুলকুমারীর হলিউডি গজল পর্যন্ত।

পাণ্ডুলিপির রোমান্স

(এক)

"যে দেশে ছাপার কর্ম্ম চলিত না হইয়াছে সে দেশকে প্রকৃত সভ্য বলা যায় না। এই দেশে পূর্ব্বকালে কতক লোকের ঘরে পুস্তক ছিল এবং অল্প লোক বিদ্যাভ্যাস করিত অন্য সকল লোক অন্ধকারে থাকিত এখন এই দেশে ক্রমে ছাপার পুস্তক প্রায় ছোট বড় ঘর সকল ব্যাপ্ত হইতেছে...যে ব্যক্তি এক পুস্তক লইয়াছে তাহার অন্য পুস্তকের লওনের চেষ্টা জন্মে এইরূপে এদেশে বিদ্যা প্রচলিত হইতেছে।"

—সমাচার দর্পণ, ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৮১৯।

ডাকবিভাগ ও ডাকপিওন না থাকলে যেমন দেশের লোকের মানসিক বৃত্তির স্বাভাবিক বিকাশ হ'ত না, নানারকমের ভাবাবেগ পত্রপক্ষ বিস্তারের অভাবে মনের চৌকাঠে মাথা খুঁড়ে ম'রে যেত—তেমনি যদি ছাপাখানা ও ছাপা বই না থাকত তাহ'লে জ্ঞানবিদ্যার আলো দেশের লোকসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হ'ত না, অসম্ভব হ'ত মানুষকে মানুষ হিসেবে গ'ড়ে তোলা। আমরা যে তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই থাকতাম। সুতরাং ছাপা বইয়ের জন্য যে "এদেশে বিদ্যা প্রচলিতা হইতেছে" এবং "যে ব্যক্তি এক পুস্তক লইয়াছে তাহার অন্য পুস্তক লওনের চেষ্টা" জন্মাচ্ছে—"সমাচার দর্পণ" পত্রিকার একথা খুব সত্য কথা। কিন্তু তবু যখন প্রেসের কল্যাণে একালের পাণ্ডুলিপির চরম দুরবস্থা দেখতে পাই, কম্পোজিটারের ডেস্ক থেকে কালিঝুলি মেখে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে লেখকের হাতেলেখা পাণ্ডুলিপি প্রুফরীডারের নির্ম্মম নির্যাতনচিহ্ন বুকে ক'রে অবশেষে সম্পাদকের বা প্রকাশকের ওয়েষ্টপেপার বাস্কেটের আবর্জনাস্তূপে নিদারুণ অবজ্ঞায় নিক্ষিপ্ত হয়—তখন, একমাত্র তখন মনে হয় সেই পাণ্ডু-লিপির রোমান্সের কথা। মনে হয়, অনর্থক অসহায় পাণ্ডুলিপির উপর ছাপাখানার এই অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে লেখকদের দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ করা উচিত। অবশ্য লেখকদের ক্ষীণকণ্ঠের

আওয়াজ ছাপাখানার ট্রেড্‌ল, ফ্ল্যাট বা রোটারী মেশিনের গর্জনের মধ্যে ডুবে তলিয়ে যাবে। তবু প্রতিবাদের প্রয়োজন আছে, পাণ্ডুলিপি যে পবিত্র জিনিস, অন্ততঃ সেই কথাটা জানাবার জন্য। ছাপাখানার প্রসার হোক ক্ষতি নেই, কিন্তু তার জন্য লেখকের পাণ্ডুলিপির সমস্ত মর্যাদা যে বিসর্জন দিতে হবে, তার কোন মানে নেই। ''লেখার কপি রেখে পাঠাবেন''—''অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হয় না''—ইত্যাদি সম্পাদকীয় বিজ্ঞপ্তির মধ্যেই পাণ্ডুলিপির বর্তমান দুরবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। সম্পাদকরা অবশ্য নিরুপায়, কারণ পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের মতন "গোডাউন" তৈরী করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। ষ্ট্রাণ্ড রোডে গঙ্গার ধারের মালগুদাম ঘরের মতন পত্রিকা আফিসের পাশে পাণ্ডুলিপির গুদামঘর তৈরী করতে হয় তাহ'লে। কিন্তু লেখকদের অবস্থা কি ? আজকালকার অধিকাংশ লেখকদের দেখেছি, পাণ্ডুলিপির প্রতি তাঁদের কোন মমতা, কোন শ্রদ্ধা বা যত্ন নেই। মনের মধ্যে ভাবের আবেগ এল, কতকটা যেন ''নসিয়া'' বা বমি-বমি ভাবের মতন, অমনি তাঁরা সামনে যা পেলেন, দোকানের পুরনো মেমোর বা আফিসের ফর্মের পিছন দিক, এমনকি ঠোঙার কাগজ পর্যন্ত, তাতেই সমস্ত ইমোশন্‌টাকে উগরে দিলেন, অত্যন্ত কুৎসিতভাবে কলমের আঁচড় টেনে। কোন কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকেরও পাণ্ডুলিপির প্রতি এই অশ্রদ্ধার ভাব দেখেছি। এটা কি যন্ত্রযুগের প্রভাব ? ছাপাখানার মাহাত্ম্য ? তাহ'লেও তো কম্পোজিটার ও রীডারদের কথা একটু ভাবা উচিত। পাণ্ডুলিপির যদি রীতিমত পাঠোদ্ধার করতে হয়, প্রতিটি শব্দ তার ডিসাইফার করতে হয়, তাহ'লে ছাপাখানার কর্মীদের অবস্থাটা কি হয় সে সম্বন্ধে অনেক লেখক চিন্তাও করেন না। এযুগের লেখক হ'তে হ'লে ছাপাখানার কাজ সম্বন্ধেও রীতিমত জ্ঞান থাকা দরকার। ছাপাখানার যুগেও পাণ্ডুলিপির মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে এবং রাখাও উচিত। কিন্তু অনেক লেখকেরই সে সম্বন্ধে কোন চেতনা নেই। পাণ্ডুলিপি আজ স্বয়ং লেখকের কাছেই অনাদৃত ও অবজ্ঞাত। তা কেন হবে ? লেখা ছাপাই হোক বা যাই হোক, প্রথম যখন নিজ হাতে লেখক তা লেখেন, তখন যদি তার প্রতি তাঁর মমতা ও দরদ না থাকে, তাকে সুন্দর কাগজে সুশোভন অক্ষরে সুদৃশ্য ক'রে প্রকাশ করবার ইচ্ছা তাঁর না হয়, তাহ'লে বুঝতে হবে যে, লেখাকে তিনি আন্তরিক ভালবাসেন না এবং লেখাটা তাঁর পেশা মাত্র, প্যাশান নয়।

আমার তো মনে হয়, পাণ্ডুলিপিটা একটা অত্যন্ত সখের শৌখিন জিনিস। দেখেছি, লেখা যাঁদের জীবনের প্যাশান, লেখা যাঁরা ভালবাসেন, তাঁদের পাণ্ডুলিপি ঠিক যেন অরিজিনাল পেইণ্টিং-এর মতন। যেমন, রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপি। কাটাকাটির পাকচক্রের মধ্যেও অত্যন্ত সজাগ শিল্পীমনের চক্রমণের যে পরিচয় রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায়, তেমনটি আর কোথাও পাওয়া যায় না। আর দেখেছি, শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসুর পাণ্ডুলিপি, দেখবার মতন, দেখাবার মতন। শিল্পী ও বিজ্ঞানী এখানে যেন একাত্মা হ'য়ে গেছেন। শব্দ গুণে, লাইন গুণে এক-একটি পৃষ্ঠা অত্যন্ত সযত্নে লেখা, অক্ষরের দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সমান,—কাটা শব্দের উপর মেপেজুকে সাদা কাগজ এ'টে তার উপর সংশোধিত শব্দটি লেখা। আশ্চর্য পাণ্ডুলিপি, দেখিনি কখনও। পাণ্ডুলিপি যে এরকম হ'তে পারে তা "পরশুরামের" পাণ্ডুলিপি দেখার আগে কল্পনাও করিনি। আমি তাঁর একটি ব্যঙ্গ কবিতার পাণ্ডুলিপি সযত্নে বাঁধিয়ে রেখেছি ঘরে, দেখলেও লেখার প্রেরণা পাওয়া যায়, মনে হয় লেখাই জীবনের জপতপধ্যান, লেখাই ব্রত, লেখাই সাধনা। লেখাটা তাসপাশা খেলার মতন, বা শনিবারের ঘোড়দৌড় খেলার মতন অবসরবিনোদন নয়, হঠাৎ কোন চিত্তচাঞ্চল্য যেন-তেন-প্রকারেণ কাগজে-কলমে খালাস করার ব্যাপারও নয়। শিল্পীর প্যাশান ও বিজ্ঞানীর প্রিসিশান, শিল্পীর সাধনা ও বিজ্ঞানীর সংযম,—লেখার জন্য দুইই থাকা চাই। হাতেলেখা পাণ্ডুলিপির মধ্যে যদি লেখকের চরিত্র ও মনের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহ'লে এই দুয়ের বিচিত্র প্রকাশ রবীন্দ্রনাথ ও রাজশেখর বসুর পাণ্ডুলিপির মধ্যে হয়েছে বলা চলে। রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপি বিচিত্রগতি প্যাশানের প্রতিমূর্তি—ভাব অনুভাব, খুশী-খেয়াল ও কল্পনার অসংখ্য উচ্ছ্বসিত তরঙ্গায়িত স্রোতধারার চিহ্ন তার মধ্যে স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে উঠেছে। রাজশেখর বসুর পাণ্ডুলিপি একাগ্রচিত্ত কঠোর জ্ঞানতপস্বীর পাণ্ডুলিপি, বিজ্ঞানীর সংযমনিষ্ঠা ও স্থিরতার প্রতিমূর্তি যেন। তার ভেতর দিয়েই তাঁর সুরসিক শিল্পী-মনের পরিচয়টিও পরিষ্কার ধরা পড়ে। ছাপা বইয়ের মধ্যে এত কথা জানা যায় না, এত কিছু ভাবাও যায় না। ছাপা বই তো সবই সমান, পাইকা বা স্মলপাইকাতেই ছাপা হোক, আর লাইনোতেই ছাপা হোক। তা দেখে লেখকের মন বোঝা যায় না, মনের বিচিত্র গতির কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। হয়ত বলবেন, লেখাই তো

ছাপা রয়েছে, সুতরাং সমালোচকের দৃষ্টিতে লেখককে বিচার করা যাবে না কেন? কিন্তু সে হ'ল সমালোচনা, লেখকের লেখার মূল্য বিচার, দূর থেকে লেখক ও লেখাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা। পাণ্ডু-লিপির মধ্যে শিল্পীর সঙ্গে যে প্রত্যক্ষ ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়, তার সঙ্গে ছাপা বইয়ের কোন তুলনাই হয় না। ব্যক্তিগত হাতেলেখা চিঠি, আর ছাপানো বুকপোস্টে পাঠানো চিঠি কি এক? বই প'ড়ে দেশ দেখা, ফটোগ্রাফে ও সিনেমায় স্থাপত্য ভাস্কর্য ও শিল্পকলার নিদর্শন দেখা, আর দেশ ভ্রমণ ক'রে সোজা সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চোখ দিয়ে সব দেখার মধ্যে একটা বিরাট পার্থক্য নেই কি? নিশ্চয় আছে, পাণ্ডু-লিপি ও ছাপা বইয়ের মধ্যেও পার্থক্য ঠিক ততখানি।

কল্পনা করুন, কোন শিল্পী তাঁর পাণ্ডুলিপি লিখছেন। নিভৃতে ব'সে একমনে তিনি লিখছেন, চিন্তাধারার সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে কলম চলছে কাগজের উপর। মনটা যেন তিনি উপুড় ক'রে দিচ্ছেন পাণ্ডুলিপির মধ্যে। চিন্তার স্রোত যখন ঝরণা ধারার মতন কুলকুল ক'রে বয়ে চলেছে তখন কলমও চলেছে অবাধ গতিতে, পাণ্ডুলিপির অক্ষর ও শব্দবিন্যাসের ঝকঝকে তরতরে চেহারা দেখলেই তা বোঝা যায়। ভাব যেখানে লেখ্য ভাষার গতিকে ছাড়িয়ে দুরন্তবেগে ছুটতে চাইছে, কলম যেখানে মনের দুর্বার গতির সঙ্গে তাল রাখতে পারছে না, হয়রাণ হয়ে যাচ্ছে, সেখানে ভাবের সঙ্গে পাশাপাশি কাঁধ মিলিয়ে ভাষার প্রাণপণ দৌড়বার চেষ্টা অতিদ্রুত লেখার অক্ষর ও শব্দগুলির ব্যস্তবাগীশ মূর্তির মধ্যে ধরা পড়ে যায় পাণ্ডুলিপিতে। চিন্তা ও ভাবধারা যেখানে সংযত, লেখাও সেখানে স্থির ধীর স্পষ্ট ও মন্থর-গতি। বিরোধী ভাবধারার সংঘাত যেখানে আবর্তের সৃষ্টি করেছে, সেখানে অক্ষর ও শব্দগুলিও যেন বিক্ষুব্ধ ও প্রতিহত হয়ে পাণ্ডু-লিপির উপর ঘনঘন কাটাকাটি, আছড়াআছড়ি করছে। পাণ্ডুলিপির মধ্যেকার কাটা শব্দ এবং সেই কাটা শব্দের দেহ ও পরিপার্শ্ব জুড়ে কলমের হিজিবিজি আঁচড়ের আবর্তন দেখলেই তা বোঝা যায়। রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপিতে কেন এর প্রতিপত্তি তা বুঝতে একটুও কষ্ট হয় না। কবিমনের উদ্বেল ভাবতরঙ্গোচ্ছ্বাস রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপির মধ্যে চিহ্নিত ও রূপায়িত হয়ে থাকে। সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপির মধ্যে তাঁর যেরকম প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথের ছাপা বইয়ের মধ্যে তা সম্পূর্ণ পাওয়া সম্ভব নয়! তেমনি ছোট বড় সব লেখকের ক্ষেত্রেও একথা সত্য। পাণ্ডুলিপির

মধ্যে আমরা লেখকের জীবন্ত সত্তাকে খ‍ুঁজে পাই, তাঁর মন ও চরিত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় হয় তার মধ্যে। প্রত্যেক রচনা সৃষ্টির পিছনে যে গভীর বেদনা থাকে, সেই বেদনা প্রকাশ করার ব্যাকুলতা যেভাবে লেখক অনুভব করেন, প্রকাশের পথে যে দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্য দিয়ে তাঁকে যেতে হয়, এমনকি যে স্নায়বিক শিহরণ পর্যন্ত তিনি অনুভব করেন—তার প্রত্যেকটির সুস্পষ্ট ছাপ থাকে একমাত্র লেখকের নিজস্ব পাণ্ডুলিপির মধ্যে। এ-ছাপ ছাপা বইয়ের মধ্যে থাকে না, থাকতে পারে না। শুধু লেখাটার বাইরের ইতিহাসটুকু নয়, সেই লেখা সৃষ্টির সমস্ত আভ্যন্তরিক, একান্ত গোপন ইতিহাসের ধারাও পাণ্ডুলিপির মধ্যে রূপায়িত হ'য়ে ওঠে। পাণ্ডু-লিপির রোমান্স এইখানে, ছাপা বইয়ের মধ্যে কোন রোমান্স নেই! ছাপাখানার একমাপের অক্ষরে সব বইয়ের মূল্য (বিষয়গত মূল্য নয়) সমান হয়ে যায়, ফ্ল্যাট মেসিনের চাপে সব লেখকের ব্যক্তিগত সত্তা ফ্ল্যাট হ'য়ে একাকার হ'য়ে যায়। কিন্তু পাণ্ডুলিপিতে তা হবার উপায় নেই। স্বাতন্ত্র্য তার থাকবেই থাকবে। সাজানো পাণ্ডুলিপির গ্যালারীতে বা প্রদর্শনীতে ঢুকে তাই মনে হয়, লেখকরা যেন নিজেরাই দাঁড়িয়ে আছেন এবং তাঁদের সঙ্গে একেবারে মুখোমুখী পরিচয় হচ্ছে। আমাদের দেশের বড় বড় জাতীয় গ্রন্থাগারের পাণ্ডু-লিপি-বিভাগের সামনে দাঁড়িয়ে অনেকদিন এই কথা আমার মনে হয়েছে, লেখকদের ব্যক্তিগত সত্তাকে মনে মনে অনুভব করেছি, রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠেছে দেহ, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের অভিজ্ঞতা লাভ ক'রে। বইয়ের দোকানে দোকানে দিনরাত ঘুরে বেড়িয়েও এই অভিজ্ঞতা কোনদিন হয়নি। আনন্দ হয়েছে, আগ্রহ বেড়েছে, কিন্তু রোমাঞ্চ হয়নি: বইয়ের দোকানে আইনস্টাইন ও আলিমুদ্দিন এক, রবীন্দ্রনাথে ও যাদবেন্দ্রনাথে কোন তফাৎ নেই। কিন্তু পাণ্ডুলিপি দেখুন, সঙ্গে সঙ্গে আপনি অনুভব করবেন এই আইনস্টাইন, ঐ আলিমুদ্দিন, এই রবীন্দ্রনাথ, ঐ যাদবেন্দ্রনাথ। ব'লে দিতে হবে না, বুঝিয়ে দিতে হবে না, ছাপার হরফে নাম দেখেও চিনতে হবে না। দেখলেই বুঝতে পারবেন রক্ত-মাংসের জীবন্ত রবীন্দ্রনাথ রয়েছেন তাঁর পাণ্ডুলিপির মধ্যে। পাণ্ডুলিপির এই যে রোমান্স, একি ভবিষ্যতে আর থাকবে না, আর কেউ অনুভব করবে না কোনদিন? ছাপাখানা ও ছাপা বইয়ের জন্য পাণ্ডুলিপির নিজস্ব যে রোমাণ্টিক জগৎ তা কি একেবারে

সুন্দরভাবে নকল করতেন যে, তার মধ্যে কোথাও কাটাকুটি থাকত না। লেখাগুলি—'সমানি সম শীর্ষাণি ঘনানি বিরলানি চ'।

আবার সেই লেখার কালিই বা কত সুন্দর ছিল তা ঐ ''ছিঁড়ে পত্র না ছাড়ে মসির'' আর্জা থেকেই বোঝা যায়। গৃহস্থের বৈঠকখানায় বা চণ্ডীমণ্ডপে ব'সে পুঁথির অনুলিপি তৈরী করতে হ'ত; দু'-চার দিনে যে-কাজ শেষ হ'ত না, তিনচার-ছ'মাস ধ'রে ক্রমাগত পরিশ্রম ক'রে এক-একটা পুঁথি নকল করা শেষ হ'ত। তারপর গৃহস্বামী হয়ত লেখককে নগদ দু'টি টাকা ও একজোড়া কাপড় প্রণামী দিয়ে বিদায় দিতেন। নগদ দক্ষিণার কথা ভেবে বিস্মিত হবার কিছু নেই, কারণ তখন মাসিক চার-পাঁচ টাকা বেতনে যিনি চাকরি করতেন তিনি দোল-দুর্গোৎসবে, অষ্টপ্রহর-নবরাত্রে, বারমাসে তেরপার্বণে লোককে ভুরিভোজনে তৃপ্ত করতেন। অর্থাৎ নগদ ক্যাশ টাকার যুগই সেটা ছিল না, পণ্য-বিনিময়েই কাজ চ'লে যেত। নগদ দশ-পনের টাকাতে তখন গৃহস্থের ঘরে শুভ-বিবাহ সম্পন্ন হ'ত। সুতরাং নকলনবীশরা যা পেতেন তা একালের স্টেনোদের তুলনায় কম নয়। পুঁথি অনুলিখনের খরচও একালের ছাপার খরচের তুলনায় কম ছিল না। একখানি মাত্র পাণ্ডুলিপি একজনে একবারে কপি করতে পারেন এবং খরচ ও মেহনত দুই দিক দিয়েই তার মূল্য ছাপা বইয়ের চেয়ে অনেক বেশী। ছাপা বই হারিয়ে গেলে বা চুরি গেলে সহজেই কিনে ফেলা যায়, কিন্তু পাণ্ডুলিপি ও পুঁথির বেলায় তা যায় না। সেইজন্য পাণ্ডুলিপির মধ্যে চুরি করা বা নষ্ট করা সম্বন্ধে কঠোর দিব্যি দেওয়া থাকত—এমন কি রীতিমত অকথ্য কটু ভাষা প্রয়োগ করতেও লেখকরা কুণ্ঠাবোধ করতেন না। তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি ঃ

যত্নেন লিখিতং চেদং যশ্চোরয়তি পুস্তকম্।
শূকরী তস্য মাতা চ পিতা তস্য চ গর্দভঃ॥
(সোসাইটির পুঁথিসংখ্যা ৫২০৪)

পুস্তকং হরতে যস্তু কাণো দুঃখী ভবেন্নরঃ।
মৃতঃ স্বর্গং ন গচ্ছেত্তু পিতরং নরকং নয়েৎ॥
(সংস্কৃত কলেজের পুঁথিবিবরণ, ৫।৭৬)

অর্জিতং ভূরিকষ্টেন পুস্তকং যচ্চ মেহনঘ।
হর্তুমিচ্ছতি যঃ পাপী তস্য বংশক্ষয়ো ভবেৎ॥
(সোসাইটির পুঁথি ৮।৬০৬২)

ধ্বংস হয়ে যাবে? শুধু ছাপাখানা নয়, মনে হচ্ছে টাইপরাইটার যেন স্টীমরোলারের মতন পাণ্ডুলিপির এই রোমান্স ও রোমাণ্টিক জগৎকে একেবারে ধূলিসাৎ ক'রে দেবে। তা যদি দেয়, তাহ'লে আফশোসের আর সীমা থাকবে না।

(দুই)

তিল ত্রিফলা সিমুল ছালা
ছাগ দুগ্ধে করি মেলা
লৌহ পাত্রে লোহায় ঘসি
ছিঁড়ে পত্র না ছাড়ে মসি।

ছড়া বা কবিতা নয়, কালি তৈরীর ফরমুলা, যে-কালি দিয়ে পাণ্ডুলিপি লেখা হ'ত। আজকালকার ফাউণ্টেন-পেনের কালি নয় বা কারখানায় তৈরী ছাপার কালি নয়। পাণ্ডুলিপি হাতে লেখার জন্য কালি—তিল ত্রিফলা শিমুলছাল, লৌহপাত্রে লোহায় ঘ'সে তৈরী কালি। এমন কালি যে কলমের টানে পত্র ছিঁড়ে যেতে পারে, তবু কালি ছাড়বে না। কিন্তু পত্র ছিঁড়ে যাবার কোন সম্ভাবনা ছিল কি? কলমের টান দিয়ে যাঁরা পাণ্ডুলিপি নকল করতেন তাঁদের কি বিদ্যা-বুদ্ধি কিছুই ছিল না? মোটেই তা নয়। জবরদস্ত পণ্ডিত না হলেও, তাঁরা বেশ সুশিক্ষিত ছিলেন এবং লিখনপঠনেও তাঁদের অসাধারণ দক্ষতা ছিল। তাঁরা অবশ্য ব্যবসাদার ছিলেন, অর্থাৎ পেশাদার নকলনবীশ। বেশ বোঝা যায়, সমাজের উচ্চস্তরের বা সাধারণ নিম্নস্তরের লোকে পেশা হিসেবে এটা গ্রহণ করতেন না। মধ্যস্তরের স্বল্পবিত্ত লোকেরা পেশা হিসেবে পাণ্ডুলিপি নকল করার কাজ করতেন। পাণ্ডুলিপি নকল করেই তাঁরা জীবিকা অর্জন করতেন। এইভাবে ছাপাখানার আগের যুগে একটা পেশাদার নকল-নবীশ-শ্রেণী গ'ড়ে উঠেছিল দেখা যায়, অনেকটা এযুগের কেরানী, প্রাইভেট সেক্রেটারী ও স্টেনো-টাইপিষ্টদের মতন। তাঁদের লেখা ছিল অত্যন্ত সুন্দর, ছাপার হরফকেও হার মানাত। পাণ্ডুলিপির হস্তাক্ষর এত সুন্দর ও নিখুঁত ছিল যে, ছাপাখানার প্রথম যুগে এই হস্তাক্ষর অনুকরণ করেই বাংলা ছাপা হরফ তৈরী হয়েছিল। হওয়াই স্বাভাবিক। লেখকরা বড় বড় রামায়ণ, মহাভারত, চৈতন্য-চরিতামৃত, ভাগবত ইত্যাদির পুঁথি দিনের পর দিন ব'সে এমন সযত্নে

পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি অনুলিখনের কাজ শুধু যে পুরুষরাই করতেন তা নয়, মহিলারাও করতেন। অনেকে হয়ত অবাক হয়ে প্রশ্ন করবেন, কি ক'রে করতেন? পেশা হিসেবে বাইরের কোন কাজ, অথবা জীবিকা অর্জনের জন্য কোন কাজ করার কোন স্বাধীনতা মেয়েদের ছিল না তখন। সুতরাং মেয়েরা পুঁথি নকল করার কাজ করবেন কি ক'রে? এমনও তো হ'তে পারে যে পিতা ও স্বামীরা বাইরে থেকে কাজটা ঠিক ক'রে আনতেন এবং ঘরে ব'সে তাঁদের কন্যা ও স্ত্রীরা সেটা সযত্নে ক'রে দিতেন। একালের অনেক গোঁড়া পরিবারের মেয়েরা অভাবের তাড়নায় ঘরে ব'সে নানারকমের কাজ ক'রে থাকেন! সুতরাং সেকালে মহিলা নকলনবীশ থাকা কিছুই আশ্চর্য নয়! তাছাড়া একালে সামান্য লেখাপড়া জেনে যেমন মেয়েদের মধ্যে অনেকে টাইপরাইটিং শেখেন, তেমনি হয়ত সেকালে চলনসই সংস্কৃত বাংলা শিখে মেয়েরা ঘরে ব'সে হাতের লেখা মক্স করতেন এবং একজন পাকা লিখিয়ে হবার চেষ্টা করতেন। হাতের লেখাটা ভাল ক'রে রপ্ত করতে পারলেই গৃহস্থ ঘরের মেয়েদের ঘরে ব'সে কিছু রোজ-গারের একটা পথ খোলা থাকত—পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি নকল ক'রে। দরিদ্র ঘরের মেয়েরা ও অসহায় বিধবারা হয়ত অনেকে এইভাবে জীবিকা অর্জন করতেন। মেয়েদের মধ্যে লিখনপঠনক্ষম শিক্ষিতের সংখ্যা খুব অল্প থাকলেও, একেবারেই যে ছিল না তা নয়। তখনকার বৈষ্ণব-ঘরের মেয়েদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা নাকি নেহাৎ অল্প ছিল না। এমনিতেই তো বোঝা যায়, যাঁরা ভেক নিতেন তাঁরা অন্যান্যদের তুলনায় অনেক স্বাধীনচেতা ছিলেন। বিশেষ ক'রে ভেকধারী বৈষ্ণবদের কথা বলছি। লেখাপড়াতেও এই ভেকধারিণীরা কিছুটা দুরস্ত ছিলেন। সামাজিক ব্যাপারেও তাঁরা সবচেয়ে আধুনিকা ও "ফরোয়ার্ড" ছিলেন ব'লে মনে হয়। আজকাল 'স্মার্ট' বলতে যা বোঝায়, তাও তাঁরা কম ছিলেন না। সুললিতকণ্ঠে যাঁরা বাবাজীদের আখড়ায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও ভাগবত পাঠ করতেন, তাঁরা যে লীলায়িত ছন্দে কলমের আঁচড় টেনে তার পুঁথিও নকল করতে পারতেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কলকাতা শহরবাসিনী এক বৈষ্ণবী বিধবার উল্লেখ করেছেন লঙ সাহেব। বাংলা লেখাপড়া তিনি ভালই জানতেন, সংস্কৃতেও জ্ঞান ছিল। জীবিকা হিসেবে এই বৈষ্ণবীর নাকি প্রধান পেশা ছিল বাংলা ও সংস্কৃত পুঁথি নকল করা। লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়ে নিশ্চয়ই তিনি এই কাজ করতেন

অথবা কাজ নিয়ে এসে ঘরে ব'সে করতেন। কতকটা একালের লেডী সেক্রেটারী ও পার্সোনাল স্টেনোর কাজ এই বৈষ্ণব মহিলারা করতেন সেকালে। তখনকার সমাজে তাঁরাই প্রগতিশীলা ছিলেন এবং রক্ষণশীলরা তাঁদের এই জাতীয় স্বাধীন কাজকর্ম নিশ্চয় সুনজরে দেখতেন না। সাহিত্যিক ও কবিরা এই সব বৈষ্ণব মহিলা অনুলেখিকাদের পুঁথি কপি করবার জন্য বিশেষভাবে নিয়োগ করতেন কি না সঠিক জানা যায় না, তবে করাটা অসম্ভব নয়। তা যদি সম্ভব হয়, তাহ'লে পাণ্ডুলিপির যুগ আরও অনেক বেশী রোমাণ্টিক হয়ে ওঠে। লেখকের নিজস্ব পাণ্ডুলিপির একটা রোমান্স তো আছেই, ছাপা বইয়ে যে রোমান্সের কোন আভাসও নেই। কিন্তু আসল লেখকরা ছাড়াও, অনুলেখক ও অনুলেখিকাদের নিয়ে, পাণ্ডুলিপি ঘিরে, এমন একটা রোমাণ্টিক পরিবেশের সৃষ্টি হ'ত সেকালে যা একালে কোন ছাপাখানায় হ'তে পারে না।

পদকর্তা পদাবলী রচনা করছেন, চরিতকার চরিতামৃত, রসিক কবি বিদ্যাসুন্দর। ভাবোন্মত্ত অবস্থায় হয়ত মুখে মুখে তিনি কাব্য রচনা ক'রে চলেছেন, আর তাঁর সামনে ব'সে অনুলেখিকা (বৈষ্ণব বা শাক্ত মহিলা) লিখছেন একাগ্রচিত্তে, ঘাড় হেঁট ক'রে। কবির ভাবতরঙ্গে তিনিও ওঠানামা করছেন এবং করতে করতে দিশাহারা হয়ে কলম ছেড়ে দিয়ে ভাবসমুদ্রের কিনারা খুঁজছেন। ঠিক এরকম অবস্থা, একেবারে কবি ডিক্‌টেশন দিচ্ছেন এবং অনুলেখিকা লিখছেন, এ যদি কল্পনা করতে কষ্ট হয়, তাহ'লে করবার দরকার নেই। ভিন্ন অবস্থা কল্পনা করুন। কবি নিজে লিখছেন এবং অনুলেখিকা তাঁরই একটা পুঁথি পাশে ব'সে নকল করছেন। অথবা তাও যদি না হয়, তাহ'লে কোন বিশেষ একজন অনুলেখিকাকে দিয়ে সকলেই লেখাতে চান (হয়ত নির্ভুল ও সুন্দর ক'রে লিখতে পারার জন্য), এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। মোটকথা, যত রকমের অবস্থাই কল্পনা করা যাক না কেন, প্রত্যেকটার মধ্যে কিছু-না-কিছু রোমান্স আছে, একটা থ্রিল আছে। ছাপাখানায় তার কোন চিহ্ন নেই। ছাপাখানায় যাঁরা কাজ করিয়েছেন ও করা দেখেছেন দিনের পর দিন, পাণ্ডুলিপির মর্মান্তিক করুণ পরিণতির কথা তাঁরা নিশ্চয় জানেন। মসিলিপ্ত, জীর্ণ (দ্রুত কম্পোজের জন্য) পাণ্ডুলিপির চেহারা দেখলে কান্না আসে। বই, তা সে যত সুন্দর ছাপা ও বাঁধা বই হোক না কেন, লেখকের নিজস্ব পাণ্ডুলিপির মধ্যে বা

অনুলিখিত পাণ্ডুলিপির মধ্যেও যে প্রত্যক্ষ প্রাণের স্পর্শ পাওয়া যায়, বইয়ের মধ্যে তা পাওয়া যায় না। যন্ত্রযুগের যান্ত্রিক কম্পোজিটারের পাশে সেকালের কোন ভেকধারী বৈষ্ণবী অনুলেখিকার কথা স্মরণ করলেই, বইয়ের সঙ্গে পাণ্ডুলিপির রোমাণ্টিক জগতের পার্থক্য যে কতখানি তা পরিষ্কার বোঝা যায়।

কলিকাতাবাসিনী বৈষ্ণবী অনুলেখিকা পুঁথি পাণ্ডুলিপি নকল ক'রে কি রকম রোজগার করতেন, জানি না। তবে খুব বেশী হ'লে মাসে নগদ চার-পাঁচ টাকা এবং বছরে হয়ত দু'এক জোড়া শাড়ী বা কাপড়। পাণ্ডুলিপি কপি করার কি 'রেট' ছিল তা সঠিক না জানা গেলেও, অনেকটা আন্দাজ করা যায়। কলকাতা শহরে ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতে যে-রেট চালু ছিল, সে সম্বন্ধে ওয়ার্ড সাহেব মোটামুটি একটা হদিশ দিয়েছেন। হাতেলেখা "মুগ্ধবোধ" তিন টাকায় বিক্রী হ'ত, তাও খুব সুন্দর লেখা কপি হ'লে। খারাপ লেখা কপি দেড় টাকাতেও পাওয়া যেত। হাতেলেখা "অমরকোষও" তিন টাকাতে বিক্রী হ'ত। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতে বিদ্যাসাগর মশায় কয়েকটি পাণ্ডুলিপি এই দামে কিনেছিলেন ঃ

কাব্যাদর্শ ঃ পাঁচ সিকা
মাঘটীকা ঃ পাঁচ টাকা
রসমঞ্জরীপ্রকাশ ঃ আট আনা
কিরাতটীকা ঃ আড়াই টাকা

এ-ছাড়া আরও অনেক পুঁথি নকল করার দক্ষিণার কথা জানা যায়, ''সাহিত্য পরিষদ'' ও "এসিয়াতিক সোসাইটির" পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের Descriptive Catalogue থেকে। যেমন—কৃষ্ণরাম দাসের "কালিকা-মঙ্গল" ১৭৫২ সালে কপি করানো হয়েছিল অনুলেখককে নগদ দু'টি টাকা ও একজোড়া কাপড় দিয়ে। ''রামায়ণ'' (চার কাণ্ড) ১৭১৪ সালে কপি করানো হয়েছিল নগদ সাত টাকা, কিছু কাপড় ও মিষ্টি দিয়ে। ১৭০৩ সালে "মহাভারত" (বিরাটপর্ব) কপি করানো হয়েছিল নগদ একটি টাকা দিয়ে। ১৮৪৬ সালে মহাভারতের 'শান্তিপর্ব' মাত্র তের আনায় কপি করানো হয়। ওয়ার্ড সাহেব লিখেছেন, গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে কপি করার রেট ছিল, বারো আনায় বত্রিশ হাজার অক্ষর। একেও উচ্চহার বলা হয়েছে, কারণ এই হারে বড় বড় পুঁথি কপি করাতে নাকি অনেক টাকা ব্যয় হ'ত। রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেছেন যে, গত শতাব্দীর

মাঝামাঝিতে এক হাজার শ্লোক কপি করার রেট ছিল চার টাকা, অর্থাৎ এক টাকায় আড়াইশ' শ্লোক। খুব প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে আরও উচ্চহার ও যাবজ্জীবন ভরণপোষণের কথাও জানা যায়। মনে হয়, ধনী লোকরা হয়ত পণ্ডিত ও বয়স্যের মতন কপিস্ট বা অনু-লেখকও বেতন দিয়ে প্রতিপালন করতেন এবং তাঁর নিজস্ব "ভাণ্ডার" বা পাঠাগারের জন্য তাঁকে দিয়ে পুঁথি নকল করাতেন। যাই হোক না কেন, সেকালে পেশাদার কপিস্ট বা অনুলেখকদেরও একটা স্বতন্ত্র শ্রেণী গ'ড়ে উঠেছিল এবং সমাজের চোখে তাঁদের পেশাটা খুব প্রশংসনীয় ছিল না। এমনিতেই যে পুঁথিপত্র খুব বেশী নকল করানো হ'ত তা নয়, কারণ সাধারণ লোকসমাজে জ্ঞান বিতরণ করাটাই তখন মহাপাপ ব'লে মনে করা হ'ত। ধর্মকর্মে, উৎসব-পার্বণে পণ্ডিত ও পুরোহিতদের পাণ্ডুলিপি দান করা, অথবা নেহাৎ খেয়াল ও সখ চরিতার্থের জন্য নিজের ঘরে এক-আধখানা ধর্মগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রাখা—প্রধানতঃ এই জন্যই পুঁথি নকল করানো হ'ত। পেশাদার কপিস্টদের কোনদিক দিয়েই সামাজিক সম্মান ছিল না। লিপিকররা চাটুকারে পরিণত হয়ে-ছিলেন, সভাকবিদের মতন। সভাকবিদের চাইতেও তাঁদের অবস্থা আরও শোচনীয় ছিল। দর্পনারায়ণ দাস নামক জনৈক লিপিকরের উক্তি এখানে উদ্ধৃত করছি। এই উক্তি থেকে লিপিকরদের আর্থ-নীতিক ও সামাজিক দুরবস্থার কথা পরিষ্কার বোঝা যায়। চার কাণ্ড রামায়ণ লিখে দর্পনারায়ণ কিভাবে পুরস্কৃত হয়েছিলেন, তা তিনি লঙ্কাকাণ্ডের পুঁথির শেষে লিখে গেছেন। দর্পনারায়ণ লিখেছেন ঃ

সেইমত আনন্দেতে রাখ গুরুচরণ দাসে।
কোন প্রকারে পুস্তক লইলে আমার পাশে॥
দাসবাবু আমাকে দিলেন সাত টাকা।
সেইমত দাসের পাপ খণ্ডাহ প্রভু একা॥
পুস্তক লেখাইয়া আমার কৈলেন উপগার।
অনেক জঞ্জালে ত্রাণ করিলে বাবু কর্মকার॥
কর্মকার বাবুরে রাম তুমি কর দয়া।
পুস্তক সাঙ্গেতে বাবু দিবেন বস্ত্র মোয়া॥
আমাকে গামছা দিবেন বহুবাদ ঘুষি।
অতএব রাম দয়া কর সগোষ্ঠী পরিবারে আসি॥

বালিট্যা গ্রামবাসী আমি জাতি যে কায়স্থ।
চারিকান্ড রামায়ণ লিখিলাম সমস্ত॥
(সাহিত্য পরিষদ, চিত্তরঞ্জন সংগ্রহ, পুথি ৩০৩)

* * *

একালের ছাপাখানার কম্পোজিটারদের যা অবস্থা, সেকালের পেশাদার কপিস্টদেরও ঠিক সেই অবস্থা ছিল। কপিস্টদের কথা মনে হ'লে পাণ্ডুলিপির সমস্ত রোমান্স উবে যায়, এমন কি কলি-কাতাবাসিনী বৈষ্ণবী অনুলেখিকার কথা মনে হলেও। বাস্তবিকই পাণ্ডুলিপির যুগের কোন রোমান্স নেই, কিন্তু পাণ্ডুলিপির নিশ্চয় রোমান্স আছে। লেখকের নিজস্ব পাণ্ডুলিপির, হতভাগ্য পেশাদার কপিস্টদের অনুলিখিত পাণ্ডুলিপির নয়। ছাপাখানা তার সমস্ত যান্ত্রিক মালিন্য নিয়েও জ্ঞানের অগ্রদূত, আর পাণ্ডুলিপি অজ্ঞানতার প্রতীক। কিন্তু আমি যে পাণ্ডুলিপির রোমান্সের কথা বলেছি, সে হ'ল লেখকের নিজস্ব পাণ্ডুলিপির; অনুলিখিত পাণ্ডুলিপির নয়, পাণ্ডুলিপি-যুগেরও নয়। ছাপাখানার যুগে এবং ছাপা বইয়ের যুগে, পাণ্ডুলিপির যে নিজস্ব রোমান্স তা আমরা যেন একেবারে হারিয়ে ফেলেছি। কিছুদিন পরে টাইপরাইটার হয়ত একেবারে নিশ্চিহ্ন ক'রে দেবে হাতেলেখা পাণ্ডুলিপি। হাতেলেখা পাণ্ডু-লিপির এই পরিপূর্ণ যান্ত্রিক রূপান্তরের বিরোধী আমি, কারণ তার ফলে পাণ্ডুলিপির মধ্যে তার স্রষ্টাদের ব্যক্তিসত্তার জীবন্ত স্পর্শ আমরা চিরদিনের মত হারিয়ে ফেলব। ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে তার জন্য কৈফিয়ৎ দিতে হবে। টাইপ-করা কপি বা ছাপা বই দেখে তারা খুশী হবে না। জীবন্ত মানুষের পরিচয় খুঁজবে তারা হাতেলেখা পাণ্ডুলিপির মধ্যে। লেডী টাইপিস্টদের নিখুঁত কপি বা লাইনোতে ছাপা ঝক্‌ঝকে বই দেখিয়ে তাদের কৌতূহল মেটানো যাবে না। পাণ্ডুলিপির অন্ধকার যুগ পার হয়ে এসে ছাপাখানার আলোর রাজ্যে প্রবেশ করলেও, পাণ্ডুলিপির এই নিজস্ব রোমান্স নষ্ট করার কোন অধিকার নেই আমাদের। লেডী টাইপিস্ট বা বৈষ্ণবী অনুলেখিকাদের নিয়ে যত রোমাণ্টিক পরিবেশেরই সৃষ্টি করি না কেন, তাঁদের অনুলিখিত পাণ্ডুলিপির কোন রোমান্স নেই। লেখকের নিজস্ব পাণ্ডুলিপির রোমান্স চিরকাল ছিল, এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে, কারণ তার মধ্যে তাঁর সমস্ত সত্তার জীবন্ত ছাপ থেকে যায়—কপিস্টের লেখায় বা কম্পোজিটারের টাইপ-সেটিঙে সে-ছাপ থাকে না।

গ্রন্থনগরী কলকাতা

(এক)

"কলকাতা কালচারের" গোড়াপত্তন হয় গ্রন্থ দিয়ে, যন্ত্র দিয়ে নয়। অবশ্য 'যন্ত্র' বলতে যদি পণ্য-উৎপাদনেরই যন্ত্র বোঝায় শুধু। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রও যন্ত্র এবং যন্ত্রযুগের সমস্ত যন্ত্রের মধ্যে বোধ হয় সবচেয়ে শক্তিশালী যন্ত্র; সামান্য একটি নড়বড়ে মুদ্রাযন্ত্র গোটা সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিৎ পর্যন্ত নাড়িয়ে দিতে পারে, আর কোন যন্ত্র তা পারে না। প্রাচীন ও মধ্যযুগের নগর পাণ্ডুলিপির নগর, আধুনিক নগর ছাপাখানার ও ছাপা বইয়ের নগর। ''মেশিন-মেড গুড্‌স'' নয়, "মেশিন-মেড বুক্‌স-ই'' আধুনিক নাগরিক কালচারের বনিয়াদ, আমাদের ক্যালকাটা কালচারেরও।

হুগলী শহরে ১৭৭৮ সালে এবং কলকাতা শহরে ১৭৮০ সালে মুদ্রাযন্ত্র প্রথম স্থাপিত হয়। জানি না তার আগে আর কোন যন্ত্র কলকাতায় এসেছিল কিনা, এবং এলেও মুদ্রাযন্ত্রের মতন যুগান্তকারী প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল কিনা। ১৮২৫-২৬ সালে আমরা কলকাতা শহরের গঙ্গাতীরে ধানভাঙা কল ও গম-পেষাই কলের বিচিত্র কীর্তিকলাপের সংবাদ পাই। সারাজীবন ঢেঁকি আর যাঁতা দেখেছেন যাঁরা, তাঁরা ভিড় করেছেন গঙ্গাতীরে এই ধানভাঙা আর গমভাঙা কল দেখার জন্য। কলের আশ্চর্য কীর্তির কথা ঘোষণা ক'রে তখনকার পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে, হৈ চৈ প'ড়ে গেছে শহরে। কল এসেছে, বিলেত থেকে কল, ইংরেজের কলের কিবা মহিমা। ''ঐ যন্ত্রে প্রতিদিন কেবল দুইজন লোকে ১০ মোণ তণ্ডুল প্রস্তুত করিতে পারে তাহার একজন কল লাড়ে"—এই হ'ল ধানকল। ঢেঁকিতে আধমণের বেশী ধান ভানতে তিন-চারজনকে হয়রাণ হয়ে যেতে হয়, তাও আবার সমস্বরে শিবের গীত গেয়ে এনার্জি আহরণ করতে হয়। ধানকলে তা

হয় না। আর গমভাঙা কলের তো কথাই নেই। "এই কলের দ্বারা গোম পেষা যাইবে ও ধান ভানা যাইবে ও মর্দনের দ্বারা তৈলাদি প্রস্তুত হইবে এবং এই সকল কার্য ত্রিশ অশ্বের বল ধরি বাষ্পের দুইটা যন্ত্রের দ্বারা সম্পন্ন হইবে।" এ-হেন ইংরেজের কল দেখার জন্য লোকের ভিড় তো হবেই—"এতদ্দেশীয় অনেক লোক এই আশ্চর্য বিষয় দর্শনার্থে যাইতেছেন"—এবং পত্রিকার সম্পাদক সকলকে দেখতে যাবার অনুরোধ করছেন—"আমরা আপনাদের সকল মিত্রকে এই পরামর্শ দি যে তাহারা এই অদ্ভুত যন্ত্র বাষ্পের দ্বারা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দুই হাজার মোণ গোম পিষিতে পারে তৎস্থানে গমন করিয়া তাহা দর্শন করেন।"

এই ধানভাঙা কল ও গমপেষা কলের অনেক আগে বইছাপা কল এসেছিল কলকাতা শহরে। হিকি সাহেব ও গ্লাডউইন সাহেব যখন বইছাপা কল বসান কলকাতা শহরে তখন তো দেখবার জন্য লোকে ভিড় করেছিল কি না, কোন সাময়িক পত্রিকায় তার বিবরণ পাওয়া যায় না। পাওয়া সম্ভবও নয়। কেন নয়, কথাটা একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন। বইছাপা কল যখন প্রথমে এল, তখন তার আগমনবার্তা ঘোষণা করবে কে, তাকে অভিনন্দন জানাবে কে? কোন ছাপা সাময়িক পত্রিকা বা কাগজের তখনও জন্ম হয়নি। তার জনক যে মুদ্রাযন্ত্র, তারই তো প্রথম আবির্ভাব হ'ল। সুতরাং তাকে অভ্যর্থনা করার কেউ ছিল না তখন এবং তার আগমন সংবাদ জানানোও তখন সম্ভব ছিল না। শহরের লিপিকররা হাতে-লেখা পত্র মারফৎ নিশ্চয়ই দেশের লোককে সে-সংবাদ জানাবার চেষ্টা করেননি। চেষ্টা করলেও জানাতে পারতেন কিনা সন্দেহ, কারণ একমাত্র হাতে-লেখা প্রাচীরপত্র শহরময় দেয়াল ও গাছের গায়ে এঁটে দিয়ে তাঁরা হয়ত বইছাপা কলের খবরটা লোককে জানাতে পারতেন। কিন্তু "প্রাচীরপত্রের" আইডিয়াও আধুনিক। সুতরাং তাঁরা তা জানাননি এবং বইছাপা কল নিঃশব্দেই এসেছিল কলকাতা শহরে। তারপর প্রথম ছাপা বই ও ছাপা পত্রিকা যখন বাইরে প্রকাশ হ'ল, তখন ধীরে ধীরে লোকমুখে গুঞ্জিত হতে থাকল বইছাপা কলের কথা এবং তা দেখবার জন্য লোকের ভীড়ও হ'ল। প্রথম বই-ছাপা কল, প্রথম ছাপা বই ও ছাপা পত্রিকা যাঁরা দেখেছিলেন কল-কাতায় তাঁদের সেই বিস্ময় আজ আমরা কল্পনাতেও বুঝতে পারব না। দিব্যচক্ষে দেখা যায়, কলকাতা শহরের তখনকার বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী

স্ত্রী-পুরুষ লিপিকরেরা বোধ হয় সবার আগে এই বইছাপা কল দেখতে গিয়েছিলেন, হিকি সাহেব ও গ্লাডউইন সাহেবের ছাপাখানায়। দুঃখের বিষয় তার প্রত্যক্ষ বিবরণ কেউ লিপিবদ্ধ ক'রে যাননি। অন্ততঃ হিকি সাহেব তাঁর বিখ্যাত "গেজেটে" বা গ্লাডউইন সাহেব "ক্যালকাটা গেজেটে" নিশ্চয়ই পরে এ-সম্বন্ধে কিছু লেখেননি, অন্ততঃ আমি নিজে এই ধরনের বিবরণ তাঁদের গেজেটে কোথাও খুঁজে পাইনি।

খুঁজে না পেলেও ক্ষতি নেই। ধানভাঙা ও গমভাঙা কল, বা অন্যান্য নানা রকমের কল কলকাতা শহরে ও তার উপকণ্ঠে পৌঁছানোর অনেক আগে, মুদ্রাযন্ত্র বা বইছাপা কল যে অভূতপূর্ব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল এ'দেশে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ১৮২৫-'২৬ সালের মধ্যে আমরা কলকাতা শহরে একাধিক ছাপাখানার খবর পাই। তার মধ্যে শোভাবাজারের বিশ্বনাথ দেবের প্রেস, শাস্ত্রপ্রকাশ প্রেস, শিয়ালদহের পীতাম্বর সেনের প্রেস, সিন্ধু যন্ত্র, মির্জাপুরের সম্বাদতিমিরনাশক প্রেস, মুন্শী হেদাতুল্লার প্রেস, চোরবাগানের রামকৃষ্ণ মল্লিকের প্রেস, বহুবাজারের লেবেণ্ডিয়ার সাহেবের প্রেস, আরপুলির হরচন্দ্র রায়ের প্রেস, এন্টালী পীয়ার্স সাহেবের প্রেস, শাঁখারিটোলার বদন পালিতের প্রেস, মহেন্দ্রলাল প্রেস, ধর্মতলার রামমোহন রায়ের ইউনিটেরিয়ান প্রেস, বঙ্গদূত প্রেস, সমাচার চন্দ্রিকা প্রেস, ফেরীস এন্ড কোম্পানীর প্রেস, সংস্কৃত যন্ত্র, হিন্দুস্থানী প্রেস, কলেজ প্রেস ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ধানকল, গমকল, পাটকল, কাপড়ের কলের অনেক আগে হিকি সাহেব, গ্লাডউইন সাহেব, রামমোহন রায়, মির্জাপুরের ব্রাহ্মণ বাবুরাম, গুজরাটী ব্রাহ্মণ লল্লুলাল, বাঙালী ব্রাহ্মণ গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য, চোরবাগানের রামকৃষ্ণ মল্লিক, শাঁখারিটোলার বদন পালিত ও মহেন্দ্রলাল, বিশ্বনাথ দেব, মুন্শী হেদাতুল্লা প্রভৃতির বইছাপা কল বাংলার ও বাঙালীর নবজাগরণকেন্দ্র কলকাতা শহরকে গ্রন্থ-নগরীতে পরিণত করেছিল। কলকাতা শহর যদি আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণের মহাকেন্দ্র হয়, তাহ'লে ধানকলের চাল, পাটকলের পাট বা কাপড়ের কলের কাপড়ের অনেক আগে, বইছাপা কলের বই-পত্র সেই জাগরণের সঞ্চার করেছে বলতে হবে। **প্রাসাদপুরী কলকাতা নয়, বা কলকারখানার চিমনির ধোঁয়ায় ঢাকা কলকাতা নয়, ছাপাখানার ছাপা বইপত্রের কলকাতা, গ্রন্থ-নগরী কলকাতাই আমা-**

দের নবজাগরণের আদি তীর্থস্থান। গৌড়, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা হ'ল হাতেলেখা পাণ্ডুলিপির রাজ-নগর বা তীর্থ-নগর—প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় কালচারের প্রতীক। কলকাতা শহর ছাপাখানায় ছাপা গ্রন্থনগরী—আধুনিক কালচারের প্রতীক।

আধুনিক কালচারের তীর্থস্থান কলকাতা মহানগরকে যাঁরা গ্রন্থনগরীরূপে গ'ড়ে তুলেছেন ছাপাখানা, ছাপা বই ও পত্রিকা দিয়ে, তাঁদের মধ্যে সবার আগে দু'জন বাঙালীর নাম করতে হয়—পঞ্চানন কর্মকার ও গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের। একজন বাঙালী কর্মকার, আর একজন বাঙালী ব্রাহ্মণ—আধুনিক ইতিহাসের এ এক আশ্চর্য রাখীবন্ধন। এছাড়া খিদিরপুরের "সংস্কৃত যন্ত্র" প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা অবাঙালী বাবুরাম ও লল্লুর নামও করা উচিত। কিন্তু আনুমানিক ১৮০৬-'০৭ সালে এই ছাপাখানা স্থাপিত হলেও, প্রধানতঃ দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দী ও সংস্কৃত বই সেখান থেকে ছাপা হ'ত। তবু ভারতীয় ভাষায় ছাপার জন্য একজন ভারতীয় প্রতিষ্ঠিত কলকাতা শহরের প্রথম ছাপাখানা এই ''সংস্কৃত যন্ত্র''। তার আগে পঞ্চানন কর্মকার অবশ্য উইলকিন্স সাহেবের কাছে কাজ শিখে বাংলা ছাপার হরফ তৈরী করেছেন এবং তাতে বইও ছাপা হয়েছে, কিন্তু সাহেবদের প্রেস থেকে। **গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যই প্রথম বাংলা বই ছাপা শুরু করেন কলকাতার ''ফেরীস এণ্ড কোম্পানীর প্রেস'' থেকে।** তার আগে তিনি শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশনের ছাপাখানায় কম্পোজিটারের কাজ করেন। কলকাতা থেকে তাঁর প্রথম ছাপা বাংলা বই ভারতচন্দ্রের ''অন্নদামঙ্গল''—১৮১৬ সালে প্রকাশিত হয়। **গঙ্গাকিশোরের ছাপা এই ''অন্নদামঙ্গলই' প্রথম সচিত্র ছাপা বাংলা বই।** কয়েকখানি ধাতুখোদাই ও কাঠখোদাই চিত্র ছিল বইখানির মধ্যে, খোদাই করেছিলেন শিল্পী রামচাঁদ রায়। বইয়ের সংখ্যা ও কাটতি বাড়াতে গঙ্গাকিশোর একটি বইয়ের দোকান খোলেন এবং প্রতিলিপি পাঠিয়ে বাইরে বই বিক্রীর ব্যবস্থা করেন। বোধ হয়, **গঙ্গাকিশোরই প্রথম কলকাতা শহরে বইয়ের দোকান খোলার পথ দেখান।** তারপর ১৮১৮ সালে গঙ্গাকিশোর নিজেই একটি ছাপাখানা করেন—''বাঙ্গাল গেজেটি প্রেস'' এবং সেখান থেকে "বাঙ্গাল গেজেটি" নামে বাংলা সাময়িক পত্র প্রকাশ করেন। **গঙ্গাকিশোরের এই ''বাঙ্গাল গেজেটি''-ই বাঙালী প্রবর্তিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র ব'লে অনুসন্ধানীরা স্বীকার করেন।** তাহ'লে দেখা

যাচ্ছে, কম্পোজিটার গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের কাছে আমরা অনেক দিক থেকে ঋণী। তিনিই প্রথম সচিত্র বাংলা বইয়ের মুদ্রাকর ও প্রকাশক, প্রথম বইয়ের দোকানদার ও ব্যবসাদার এবং প্রথম বাংলা সংবাদপত্রের বাঙালী প্রবর্তক। আর পঞ্চানন কর্মকার তো বাংলা ছাপার হরফের অন্যতম স্রষ্টা। সুতরাং আজকালকার বাংলা কম্পোজিটার, বাংলা হরফনির্মাতা, মুদ্রাকর, প্রকাশক, গ্রন্থব্যবসায়ী, গ্রন্থকার ও সাংবাদিক, সকলের কাছে সর্বাগ্রে বরণীয় হলেন এই দু'জন বাঙালী —পঞ্চানন কর্মকার ও গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। যে ছাপাখানা ও ছাপা বইপত্র থেকে আধুনিক ক্যালকাটা কালচারের জন্ম ও বৃদ্ধি হয়েছে, বাঙালীদের মধ্যে তার আদি ও অন্যতম প্রবর্তক এই দু'জন। দুর্ভাগ্যবশতঃ এঁরা কেউ মুন্‌শী থেকে মহারাজা হননি, বেনিয়ানি ও মুচ্ছুদ্দিগিরি ক'রে লক্ষপতি "বাবু" হননি, অথবা ইংরেজ প্রভুদের মোসাহেবি ক'রে রাতারাতি হঠাৎ-জমিদার বা তালুকদার হননি, তাই এঁদের স্মরণ করা দূরে থাকুক, স্মৃতিরক্ষা বা স্মৃতি-উৎসবের কথা চুলোয় যাক, নাম পর্যন্ত আমরা ভুলে গেছি। আমরা নব্য-কালচারের বড়াই করি, খ্যাতনামা যুগ-প্রবর্তকদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানাই, কিন্তু কর্মকার ও কম্পোজিটার ব'লে পঞ্চানন ও গঙ্গাকিশোরের নামও জানি না। তার মানে আমরা কালচার্ড বটে, কিন্তু কালচারের ইতিহাসের ধার ধারি না।

* * *

একটা কথা এখানে বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে কলকাতা শহরে বইপত্র ছাপা শুরু হবার পর থেকে আমরা যখন অর্ধবর্বর মধ্যযুগ থেকে আধুনিক সভ্যযুগে পদার্পণ করি, তখন ইয়োরোপীবাসী বা ইংরেজরা আমাদের চেয়ে বেশী সভ্য ছিলেন না। যেমন একটা দৃষ্টান্ত দিই। আমাদের দেশের দাসপ্রথার কথা বিদেশীরা বিদ্রূপ ক'রে উল্লেখ করেন। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষেও ইংলণ্ডে নিয়মিত দাস কেনাবেচা চলত, পণ্যের মতন, বিশেষ ক'রে নিগ্রোদের। বিখ্যাত 'লিভারপুল ক্রনিকেল' পত্রিকার ১৭৬৮ সালের ১৫ই ডিসেম্বরের সংখ্যা থেকে একটি বিচিত্র বিজ্ঞাপন তার সাক্ষী হিসেবে তুলে দিচ্ছি—

"To be sold
A Fine Negro Boy
of about 4 ft. 5 inches high
of a sober, tractable, human disposition.

Eleven or twelve years of Age, talks English very well and can dress hair in a tolerable way".

১৮০৬ সালে ইংলণ্ডে দাস ব্যবসা বন্ধ হয়। যাঁরা নিজেরা দাস-কেনাবেচা করতেন এবং কাগজে এরকম প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন দিতেন, তাঁরা যে কেবল কয়েকটা যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে শিল্পবিপ্লব ক'রে ফেলেছিলেন ব'লে আমাদের চেয়ে বেশী সভ্য ছিলেন তা ভাববার কোন সঙ্গত কারণ নেই। কলকাতার 'ক্যালকাটা গেজেট', 'সমাচার দর্পণ' ও অন্যান্য পত্রিকায় আমাদের দেশে দাস কেনাবেচার বহু বিজ্ঞাপন ও সংবাদ বেরিয়েছে, কিন্তু তার অধিকাংশই হ'ল নির্মম দারিদ্র্যের চাপে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা বিক্রয়ের সংবাদ। মর্মান্তিক সংবাদ সন্দেহ নেই, কিন্তু তখনকার ইংরেজদের কাছে তার জন্য লজ্জিত হবার কোন কারণ ছিল না। জাতি হিসেবে ইংরেজদের তখনকার অবস্থা সম্বন্ধে একজন শ্রেষ্ঠ ইংরেজ হোরেস ওয়ালপোল ব'লে গেছেন ঃ

A gaming, robbing, wrangling, railing nation without principles, genius, character or allies ; the over-grown shadow of what it was (1771).

আমার বক্তব্য হ'ল, এহেন ইংরেজরা যে আমাদের দেশে জাতীয় নবজাগরণের অগ্রদূতরূপে কাজ করেছেন সেটা অতিকথা, রূপকথা ও নিছক কল্পনা ছাড়া কিছু নয়। একই সময় পৃথিবীতে কতকগুলি যুগান্তকারী আবিষ্কার ও বৈপ্লবিক আন্দোলনের ফলে ইংরেজরা যেমন সজাগ হয়েছেন, তেমনি আমরাও হয়েছি, শুধু ঘটনাচক্রে ইংরেজরা যোগসূত্রের কাজ করেছেন মাত্র। ফরাসী বিপ্লব ও আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলনের আঘাত অনুভব না করলে শুধু শিল্পবিপ্লব ইংরেজ জাতকে কতটা ঠেলে এগিয়ে নিয়ে যেত তা নিশ্চয়ই ভাববার বিষয়। এই সময় ইংলণ্ডের ছাপাখানার প্রসার হয়, ছাপা বই পত্রিকার সংখ্যা বাড়ে, অসংখ্য সঙ্ঘ গড়ে ওঠে, নগরে নগরে ভ্রাম্যমান পাঠাগারের বিস্তার হয়। এক কথায় নতুন ভাবধারা প্রচারের জন্য বইছাপা কল যখন অসংখ্য বইপত্র ইস্তেহার ছেপে ইংলণ্ডের কুৎসিত শিল্পনগরগুলিকে গ্রন্থনগরীতে পরিণত করে, তখনই ইংরেজ জাতিরও নবজাগরণ শুরু হয়। সেটা বেশী দিনের কথা নয়, অষ্টাদশ শতাব্দীর কথা। এই সময়েই যে ইংলণ্ডে বই ছাপা ও ছাপার হরফের সংস্কার হয়, তা আগে বলেছি। ঠিক এই সময়েই

আমাদের দেশের বড় বড় শহরে মুদ্রাযন্ত্র আসে, যন্ত্রযুগের সবচেয়ে বৈপ্লবিক যন্ত্র। পর্তুগীজ ও ইংরেজরাই তা আনেন, কিন্তু সেটা বড় কথা নয়, একটা ঘটনা মাত্র। মুদ্রাযন্ত্র তাঁদের আবিষ্কার নয়, জার্মানদের—তাঁরা বহন ক'রে এনেছিলেন এদেশে নিজেদের কাজের জন্য। তার চেয়ে অনেক বড় কথা, অনেক বেশী ঐতিহাসিক তাৎপর্য-পূর্ণ কথা হ'ল, এই মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ও ব্যবহারে ইংরেজদের চেয়ে এদেশের লোক বেশী ছাড়া কম আগ্রহশীল ও তৎপর ছিলেন না। পাদরি সাহেবেরা বই ছাপার ব্যাপারে তৎপর ছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁদের ছাপাখানার এদেশী কম্পোজিটার ও কারিগররা তাঁদের চেয়ে অনেক বেশী উৎসাহ নিয়ে এপথে এগিয়ে গেছেন। তার প্রমাণ গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য এবং এরকম আরও অনেকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝির মধ্যে কলকাতা শহরে যতগুলি ছাপাখানা স্থাপিত হয় এবং যতগুলি বই ও পত্রিকা প্রকাশিত হয়, তা প্রধানতঃ এদেশী বাঙালীদের উদ্‌যোগে কলকাতা শহরকে প্রধানতঃ বাঙালীরাই গ্রন্থনগরীতে পরিণত করেন। শুধু রামমোহন রায় বা দ্বারকানাথ ঠাকুর নন, পঞ্চানন কর্মকার, গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য, বিশ্বনাথ দেব, বদন পালিত, মহেন্দ্রলাল, মুনশী হেদাতুল্লা, মহম্মদ দেরাসতুল্লা ('মহাম্মদি যন্ত্রের' প্রতিষ্ঠাতা), কাজী সফীউদ্দিন ('সোলেমানি প্রেসের' প্রতিষ্ঠাতা) এবং আরও অনেকে বাঙালীর নব-জাগরণের অগ্রদূত। আমাদের আধুনিক সংস্কৃতি-প্রাসাদের বনিয়াদ, এমন কি একতলা পর্যন্ত বলা চলে, এঁরাই ইঁট গেঁথে গেঁথে গড়ে তুলেছেন।

ঐতিহাসিকরা শুধু ইংরেজ শিক্ষাব্রতী ও পাদরিদের কথা, রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথের কথা লিখে গেছেন—ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকরা এঁদের কথা সমান শ্রদ্ধার সঙ্গে লিখবেন। না লিখলে নতুন যুগের বাঙালীর ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকবে। কারণ যখন কলকারখানা বিশেষ গ'ড়ে ওঠেনি, শুধু দু'একটা ধানকল ও গমপেষাই কল এসেছে—যখন রেলপথ, টেলিগ্রাম হয়নি, আধুনিক ডাক ব্যবস্থাও ছিল না—তখন এঁরাই মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে, বইপত্র ছেপে প্রকাশ ও প্রচার করে, ঘুমন্ত দেশকে জাগিয়ে তুলেছিলেন। বাঙালীর নবজাগরণের এঁরাই প্রথম চারণ, প্রথম বৈতালিক—ধর্মতলা, শাঁখারিটোলা, চোরবাগান, শোভাবাজার, বটতলা, মির্জা-পুর, শিয়ালদহের ছোট ছোট ছাপাখানার খটাং খটাং শব্দে যাঁরা কলকাতাকে গ্রন্থ-নগরী তথা জ্ঞানবিদ্যার মহানগরী ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির তীর্থস্থানে পরিণত করেছেন। কলকারখানার ভোঁ তার অনেক পরে বেজেছে।

(দুই)

"কিন্তু দশ বৎসরাবধি ভারতবর্ষে মুদ্রাঙ্কনকার্যের অপূর্বরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে এবং কলিকাতা নগরে ভূরি ভূরি ঐ যন্ত্রালয় হইয়াছে। তদধ্যক্ষেরা এইক্ষণে প্রতিযোগিতারূপে এমত উদ্যোগ করিতেছেন যে কে কত উত্তমরূপে অথচ অল্পমূল্যে গ্রন্থাদি ছাপাইতে পারেন।"

—সমাচার দর্পণ, ২৩শে অক্টোবর, ১৮৩৩

ছাপাখানার দৌলতে কলকাতা শহর যে গ্রন্থনগরী হয়ে উঠছে, "সমাচার দর্পণের" এই মন্তব্য থেকেই তা পরিষ্কার বোঝা যায়। তখনও কলকাতা শহর প্রাসাদপুরী হয়ে ওঠেনি, বিগত শতাব্দীর গোড়ার দিকের কথা বলছি। কল-কারখানার চিমনির ধোঁয়ায় কলকাতার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে যায়নি। প্রয়াগ বারাণসীর মতন প্রাচীন ও মধ্যযুগের নগরের তুলনায় কলকাতা তখনও বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছাড়া কিছু নয়, কারণ—

পাকাবাড়ী	...	১৪,৬২৩
খোলাঘর	...	২০,৩০৪
খড়ের ঘর	...	৩০,৫৬৭
কাঁচাঘর	...	১৯,১৯১
কাঁচা-পাকা-ঘর	...	২,৪১৬
একতলা	...	১৫,০৩৪
দোতলা	...	১২,১২০
তেতালা	...	২,৯৯৮
চৌতালা	...	১,০১৯
পাঁচতলা	...	২০০
ছয়তলা	...	৭
সাততলা	...	১

অর্থাৎ ইঁট-পাথরের শহর হিসেবেও মধ্যযুগের তীর্থনগরকে তখনও অতিক্রম করতে পারেনি আধুনিক কলকাতা মহানগর। দেবালয়ের নগর, রাজপ্রাসাদের নগর, কারু-শিল্পী ও লোক-শিল্পীর নগর এবং পাণ্ডুলিপি ও লিপিকরের নগর তখনও কল-কারখানার আধুনিক শিল্প-বাণিজ্যের নগরের তুলনায় অনেক বেশী ঐশ্বর্য-মণ্ডিত। প্রাসাদ নয়, ছাপাখানাই তখন কলকাতা শহরের সবচেয়ে

শ্রেষ্ঠ সম্পদ এবং আধুনিকতার অন্যতম প্রতীক। প্রাসাদপুরীর ধনিক বাসিন্দাদের জন্য নয়, কোটিপতি লক্ষপতি ব্যবসায়ী বা মিল-মালিকদের জন্যও নয়, এমন কি চাকুরিজীবী মধ্যবিত্ত বা শ্রমজীবী মজুরদের জন্যও নয়,—মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও কম্পোজিটারদের জন্যই প্রধানতঃ কলকাতা শহরের ঐতিহাসিক শ্রেষ্ঠত্ব তখন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। আধুনিক কালচারের পীঠস্থানরূপে কলকাতা শহরকে যাঁরা প্রথম রূপায়িত করেছেন, যাঁরা সর্বপ্রথম উদ্‌যোগী হয়ে কলকাতাকে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত করেছেন, তাঁরা মুদ্রাযন্ত্রের মালিক, ছাপা হরফ নির্মাতা ও ছাপাখানার কম্পোজিটার। নতুন যুগের চিন্তাবিপ্লবের তাঁরাই অগ্রদূত, প্রগতির তাঁরাই পথিকৃৎ। আজ তাঁদেরই প্রথম অভিনন্দন জানাতে হয়। শুধু ইঁট-পাথর নয়, তার চেয়েও বেশী মুদ্রিত গ্রন্থ দিয়ে কলকাতার ভিৎগড়া। আজও কলকাতা শহরের মোট গ্রন্থের সংখ্যা ইঁটের সংখ্যার চেয়ে কম হ'লেও নিশ্চয় গৃহের সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশী।

১৮২৯ সালের ১৯শে ডিসেম্বর "বঙ্গদূত" পত্রিকায় মুদ্রিত সমাচারপত্রের যে তালিকা ছাপা হয়, তার থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, বিগত শতাব্দীর তৃতীয় দশকের মধ্যেই, অর্থাৎ রামমোহনের যুগেই, কলকাতা শহর ও তার আশেপাশে (প্রধানতঃ শ্রীরামপুরে) ছাপাখানার প্রসার কতখানি হয়েছিল। এই সময় ইংরেজী ভাষায় দৈনিক পত্র প্রকাশিত হচ্ছে—"বেঙ্গল হরকরা ও ক্রাণিকল্", "জানবুল" "কলিকাতা গেজেট", সপ্তাহে দুই-তিনবার "গবর্ণমেণ্ট গেজেট", "ইণ্ডিয়া গেজেট", "বেঙ্গল ক্রাণিকল", সাপ্তাহিক "বেঙ্গল হেরাল্ড", "লিটেররী গেজেট", "ওরিয়েন্টাল অবজর্বর", সাপ্তাহিক দ্রব্য-মূল্যের পত্রিকা "কলিকাতা একস্‌চেঞ্জ প্রাইস করেণ্ট", "কলিকাতা উইকলী প্রাইস করেণ্ট", "ডোমেষ্টিক রিটেল প্রাইস করেণ্ট", শ্রীরাম-পুরের ইংরেজী-বাংলা 'সমাচার দর্পণ', ফরাসী সাপ্তাহিক "জামিজাহাঁনুমা", বাংলা পত্রিকা "বঙ্গদূত", "সমাচারচন্দ্রিকা", "সম্বাদ কৌমুদী", "সম্বাদ তিমিরনাশক"। মুদ্রাযন্ত্রের রীতিমত প্রতিষ্ঠা না হ'লে এতগুলি দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করা সম্ভব নয়। "বঙ্গদূত" পত্রিকায় এ সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয়েছে ঃ "এতদ্ভিন্ন ইংরাজিতে মাসিক ও ত্রৈমাসিক ও সাম্বৎসরিক অনেক প্রকার সংবাদ সংঘটিত পুস্তক ছাপা হইয়া প্রতিনিয়ত প্রকাশ পায় এবং ক্ষুদ্র যন্ত্রালয়ে অনেকানেক গ্রন্থ ইংরাজি পারস্য ও দেবনাগর ও

বাঙলা অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত হয় তাহার সংখ্যা লিখনাতিরিক্ত অতএব পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন যে এতদ্দেশে ছাপা যন্ত্রের কি পর্যন্ত বিস্তার হইয়াছে ও তদ্দ্বারা নানা দেশীয় সমাচার ও নানাবিধ গ্রন্থ রচনায় লোকের কীদৃক্ উপকার দর্শিতেছে।" এবার বিচার ক'রে দেখা যাক, বাস্তবিকই "লোকের কীদৃক্ উপকার দর্শিতেছে।"

প্রথমতঃ দেশের লোক চোখ মেলে ছাপার অক্ষরের দিকে দেখতে শিখেছেন। গোড়ারদিকে ছাপার অক্ষর দেখলেই তাঁরা চোখ বুজে থাকতেন। কথাটা আরও একটু ব্যাখ্যা ক'রে বলা দরকার। প্রথম প্রথম যখন ছাপাখানায় বইপত্র ছাপা আরম্ভ হ'ল তখন সেই সব ছাপা বইপত্র, এমন কি ছাপা অক্ষরকে পর্যন্ত এদেশের লোক অ-দৃশ্য ও অস্পৃশ্য মনে করতেন, বিদেশী ও বিজাতীয় যন্ত্রে বই ছাপা হ'চ্ছে, তাও গোড়ার দিকে ধর্মগ্রন্থই বেশী, সুতরাং সমস্ত ছাপার ব্যাপারটাকে সকলে পাদ্রি সাহেবদের ষড়যন্ত্র ব'লে মনে করতেন, এদেশের ধর্মনাশের ষড়যন্ত্র, বিধর্মীর খাদ্য, পোষাক-পরিচ্ছদ, ধর্মানুষ্ঠানাদি যেমন, ছাপাখানা ও ছাপা বইপত্রও তেমনি অস্পৃশ্য ও বর্জনীয়। ছাপাখানার নাম শুনলে এবং ছাপা বইপত্র দেখলে তাই দেশের লোক "নারায়ণ, নারায়ণ" ব'লে চক্ষু মুদ্রিত করতেন এবং হয়ত আত্মশুদ্ধির জন্য মন্ত্রোচ্চারণও করতেন মনে মনে। মনে করুন, কোন মুদ্রাযন্ত্র চোখে দেখলে বা ছাপা বই স্পর্শ করলে তিনবার গঙ্গায় ডুব দিয়ে আসতে হ'ত। আরও মনে হয়, মুদ্রাযন্ত্র ও মুদ্রণের বিরুদ্ধে এই প্রচারে ধর্মান্ধদের সঙ্গে হয়ত কিছুটা পেশাদার লিপি-করেরাও তখন বেকার হবার আশঙ্কায় হাত মিলিয়েছিলেন। কিন্তু ক্রমে মুদ্রাযন্ত্রে ছাপা পত্রিকা ও গ্রন্থাদির চাপে সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যায়, সাধারণের গোঁড়ামি ও অজ্ঞতাপ্রসূত কুসংস্কারও দূর হয়ে যায়। "বঙ্গদূত" পত্রের এই মন্তব্যটি থেকে এই কথাই মনে হয়ঃ "পূর্বে অস্মদেশীয় লোক কোন পত্র ছাপা অক্ষরে মুদ্রিত দেখিলে নয়ন-মুদ্রিত করিতেন যেহেতু সাধারণের সাধারণবোধে ইহাই নিশ্চয় ছিল যে বর্ণান্তরীয় লোক ছাপায় কেবল আমাদিগের ধর্ম ছাপায় এক্ষণে সে ভয়ে নির্ভয় হইয়া অনেকে চক্ষুঃপ্রকাশপূর্বক ছাপার পত্র দেখিয়া থাকেন যেহেতু যথার্থ তাৎপর্য বোধ করিয়াছেন...।"

* * *

লোকের যে "কীদৃক্ উপকার দর্শিতেছে", ছাপাখানা ও ছাপা বইপত্রের বিস্তারের ফলে, এই হ'ল তার প্রথম নিদর্শন। দ্বিতীয়

"উপকার" হ'ল সাধারণ গ্রন্থাগার। ছাপাখানার আগের যুগে "সাধারণ গ্রন্থাগার" ব'লে কোন কিছুর অস্তিত্ব পৃথিবীর কোন দেশে ছিল না, এদেশেও ছিল না। প্রাচীন পুঁথিতে গ্রন্থ "ভাণ্ডারের" কথা যাই থাক না কেন এবং তাতে গ্রন্থদানের পুণ্য ও মাহাত্ম্যের কথা যতই বলা হোক না কেন, হাতে-লেখা পাণ্ডুলিপির যুগে "পাবলিক লাইব্রেরী" বা সাধারণ গ্রন্থাগার বলতে আমরা যা বুঝি, তার অস্তিত্ব থাকতে পারে না, কলকাতা শহরেও সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয় ছাপাখানার বিস্তারের পরে। ১৮৩৫ সালে জন গ্রান্ট সাহেবের সভাপতিত্বে টাউন হলের এক সভায় কলকাতায় সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করা হয়। "একশত জন সাহেব ঐ পুস্তকালয়ে তিনশত টাকা করিয়া দান করিতে স্বীকার করিয়াছেন অতএব ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত স্থির হইয়াছে এবং অতি শীঘ্র সাহেব লোকেরা নানা পুস্তক দান করিয়া ঐ আলয়ে প্রেরণ করিতে-ছেন" (সমাচার দর্পণ, ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৮৩৫)। দেখা যাচ্ছে, এ বিষয়ে প্রথম উদ্‌যোগী প্রধানতঃ কলকাতার সাহেবরা, অবশ্য এদেশী লোকেরাও পিছিয়ে রইলেন না। চার বছর পরে, ১৮৩৯ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারীর এক সংবাদে জানা যায় যে, "কলিকাতাস্থ কতিপয় বিশিষ্ট ধনী-মহাশয়েরা স্বদেশীয় লোকদের উপকারার্থে সাধারণ এক পুস্তকালয় স্থাপন করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন..."। ঐ বছর ২৯শে জুনের সংবাদে দেখা যায়—"পুস্তকালয়ের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে এবং তদ্বিষয়ে অনেক চাঁদা হইয়া অনেক আপাততঃ দান ও বার্ষিক মাসে মাসে দান করণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই পুস্তকালয়ে এইক্ষণে ১৮০০ সংখ্যক পুস্তক আছে......এতদ্দেশীয়-দিগের পুস্তকালয়ে সংস্থাপন দ্বারা সুধারা করণের যে ইচ্ছা তাহা এইক্ষণে হইয়াছে। ১৮৩৩ সালে এই প্রকার এক পুস্তকালয় সংস্থাপনের উদ্যোগ হইয়াছিল, কিন্তু তৎসময়ে দ্বাদশ জনও সাহায্য করেন নাই"। এই সাধারণ গ্রন্থাগার হ'ল মুদ্রাযন্ত্র ও মুদ্রিত গ্রন্থ-পত্রাদির কীর্তি। কলকাতা শহরের নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞানের পথে বিজয়যাত্রার অন্যতম হাতিয়ার এই "সাধারণ গ্রন্থাগার", পাণ্ডুলিপির শহরের কাছে যা ছিল কল্পনাতীত এবং যা আধুনিক মুদ্রাযন্ত্রের অন্যতম অবদান।

* * *

এইবার ছাপা বইপত্রাদির সবচেয়ে স্মরণীয় কীর্তির কথা বলা

যাক। জ্ঞানের রাজ্য আর পুঁথির পাতায়, দেবালয়ের অন্ধকার কক্ষে, গৃহস্থের চালের বাতায় বা রাজার গোপন ভাণ্ডারে সীমাবদ্ধ নেই! পাণ্ডুলিপি-যুগের সোনার খাঁচায় আবদ্ধ জ্ঞানবিহঙ্গ মুদ্রাযন্ত্রের যুগে মুদ্রিত বইপত্রের ডানায় ভর দিয়ে, মুক্ত আলো-বাতাসের মধ্যে, জয়যাত্রা করেছে। তার গতিরোধ করার শক্তি নেই কারও। পাণ্ডুলিপির শহর থেকে বহুদূরের নির্বাসিত গ্রাম নয় আর কলকাতা। কলকাতা এখন গ্রন্থনগরী। বাইরের জগৎ থেকে সমস্ত চিন্তাধারা নতুন নতুন সংবাদ, ইতিহাস ও ভাবধারা বহন ক'রে নিয়ে আসছে ছাপাখানায় ছাপা বইপত্র, শহরের মধ্যেও নানা বিষয়ে ছাপা বইয়ের সংখ্যা ক্রমে বাড়ছে। দু'চারটে মাত্র সাহেবদের দোকান, তাও কেবল বইয়ের দোকান নয়, মদ, জুতো, জুয়েলারী, আসবাবপত্রের সঙ্গে বইও আছে। দোকানদাররা মধ্যে মধ্যে নানা জিনিসের সঙ্গে বইয়েরও বিজ্ঞাপন দেন, কলকাতার বাসিন্দারা বইয়ের সংবাদ পান। ছাপাখানার আগে এই বিজ্ঞাপন ছিল না, কোন সংবাদ বিজ্ঞাপন দিয়ে কাউকে জানানোও সম্ভব ছিল না। এখন বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, বিজ্ঞাপন দিয়ে কলকাতাবাসীকে জানানো যায় যে, বিদেশ থেকে ভাল ভাল মদ-মদিরা এসেছে, জামাইকার রাম, হল্যাণ্ডের জীন্, কনিয়াক ব্র্যাণ্ডি, ভাল ভাল লিনেন কেম্ব্রিকের পোষাক, রিংপন্ লকেট্, সোনার ঘড়ি, সোনা-বাঁধানো ছড়ি, সোনারুপোর পাতমোড়া টুপি, ইল্যাষ্টিক ব্যাণ্ডসহ গোল কালো লাল সবুজ বেগুনে টুপি, ঘোড়সওয়ার লেডীদের টুপি, ডেস্ক, বাক্স, ট্রাঙ্ক, ম্যাট্রেস, অপ্টিকাল ও ম্যাথামেটিকাল যন্ত্রপাতি, হার্পিসকর্ড পিয়ানো অর্গান গিটার ভাওলিন ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র, আর তার সঙ্গে কিছু ছাপানো সংবাদপত্র ও বই, যেমন ঃ—

Complete set of Churchill's Voyages, adorned with copper plates 8 vols. Folio.

Brisbane's Anatomy of Painting, 1 vol. folio.

Birch's History of the Royal Society, 4 vols., 4 to.

Halhed's Gentoo laws. 1 vol., 8 vol. Gogul's arts and sciences, 3 vols. 8 vo.

Bruenonia eliments madicinoe, 1 vol., 12 mo.
Hume's History of England 8 vols., 8 vo.
Harris's Life of Cromwell. 1 vol.. 8 vo.
Roynal's Revolution of America, 1 vol., 8 vo.
Voltaire's Age of Lewis XIV and XV, 3 vols., 8 vo.
Voltaire's Philosophical History, 1 vo. 3 vo.
Voltaire's Memoirs, 1 vol., 8 vo. ইত্যাদি।

১৭৮৪ সালের ৭ই অক্টোবরের "ক্যালকাটা গেজেট" পত্রিকায় এ্যাণ্ড্রু সাহেবের বিজ্ঞাপন থেকে উদ্ধৃত কয়েকটি বইয়ের নাম, তাও বিজ্ঞাপনটি হ'ল "Part of the elegant collection lately arrived from London."

এইভাবে মদ-মদিরা, লকেট-ঘড়ি, ছড়ি-টুপির সঙ্গে বইয়ের বিজ্ঞাপন যাঁরা পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন তাঁরা জানতেন না যে, কি প্রচণ্ড সামাজিক বিপ্লবের পথ তাঁরা সুগম ক'রে দিয়েছিলেন। যাঁরা ব্যবসা করবেন টাকার জন্য, তাঁদের কাছে বইও যা, ব্র্যাণ্ডিও তাই। তাই নিশ্চিন্ত মনে "Ladies and Gentlemen of the Settlement"-এর কাছে যেমন "bottled in London" শেরী বার্গাণ্ডি ব্র্যাণ্ডির বার্তা জানাতেন, তেমনি লণ্ডন থেকে আমদানি ভল্টেয়ারের গ্রন্থাবলী, রেনলের মার্কিন বিপ্লব, গিবনের "রোম-সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ইতিহাস", হিউমের "ইংলণ্ডের ইতিহাস" ইত্যাদি গ্রন্থের কথাও জানাতেন। মুদ্রাযন্ত্র ও মুদ্রিত গ্রন্থের মাধ্যমে আমেরিকার বিপ্লব ও ফরাসী-বিপ্লবের কাহিনী তখন প্রচারিত হচ্ছে এদেশের লোকের মধ্যে, কলকাতা শহরে "ক্যালকাটা গেজেট" পত্রিকায় ফরাসী-বিপ্লবের বিস্তৃত বিবরণ ছাপা হ'চ্ছে। "ক্যালকাটা গেজেট" সম্বন্ধে সীটনকার সাহেব লিখেছেন—

"The accounts of the progress of the French Revolution, with all its horrible incidents take up half of the paper."

কোথায় প্যারিস, আর কোথায় কলকাতা শহর! শুধু বাষ্পীয় জাহাজ নয়, মুদ্রাযন্ত্র ও মুদ্রিত বইপত্র সমস্ত ব্যবধান দূর ক'রে দিয়েছে। গিবন হিউমের ইতিহাসের সঙ্গে, ভল্টেয়ারের ভাবধারার সঙ্গে কলকাতাবাসীর পরিচয় হ'চ্ছে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে। বিলেত থেকে আমদানী শেরী ব্র্যাণ্ডি জীনই যে আমরা পান করেছি তা নয়, গিবন-হিউম-ভল্টেয়ারের ভাবধারায় অবগাহনও করেছি! বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে কলকাতা শহরে, নতুন যুগের ভাববিপ্লব! তরুণ রামমোহনপন্থীরা, ডিরোজিও-রিচার্ডসনের ছাত্র "ইয়ং বেঙ্গল" দল এই ভাববিপ্লবের আলোড়ন তুলেছেন কলকাতা শহরে, একহাতে মুদ্রিত গ্রন্থ এবং আর-একহাতে মদের গ্লাস নিয়ে। রাজনারায়ণ বসু লিখছেন: "আমি ও আমার সহচরেরা এইরূপ মাংস ও জল-স্পর্শশূন্য ব্র্যাণ্ডি খাওয়া সভ্যতা ও সমাজ-সংস্কারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শক কার্য মনে করিতাম।" মদ্যপানের সঙ্গে ভাববিপ্লবের

প্রত্যক্ষ সম্পর্কের প্রমাণ। অন্যত্র তিনি লিখেছেন ঃ "Cyrus's travels by Chevalier Ramsay পড়িয়া প্রচলিত হিন্দুধর্মে আমার বিশ্বাস বিচলিত হয়। তৎপরে রামমোহন রায়ের Appeal to the Christian Public in favour of the precepts of Jesus এবং চ্যানিঙের (Channing) গ্রন্থ পাঠ করিয়া ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টীয়ান হই, তৎপরে ঈষৎ মুসলমান হই, পরিশেষে কলেজ ছাড়িবার অব্যবহিত পূর্বে Hume পড়িয়া সংশয়বাদী হই।" মুদ্রিত গ্রন্থের প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত—একবার হিন্দু, একবার ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টান, একবার কিঞ্চিৎ মুসলমান, তারপর ঘোর সংশয়বাদী হয়ে আবার হিন্দু—এইভাবে এক-একখানা বইয়ের ধাক্কায় এক-একজন বাংলার তরুণ নাকানিচোবানি খেয়েছেন। জানি না মধ্যযুগের কোন পাণ্ডুলিপির পক্ষে এইভাবে দেশের তরুণদের মেরুদণ্ড ধ'রে নাড়া দেওয়া এবং ওষুধের বোতলের মতন মাথার ঘিলু ধ'রে ঝাঁকানি দেওয়া সম্ভব হয়েছে কি-না! নিশ্চয়ই হয়নি, তাই মদের ঝিমুনিরই জয় হয়েছে মধ্যযুগে। কিন্তু আধুনিক কলকাতা শহরে তা হয়নি। মদ্য মুদ্রিত গ্রন্থ নিয়ে ভাববিপ্লবের সূচনা হলেও, এবং তার অনেকটাই উচ্ছ্বসিত ফেনা ও বুদ্বুদ হলেও, তার তলানি যেটুকু জমেছে তা ঐ গ্রন্থের জন্যই! শুধু বিলেত থেকে যে বই আমদানী হয়েছে তা নয়, কলকাতা শহরেই ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সাহিত্যের বই বাংলা ভাষায় প্রায় দেড় হাজার ছাপা হয়েছে, বিগত শতাব্দীর মাঝামাঝির মধ্যে। লঙের "Descriptive Catalogue" দেখলেই মুদ্রিত বাংলা বইয়ের এই দুঃসাহসিক অভিযানের পরিচয় পাওয়া যায়, বোঝা যায় কেন মদ্য ও মুদ্রিত গ্রন্থের ভাববিপ্লব কেবল ফেনায়িত বুদ্বুদের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়নি, কিছুটা তার নীরেট তলানিও জমেছিল। পরবর্তীকালে, ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের যুগে যখন রেল-লাইন তৈরী হ'ল, কলকারখানা গ'ড়ে উঠতে লাগল এবং তার ভেতর দিয়ে আধুনিক ধনতান্ত্রিক যুগের সত্যিকারের গোড়াপত্তন শুরু হ'ল তখন আমরাও ভাববিপ্লব থেকে সমাজ-বিপ্লবের পথে এগিয়ে যেতে লাগলাম, আমাদের জাগৃতি-আন্দোলনের বনিয়াদও পাকা হ'ল! কলকাতা শহর তখন গ্রন্থ-নগরী থেকে শিল্প-নগরীতে পরিণত হ'চ্ছে। মুদ্রাযন্ত্রের পাশে তখন কলকারখানা ও স্টীম ইঞ্জিনের শব্দও শোনা যাচ্ছে।

কাগজের কলকাতা

"The ledger and the prospectus, the advertisement and the yellow journal, the world of paper, paper profits, paper achievements, paper hopes and paper lusts, the world of sudden fortunes on paper and equally grimy paper tragedies...Behold this paper city..."
—Lewis Mumford.

পাণ্ডুলিপির 'কাল্পনিক' জগৎ থেকে আমরা ছাপাখানার 'বাস্তব' জগতে এলাম। এ যেন গ্রাম থেকে শহরে আসা, অন্ধকার থেকে আলোয়। ছাপাখানা, ছাপা বই ও ছাপা কাগজের চাপে তমসাবৃত পাণ্ডুলিপি-যুগের ভূত-প্রেত-ব্রহ্মদৈত্যেরা মনোরাজ্যে ঘন ঘন আনাগোনা বন্ধ করল। পরম নিশ্চিন্ত পাণ্ডুলিপির রোমাণ্টিক পরলোক থেকে আমরা ছাপা কাগজের রিয়ালিস্টিক ইহলোকে এগিয়ে এলাম। কিন্তু পাণ্ডুলিপির অনুকরণ করেই ছাপাখানার সূত্রপাত হ'ল। পাণ্ডুলিপির হস্তাক্ষরের মতন ক'রে ছাপার হরফ তৈরী করা হ'ল। ঠিক পাণ্ডুলিপির আকারে ও ধরনে বইও ছাপা শুরু হ'ল। যেন ওরাং-ওটাং, শিম্পাঞ্জী ও গোরিলার স্তর থেকে মানুষের স্তরে আমরা উন্নীত হচ্ছি। চলার ঢঙে ও চেহারায় তার চিহ্ন রয়েছে। পাণ্ডুলিপি থেকে প্রথম যুগের ছাপাখানায় পৌঁছানোর সময় পাণ্ডুলিপির অনেক বৈশিষ্ট্য আমরা সঙ্গে ক'রে এনেছি। পুঁথির আকারে খোলা পাতায় "বাংলা বই" ছাপা কে শুরু করেছিলেন জানি না, তবে পুঁথির ধরনে "সংস্কৃত" বই বোধ হয় ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম ছাপাতে আরম্ভ করেন। মুদ্রাক্ষর যে হস্তাক্ষরের মতন হবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কারণ হস্তাক্ষর ছাড়া অক্ষরের আর দ্বিতীয় নমুনা কোথায় পাওয়া যাবে? তবে পাণ্ডুলিপির বিশেষ টানা-টানা হস্তাক্ষর নকল ক'রে প্রথম যুগে বাংলা ছাপার হরফ তৈরী করার চেষ্টা নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য।

ইংরেজরা আসার অনেক আগেই পর্তুগীজরা আমাদের দেশে এসেছিলেন, সকলেই জানেন। গোয়া অঞ্চলে তাঁরা উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং সেখানেই পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে বা ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তাঁরা ইয়োরোপ থেকে দু'টি মুদ্রাযন্ত্র নিয়ে এসে স্থাপন করেন। ১৫৫৪—'৫৭ সালের মধ্যে দু'একখানি খৃষ্ট-ধর্মগ্রন্থ তাঁরা পর্তুগীজ ভাষায় রোমান হরফে সেই ছাপাখানা থেকে ছেপে প্রকাশ করেন। সুতরাং এই বইকেই ভারতবর্ষে ছাপা প্রথম বই বলতে হয়। ভারতবর্ষে ছাপা, কিন্তু বিদেশী ভাষায় ছাপা! ভারতীয় ভাষায় প্রথম বই ছাপা হয় কোচিনে, ১৫৭৭ সালে। একজন স্পেনীয় পাদ্রি সাহেব মালয়ালাম তামিল অক্ষর তৈরী ক'রে সেণ্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ারের "ক্রিশ্চান ডক্ট্রিন" বইয়ের অনুবাদ প্রকাশ করেন—নাম "ক্রীষ্ট্য বন্নকনম্"। ভারতীয় ভাষায় প্রথম ছাপা বই হ'ল এই "ক্রীষ্ট্য বন্নকনম্"। "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি", বা "হরে কেষ্ট হরে কেষ্ট, কেষ্ট কেষ্ট হরে হরে" ক'রে নয়, "ক্রীষ্ট্য ক্রীষ্ট্য" নাম ক'রে আমরা এদেশে প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেছি এবং তাতে প্রথম বই ছেপেছি। বুদ্ধ বিষ্ণু মহেশ্বর আমাদের পাণ্ডুলিপিতেই খুশী ছিলেন। প্রথমে অবশ্য যিশুখৃষ্ট পাণ্ডু-লিপির কাছেই মাথা হেঁট করেছিলেন। ক্রুশবিদ্ধ হবার দু'এক বছরের মধ্যে সেণ্ট টমাস তক্ষশীলায় গণ্ডোফার্নিসের দরবারে এসে-ছিলেন যখন, তখন পাণ্ডুলিপির স্বর্ণযুগ। ছাপাখানা তখন স্বপ্নেরও অতীত। প্রায় দেড়হাজার বছর পরে, আকবর বাদশাহের যুগে আমরা ছাপাখানার মুখ দেখলাম, অবশ্য যিশুখৃষ্টের কৃপায়। ভারত-বর্ষে ছাপাখানা ও ছাপা বইয়ের জন্ম হ'ল 'কেষ্ট' নাম ক'রে নয়, "খৃষ্ট" নাম ক'রে।

বাংলাদেশে ছাপাখানা ও বই ছাপা তার অনেক পরে আরম্ভ হয়। তারিখ নিয়ে বাড়াবাড়ি ক'রে লাভ নেই। এইটুকু মনে রাখলেই হ'ল যে, বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ১৭৭৮ সাল একটা স্মরণীয় বৎসর, কারণ ১৭৭৮ সালে বাংলা ছাপার হরফের জন্ম হয় এবং হুগলি শহরে ছেনিকাটা বাংলা হরফে ছাপা আরম্ভ হয়। অবশ্য প্রথমে ছাপা হয় একখানা ইংরেজী বই—হলহেডের A Grammar of the Bengali language—কিন্তু এই ব্যাকরণে দৃষ্টান্তস্বরূপ কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত ও ভারত-চন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর থেকে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা হয়। চার্লস্

উইলকিন্স এই বাংলা ছাপার হরফ তৈরী করেন এবং তাঁর সহযোগী-রূপে কাজ করেন বাঙালী পঞ্চানন কর্মকার। পঞ্চানন নিজে যে বাংলা ছাপার হরফ তৈরী করেন তা উইলকিন্সের অক্ষরের চেয়ে অনেক বেশী সুন্দর হয়। আজও আমাদের বাংলা ছাপার অক্ষর পঞ্চানন কর্মকারের হাতে তৈরী অক্ষরের গড়ন ছেড়ে নতুন কোন গড়ন বা ছাঁচে তৈরী হয়নি। ছাপাখানায় যাঁরা কাজ করেন বা ছাপাখানা চালান, তাঁরা অনেকেই বোধ হয় এই বাঙালী কর্মকারের কথা জানেন না। যাকে আমরা আজকাল "টাইপ ফাউণ্ড্রি" বলি, পঞ্চাননই প্রথম সেই ফাউণ্ড্রি তৈরী করেন বাংলাদেশে।

হুগলি শহরের এই প্রথম ছাপাখানার বিস্তারিত খবর কিছু জানা যায় না। তবে তার দু'বছর পরে ১৭৮০ সালে হিকি সাহেব তাঁর "বেঙ্গল গেজেট" ছাপবার জন্য কলকাতা শহরে সর্বপ্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৭৮৪ সালে গ্লাডউইন সাহেব "দি ক্যালকাটা গেজেট" প্রেস স্থাপন করেন। তারপর "দি অনারেবল কোম্পানীস্ প্রেস", "দি ক্রনিকেল প্রেস" "ফেরিস এণ্ড কোম্পানীর প্রেস" ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হয়, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যেই। ব্যাকরণ, অভিধান, আইনের বইয়ের অনুবাদ—এই নিয়েই বাংলা ছাপাখানা ও ছাপা বইয়ের সূত্রপাত হয়। ছাপাখানা ও ছাপা বইয়ের উদ্যোক্তারা প্রায় সকলেই বিদেশী—হলহেড, ডানকান, এডমনস্টোন, ফরষ্টার, আপজন ও মিলার। বাংলা ছাপাখানা ও ছাপা বইয়ের জন্য এই কয়েকজন বিদেশী সাহেবদের কাছে এবং আমাদের পঞ্চানন কর্মকারের কাছে আমরা বিশেষ ঋণী। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা ছাপাখানা ও ছাপা বইয়ের এই ইতিহাস। পাণ্ডুলিপির আলো-আঁধারের রোমাণ্টিক যুগ তখনও একেবারে শেষ হয়নি। গ্রাম্যজীবন থেকে কলকাতা তখন সবেমাত্র নাগরিক জীবনে পদার্পণ করেছে। শহরের বেশে গাত্রোত্থান করছে কলকাতা। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেও তাই আমরা কলকাতা শহরে পাণ্ডুলিপির বেশ প্রতিপত্তি দেখতে পাই। পেশাদার অনুলেখকরা তখনও বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ছাপাখানার শব্দ তখনও কলকাতা শহরে খুব বেশী শোনা যায় না। মাটির গ্রাম থেকে ইটপাথরের শহর হয়ে উঠছে কলকাতা, তখনও কাগজের শহর হয়নি।

না হওয়া আশ্চর্য নয়। কারণ যে বিদেশী সাহেবরা আমাদের দেশের ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাঁদের দেশের শহরও অষ্টাদশ

শতাব্দীতে কাগজের শহর হয়ে ওঠেনি, হতে শুরু হয়েছিল বলা চলে। যদিও উইলিয়াম্ ক্যাক্সটন ১৪৭৭ সালে ইংলণ্ডের প্রথম বই ছেপেছিলেন, তাহ'লেও ইংরেজী ছাপাখানা ও ছাপা টাইপ ঠিক হ'তে আরও প্রায় তিনশ' বছর লেগেছিল। তার ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগে, ১৪৪০ থেকে ১৪৫০ সালের মধ্যে জার্মানীতে গুতেনবার্গ ছাপাখানা আবিষ্কারের পরে ছোট ছোট বই ছাপা হ'য়ে লোকের হাতে হাতে ঘুরতে থাকে। তাহ'লেও অষ্টাদশ শতাব্দীতেই আধুনিক ছাপাখানা ও ছাপার হরফের জন্ম বললে ভুল হয় না। বড় বড় ইংরেজ হরফ-নির্মাতা এই সময় জন্মগ্রহণ করেন—ক্যাসলন, বাস্কারভিলে, জন বেল প্রভৃতি। এ'দের প্রত্যেকের নামে টাইপের নাম আজও আছে —ক্যাসলন টাইপ, বাস্কারভিলে টাইপ ইত্যাদি। ১৭৩৪ সালে ক্যাসলন, ১৭৫০ সালে বাস্কারভিলে নতুন টাইপ ডিজাইন তৈরী করেন। জন বেল অনেক পুরনো ইংরেজী ছাপার হরফ সংস্কার করেন। যেমন ইংরেজী পুরনো 'এস্' (*s*) অনেকটা লম্বা 'এফ্' (*f*) -এর মতন ছিল। ইংরেজ আমলের ভারতীয় ইতিহাসের মূল-গ্রন্থ (হলওয়েল, বোল্ট্স ইত্যাদির) যা এই সময় ছাপা হয়েছিল, তাও সব ঐ পুরনো অক্ষরে ছাপা, পড়তে খুব অসুবিধা হয়। বেলসাহেব এইসব টাইপ সংস্কার করেন এবং বই ছাপার ডিজাইনও বদলান। ১৭৮৫ সালে তিনি তাঁর নতুন অক্ষর দিয়ে শেক্সপীয়রের গ্রন্থাবলীর একটি সংস্করণ ছাপেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর এইসব সংস্কার ও আবিষ্কারের পর থেকেই ইংলণ্ডে ছাপাখানার স্বর্ণযুগ আসে এবং বড় বড় শহর ক্রমে কাগজের শহরে পরিণত হতে থাকে ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে।

ইংলণ্ডেরই যখন এই অবস্থা তখন আমাদের দেশে কলকাতা শহরের বাড়ী বাড়ী ঘুরে যে দু'চারজন বৈষ্ণবী অনুলেখিকা পাণ্ডু-লিপি কপি ক'রে জীবিকা অর্জন করবেন—তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগরের যুগ পর্যন্ত আমরা এই পাণ্ডুলিপি অনুলিখনের সংবাদ পাই, তারপর আর বিশেষ পাই না। অবশ্য রামমোহনের যুগ থেকে ছাপা শুরু হয়েছে, রীতিমত না হলেও সবে শুরু হয়েছে। রামমোহন রায় যেটুকু প্রত্যক্ষ সামাজিক আন্দোলন করেছিলেন, তাও করা সম্ভব হ'ত না, যদি না ছাপাখানা থাকত এবং বই ছাপা হ'ত। ১৮১৮ সালের ২৬শে ডিসেম্বর তখন-কার "সমাচার দর্পণ" পত্রিকার এক বিজ্ঞপ্তিতে জানা যায়ঃ

"কলিকাতার শ্রীযুত রামমোহন রায় সহমরণের বিষয়ে এক কেতাব করিয়া সর্বত্র প্রকাশ করিয়াছে। তাহাতে অনেক লিখিয়াছে কিন্তু স্থূল এই লিখিয়াছে যে, সহমরণের বিষয় যথার্থ বিচার করিলে শাস্ত্রে কিছু পাওয়া যায় না।"

১৮১৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর আর একটি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় ঃ

"সম্প্রতি মোং কলিকাতাতে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় পুনর্বার সহমরণ বিষয়ক বাঙ্গলা ভাষায় এক পুস্তক করিয়াছেন এখন তাহার ইংরাজী হইতেছে সেও শীঘ্র সমাপ্ত হইবেক।"

সহমরণ বিষয়ে বইগুলি যদি এইভাবে রামমোহনের পক্ষে ছাপিয়ে প্রকাশ ও প্রচার করা সম্ভব না হ'ত, তাহ'লে তিনি তার বিরুদ্ধে কোন সামাজিক আন্দোলন করতে পারতেন না এবং সহমরণ প্রথা বন্ধ করাও ঐ সময় সম্ভব হ'ত না। বৈষ্ণবী অনুলেখিকাদের দিয়ে পাণ্ডুলিপি কপি করিয়ে কোন সামাজিক আন্দোলন করা যায় না। পাণ্ডুলিপির যুগের সামাজিক আন্দোলন তাই অন্য উপায়ে ধর্মান্দোলনের ভেতর দিয়ে করতে হয়েছে এবং তাও কালেভদ্রে হয়েছে, খুব বেশী করা সম্ভব হয়নি। বিদ্যাসাগরের যুগের সামাজিক আন্দোলন যে অনেক বেশী জোরালো হয়ে ওঠে, তার অন্যতম কারণ এই ছাপাখানার বিস্তার এবং ছাপা বই ও পত্রিকার প্রচলন।

১৮২৪-২৫ সালে কলকাতা শহরে বিভিন্ন ছাপাখানায় ছাপা যেসব বইয়ের তালিকা সমসাময়িক পত্রিকায় দেখা যায়, তার মধ্যে অভিধান, ব্যাকরণ ও ধর্মগ্রন্থই প্রধান, তাও সংখ্যায় কুড়ি বাইশখানা মাত্র। ছাপাখানার মধ্যে এই নামগুলি পাওয়া যায় ঃ

কলুটোলায় চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়
বহুবাজারে শ্রীলেবেন্ডর সাহেবের ছাপাখানা
মির্জাপুরে সম্বাদ তিমিরনাশক ছাপাখানা
শাঁখারিটোলায় মহেন্দ্রলাল ছাপাখানা
মির্জাপুরে মুন্সী হেদাতুল্লার ছাপাখানা
আর্‌পুলির ছাপাখানা

এর পর আরও পঁচিশ তিরিশ বছরের মধ্যে, অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝির মধ্যে আরও অনেক ছাপাখানা স্থাপিত হয় এবং বটতলার ছাপাখানাও জাঁকিয়ে বসে। বটতলার প্রেস ও বটতলার বইয়ের স্বর্ণযুগও হ'ল ১৮৪০ থেকে ১৮৭০ সাল। এই বটতলার

অভিযানের সময় বোধ হয় কলকাতা শহরের পেশাদার বৈষ্ণবী কপিষ্টরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন। গলিতনখদন্ত ছাপা, "শবল কাবল ভুষি ভুষি সে কাবল" (সকল কারণ তুমি, তুমি সে কারণ) গোছের ছাপা হলেও, বটতলার ছাপা পান্ডুলিপির সমর্থক ও পেশাদার কপিষ্টদের কাছে নাইটমেয়ারের মতন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কপি করতে বসলেই বোষ্টমী লেখিকারা হয়ত বটতলার ছাপাখানার দুঃস্বপ্ন দেখতেন। কারণ বটতলার ছাপাখানার টাইপ যাই হোক, ছাপা যাই দাঁড়াক, তার দুঃসাহসের তুলনা হয় না। যে-কোন বই হোক, চৈতন্যচরিতামৃত থেকে আজয়েব ছোলেমানী কাব্য পর্যন্ত, বটতলার প্রকাশকরা তা ছাপাখানায় ছেপে প্রকাশ করবেনই। ছাপাখানার প্রথম যুগে আমাদের দেশের বড় বড় ধনী জমিদাররা অনেকে যে তার বিরোধিতা করেছিলেন, তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। অর্থাৎ সাধারণ লোকের মধ্যে বিদ্যা ও জ্ঞান বিতরণ করতে তাঁদের আপত্তি ছিল, তা ছাড়া গোঁড়ামিও ছিল। ধর্মগ্রন্থ ছাপা হবে, এ তাঁরা ভাবতেও পারতেন না। তাই তাঁরা পাল্লা দিতে আরম্ভ করেছিলেন প্রেসের সঙ্গে। দলবদ্ধ হয়ে তাঁরা পেশাদার অনুলেখকদের দিয়ে ধর্মগ্রন্থ কপি করিয়ে দান করতে আরম্ভ করলেন। হঠাৎ এই সময় বোষ্টম-বোষ্টমী কপিষ্টদের কিছু রোজগার বাড়ল বটে, কিন্তু পাল্লা দেওয়া সম্ভব হ'ল না। বটতলার প্রকাশকদের অভিযানের সামনে জমিদারদের পান্ডুলিপির ষড়যন্ত্র টিঁকল না। বটতলার জয় হ'ল, তথা ছাপাখানার ও লোকসাধারণের।

বটতলার যুগের আগে কলকাতা শহরে বইয়ের দোকানও যে বিশেষ ছিল তা মনে হয় না। তার আগের প্রায় সমস্ত ছাপা বইয়ের বিজ্ঞপ্তিতে দেখা যায়, প্রকাশক বা গ্রন্থকার ক্রেতাদের কোন বাড়ী থেকে বই কিনে আনতে অনুরোধ করছেন। যেমন ঃ "...ছয় তঙ্কা মূল্যে যাহার লইবার বাঞ্ছা হয় তবে মোং উত্তরপাড়ার শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ মহাশয়ের বাটীতে অথবা মোং কলিকাতার শ্রীযুত দেওয়ান রামমোহন রায় মহাশয়ের সৈসোয়িটী অর্থাৎ আত্মীয় সভাতে চেষ্টা করিলে পাইবেন..." (১৮১৮)। "যে মহাশয়ের লইবার বাসনা হইবে তিনি মোং কলিকাতায় শ্রীগঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের আপীসে কিম্বা মোং শ্রীরামপুরের কাছারি বাটীর নিকটে শ্রীজান দেরোজারু সাহেবের বাটীতে তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন" (১৮১৮)। "যে মহাশয়দিগের ঐ পুস্তক লইতে মানস হইবেক তাঁহারা মোং কলিকাতার জোড়াসাঁকোর পূর্ব জোড়া পুখুরিয়ার নিকট শ্রীযুত জয়কৃষ্ণ বন্দ্যো-

পাধ্যায়ের বাটীতে উপস্থিত হইয়া লইবেন। প্রতি পুস্তকের মূল্য জেলেদ সমেত লইলে ৪৷৷৹ সাড়ে চারি টাকা দিতে হইবেক জেলেদ সমেত না লয়েন চারি টাকা দিলে পুস্তক পাইবেন।"

পরিষ্কার বোঝা যায়, লইয়ের দোকান চালু হয়নি কলকাতায় তখনও। প্রধান কারণ, পাঠকসংখ্যা এবং ছাপা বইয়ের সংখ্যাও এমন হয়নি বা বাড়েনি যে তাই নিয়ে ব্যবসায়ের জন্য দোকান খোলা যেতে পারে। যে সব "মহাশয়ের পুস্তক লইতে মানস" হ'ত, তাঁরা শ্রীরামপুর উত্তরপাড়া পর্যন্ত দেরোজারু সাহেবের বাড়ীতেও গিয়ে নিয়ে আসতেন। তাঁদের সংখ্যা খুব কম, হাতে গোণা যায়। মনে হয়, বটতলার যুগ থেকেই কলকাতা শহরে বইয়ের দোকান প্রথম চালু হ'তে থাকে—তাও চিৎপুর অঞ্চলে, কলেজ স্কোয়ারে নয়।

বটতলার স্বর্ণযুগ থেকে কলেজ ষ্ট্রীটের স্বর্ণযুগ পর্যন্ত প্রায় একশ' বছরের ইতিহাস। এই একশ' বছরের মধ্যে কলকাতার শহর ধীরে ধীরে কাগজের শহরে পরিণত হয়েছে। আধুনিক মার্কিণ শহরের দিকে চেয়ে বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী লুইস্ মামফোর্ড যে-কথা বলেছেন, আধুনিক কলকাতা শহরকেও নিঃসন্দেহে তাই বলা যায়। ইট-পাথরের কংক্রীটের কলকাতা শহরকে আজ কাগজের শহরই বলা উচিত। কারণ, ইট-পাথর কংক্রীটের দেয়ালও আজ ছাপা পোষ্টার প্লাকার্ড হ্যাণ্ডবিল বিজ্ঞাপন ইশ্‌তেহারে আচ্ছাদিত। ছাপাখানার এও এক আশ্চর্য কীর্তি! ছাপাখানার দৌলতে আমরা মানুষের চিন্তাধারাকে যেমন মুক্ত করেছি, তেমনি এক বিচিত্র "কাগজের কালচারও" সৃষ্টি করেছি। আমাদের এই আধুনিক কলকাতা কালচারকে বলা যায় কাগজের কালচার। ঘুম ভেঙে ছাপা খবরের কাগজ থেকে দিনের শুরু হয়, সারাদিন ছাপানো বই, কাগজ, ফাইল, চিঠি, স্মারকলিপি, ইশ্‌তেহার বিবৃতির মধ্যে কেটে যায়, রাত্রেও ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাগজের স্বপ্ন দেখি—কাগজের তাড়া তাড়া নোট, চমৎকার ছাপা কাগজের সব ক্যাশসার্টিফিকেট, বণ্ড, শেয়ার-সার্টিফিকেট ইত্যাদি। কাগজের স্বপ্ন দেখতে দেখতে ভোর হয়, খবরের কাগজ বুকে ক'রে উঠে বসি। যা কিছু চিন্তা করি কাগজে, যা কিছু বলি কাগজে। স্বপ্ন, ভালবাসা, প্রেম, প্রতিশ্রুতি, আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা, বাসনা সবই আজ ছাপা কাগজে রূপান্তরিত। মৃত্যুর পরেও কাগজের ছাপা অক্ষরে অমরত্ব লাভ করি, কাগজের অমরত্ব। মনে হয় এত কাগজ, এত বই, এত সংবাদপত্র, পত্রিকা, এত রেকর্ড, রিপোর্ট,

চিঠিপত্র, বিবৃতি, ম্যানিফেষ্টো, এত ফাইলের স্তূপ, কাগজের পাহাড় এর স্থান হবে কোথায় শহরে? সমস্ত ছাপা কাগজ, হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ টন ছাপা কাগজ যদি আবর্জনাস্তূপে পরিণত হয়ে আবার নতুন কাগজ তৈরীর কাঁচামাল না হ'ত, তাহ'লে এতদিনে আমরা কাগজের স্তূপের তলায় সমাধিস্থ হয়ে যেতাম। এই হ'ল ''কাগজ দর্শন'' বা "পেপার ফিলজফি"—অর্থাৎ কর্মজীবনের ভূমিকা শেষ ক'রে ভস্ম হয়ে উৎসমূলে ফিরে যাওয়া এবং নতুন কাগজ তৈরী হয়ে এসে আবার ছাপার বিচিত্র বেশ ধারণ করা। তারপর আবার আবর্জনা, আবার কাঁচামাল, আবার সাদা কাগজ। ছাপা কাগজ যদি সাদা কাগজ না হয়ে যেত, তাহ'লে এতদিনে এই কাগজের সভ্যতায়, কাগজের কলকাতা শহরে, আমরা তার তলায় চাপা পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতাম। কাগজের কলকাতার ''কাগজ কালচারের'' বিশেষত্ব এইখানে, কাগজী বিশেষত্ব।

বাংলা বইয়ের সন্ধানে

যদি কারও কোন কাজ না থাকে খাওয়া-দাওয়ার পরে, অথবা সারাক্ষণ কাজের মধ্যে সামান্য একটু অবসর থাকে, তাহ'লে তিনি স্বচ্ছন্দে সেই সময়টুকু বইয়ের সন্ধানে ঘুরে কাটিয়ে দিতে পারেন। অবশ্য বইয়ের বদলে দেশবিদেশের ডাকটিকিটের সন্ধানেও তিনি ঘুরতে পারেন, টুকিটাকি দুর্লভ কিউরিও খুঁজে বেড়াতে পারেন। কাঠকুড়ুনির কাঠের মতন জীবনের কুড়িয়ে-পাওয়া কোন ধনই ফেলা যায় না, কোন কাজে বা কারও কাজে একদিন-না-একদিন তা লাগেই লাগে। বই তো নিশ্চয়ই লাগে, তা সে শ্রীরামপুরে ছাপা হোক, আর বটতলায় বা মেছোবাজারে ছাপা হোক। অতএব বইয়ের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ুন আজই, কাজ থাক আর নাই থাক। বাংলা বইয়ের সন্ধানে।

বাংলা ছাপাখানার ইতিহাস, বাংলা বই প্রকাশের ইতিহাস, বাংলা ছাপা অক্ষরের ইতিহাস, ছাপা ছবির ইতিহাস, বাংলা বই বাঁধাইয়ের ইতিহাস আজও লেখা হয়নি। যদি লিখতে হয় কোনদিন (লিখতেই হবে) তাহ'লে বাংলা বইয়ের সন্ধানে বেরুতেই হবে। আজ পর্যন্ত যত বাংলা বই ছাপা হয়েছে খুঁজে খুঁজে সেগুলি সংগ্রহ করতে হবে। সংগ্রহের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন থাকলে অবশ্য সব বই সংগ্রহ করার কোন দরকার হবে না। একজনের পক্ষে সব বই সংগ্রহ করাও সম্ভব নয়। সকলে মিলে কিছু কিছু বই সংগ্রহ করা সম্ভব নিশ্চয়ই। কিন্তু সকলে মিলে সে কাজ করবেনই বা কেন? সাধারণতঃ সকলে মিলে কোন কাজ করা আমাদের স্বভাববিরুদ্ধ। যে যার স্বার্থ ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কাজ করতে চাই। সুতরাং যাঁরা শুধু বই সংগ্রহ করেন বা "বুক কলেক্টর", তাঁদের কথাই আমি বলছি। কলকাতা শহরে "বুক কলেক্টর" বলতে ঠিক যা বোঝায় তাঁদের সংখ্যা আঙুলে গোণা যায়, তাও সব আঙুলে নয়, খুব বেশী হ'লে দু'একটি আঙুলে। তাও দেখেছি যাঁরা বই সংগ্রহ করেন,

তাঁদের সংগ্রহের মধ্যে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নেই, অনেকটা নেশাখোরের মতন তাঁরা পথেঘাটে বই কুড়িয়ে বেড়ান। এই ধরনের সংগ্রহ মূল্যবান হলেও, সহজে তাকে কোন কাজে লাগানো যায় না। সুতরাং বই সংগ্রহ করলেই চলবে না শুধু, একটা নির্দিষ্ট পথ বেছে নিয়ে সংগ্রহ করতে হবে। তাতে সংগ্রহের নেশা আরও চতুর্গুণ বেড়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত দীর্ঘদিনের সংগৃহীত বইয়ের মূল্যও বাড়ে যথেষ্ট। তাতে কাজও হয় অনেক। বই যাঁরা সংগ্রহ করেন, যাঁরা "বুক কলেক্টর" এবং ভবিষ্যতে যাঁরা বই "কলেক্‌শন" জীবনের অবসর-সময়ের অন্যতম নেশা বা বাতিক হিসেবে গ্রহণ করতে চান, তাঁদের উদ্দেশে দু'একটি কথা বলতে চাই। উদ্দেশ্য হ'ল, আরও বেশী লোক দলে ভেড়ানো এবং দলে যাঁরা ভিড়েছেন তাঁদের বই সংগ্রহের আসল মজা কোথায়, সেই খবর দেওয়া। যদি আমার কথা শুনে কলকাতা শহরে তথা বাংলাদেশে (পূবে ও পশ্চিমে) আরও একজন মাত্র বই কলেক্টরের সংখ্যা বাড়ে, তাহ'লেও আমি মনে করব আমার এই প্রপাগ্যাণ্ডা যথেষ্ট সার্থক হয়েছে। কিন্তু সবার আগে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হ'ল, এত কিছু সংগ্রহ করার থাকতে, বই সংগ্রহ করবেন কেন? এ প্রশ্নের কোন উত্তর নেই, অন্ততঃ আমার জানা নেই। কাঠকুড়ুনিকে যদি ঘুঁটে কুড়াবার কথা বলা যায়, তাহ'লে সে মোটেই অবাক না হয়ে রাজী হতে পারে। কিন্তু কাঠকুড়ুনিকে যদি দেশবিদেশের ডাকটিকিট কুড়ুতে বলা যায়, তাহ'লে সে ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ ক'রে মুখের দিকে চেয়ে থাকবে, কিছুই বুঝতে পারবে না। কোন কাঠকুড়ুনিকে আমি স্ট্যাম্প-কলেক্টর বা বুক-কলেক্টর হতে বলছি না। তবে স্ট্যাম্প-কলেক্টর বা কিউরিও-হাণ্টাররা যদি কেউ বুক-কলেক্‌টর হন, স্বচ্ছন্দে হতে পারেন। জীবনে পেশা বদলানো যায়, কিন্তু নেশা বদলানো যায় না, ছাড়া তো যায়ই না। অবশ্য বৈরাগীদের কথা স্বতন্ত্র, তাঁদের কথা আমি বলছিও না। তবু নেশার ঘোরটা যদি ঠিক থাকে, তাহ'লে নেশার বস্তুটা বদলানো খুব কঠিন ব্যাপার নয়। এরকম বদলাতে অনেককে দেখা যায়। হুঁকো ছেড়ে বিড়ি ধরেছেন, বিড়ি ছেড়ে চুরুট, চুরুট ছেড়ে পাইপ, পাইপ ছেড়ে গ্লাস, গ্লাস ছেড়ে কল্‌কে এবং শেষে সব ছেড়ে কোন "গুরুদেব" ধরেছেন, এরকম লোকের অভাব নেই সমাজে। হুঁকো পাইপ গ্লাস কল্‌কে থেকে লাফ দিয়ে যদি গুরুদেব পর্যন্ত আসা যায়, তাহ'লে ডাকটিকিট ও কিউরিও ছেড়ে বই পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে আসা যেতে পারে।

"কলেক্‌শন"টা একটা নেশা বা বাতিক ছাড়া কিছু নয়, ডাকটিকিট হোক, টেক্সটাইল টেরাকোটা হোক, আর বই-ই হোক। বস্তুটা গৌণ, মুখ্য হ'ল নেশার ঘোর, বাতিকের বুঁদাবস্থা। সেটা যদি ঠিক থাকে তাহ'লে ডাকটিকিটের বদলে বই, বা টেরাকোটার সঙ্গে বই সংগ্রহ করা কষ্টকর নয়। যেমন, নিজের কথাই বলি। ছেলেবেলায় সিগারেটের খোল্‌ সংগ্রহ করেছি। প্রথমে যখন বাস চলল কলকাতার রাস্তায় তখন স্কুল পালিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে যাত্রীদের কাছ থেকে বাসের টিকিট সংগ্রহ করেছি। তখন বাসের কতরকম নাম, সব টিকিটের উপর ছাপানো—"সুখতারা", "নয়নতারা", "পংখীরাজ" ইত্যাদি। তারপর দেশলাইয়ের খোল, বোতলের ছাপমারা টিনের ছিপি, দেশবিদেশের ডাকটিকিট ইত্যাদি একে-একে ছেড়ে, এখন বই সংগ্রহ করি। অর্থাৎ বই কিনি, আবার বই "কলেক্টও" করি।

বই কেনা এবং কলেক্ট করা এক জিনিস নয়। বই কলেক্‌শন সম্বন্ধে সর্বপ্রথম এই কথাটা মনে রাখা দরকার। বই যাঁরা কেনেন তাঁদের মধ্যে শতকরা একজন তো নয়ই, হাজারকরা একজনও বই 'কলেক্ট' করেন কিনা সন্দেহ। বই অনেকে অনেক কারণে কেনেন, অধ্যাপনা ওকালতি ডাক্তারী ব্যবসা ইত্যাদির জন্য, নিছক জ্ঞানার্জন বা গবেষণার জন্য, আবার শৌখিন আসবাবের মতন ঘরসাজানোর জন্যও। তাঁরা কেউ "কলেক্টর" নন। বই যাঁরা 'কলেক্ট' করেন তাঁরা এসব কোন উদ্দেশ্য নিয়েই করেন না। ছাপা বইটাই তাঁদের কাছে ইতিহাসের একটা লুপ্ত উপকরণ মাত্র—ছাপার ইতিহাসের, বইয়ের ইতিহাসের এবং আনুষঙ্গিক আরও অনেক বিষয়ের। এইদিক দিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিকের সঙ্গে তাঁদের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। মাটি খুঁড়ে, পাথর ভেঙে প্রত্নতাত্ত্বিকরা যেমন মাটির হাড়িকুড়ি, পুতুল খেল্‌না, শিলালিপি, মুদ্রা ইত্যাদি আবিষ্কার ক'রে তাই দিয়ে অরচিত ইতিহাস রচনা করেন, তেমনি বই কলেক্টররাও পথঘাট, আনাচ-কানাচ তল্লাস ক'রে লুপ্ত বই পুনরুদ্ধার করেন এবং তাই দিয়ে বইয়ের ইতিহাস, ছাপাখানার ইতিহাস রচনা করেন। কি ক'রে করেন? সেইটাই হ'ল বই কলেক্‌শন সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা এবং যাঁরা এই ধরনের কোন লক্ষ্য নিয়ে বই কলেক্ট করেন তাঁরাই হলেন প্রকৃত "বুক-কলেক্টর।"

কলকাতা শহরে আমি একজন "First Edition" বা "প্রথম সংস্করণ" বাতিকগ্রস্ত কলেক্টরকে জানি। শহরের নানা জায়গায় তিনি

পাগলের মতন ঘুরে বেড়ান, বাংলা বইয়ের সন্ধানে, কিন্তু "প্রথম সংস্করণ" ছাড়া অন্য বই তিনি সংগ্রহ করেন না। আমি তাঁর নাম দিয়েছি "ফার্স্ট এডিশন্‌" এবং ঐ নামেই তাঁকে ডাকি। অদ্ভুত নেশা ভদ্রলোকের, প্রথম সংস্করণের নেশা। নিছক নেশা হিসেবে খুব ভাল, কিন্তু কলেকশন হিসেবে ভাল নয় তেমন। নেশা বা বাতিকের দিক থেকে আরও ভাল হয় যদি কোন খ্যাতনামা সাহিত্যিকের সমস্ত বইয়ের 'প্রথম সংস্করণ' সংগ্রহ করা যায়—যেমন মনে করুন, বঙ্কিমচন্দ্রের, দীনবন্ধুর, মাইকেল মধুসূদনের বা বিদ্যাসাগর ও রামমোহনের। আরও এগিয়ে গেলে রবীন্দ্রনাথেরও সমস্ত বইয়ের 'প্রথম সংস্করণ' সংগ্রহ করা যেতে পারে, অথবা শরৎচন্দ্রের। নিছক কলেকশনের নেশা হিসেবে এর চেয়ে আকর্ষণীয় আর কিছু আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দীর্ঘদিনের এই 'কলেকশন' বিশেষ কোন কাজে লাগে না। সেইজন্য সংগ্রহটা যদি কোন একটা বিষয়ের ধারাবাহিক ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য রেখে করা যায় তাহ'লে সবচেয়ে ভাল হয়। তাতে আগ্রহ ও আকর্ষণও বাড়ে এবং সংগ্রহের মূল্যও বাড়ে যথেষ্ট।

কয়েকটা 'টিপস' দিচ্ছি কলেক্টরদের। 'গ্রন্থনগরী কলকাতা' যাঁরা পড়েছেন তাঁরা বাংলা দেশে ছাপাখানা ও ছাপা বইয়ের গোড়ার ইতিহাস মোটামুটি জেনেছেন। কলেকশনের আলোচনা ঐ ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। ১৭৭৮ সালে হুগলি শহরে প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানায় হলহেডের যে ব্যাকরণ ছাপা হয় তাতে বাংলা অক্ষরে মহাভারত, রামায়ণ, বিদ্যাসুন্দর ইত্যাদি থেকে অনেক দৃষ্টান্ত ছাপা হয়। সুতরাং ১৭৭৮ সালে ছাপা হলহেড সাহেবের এই বই থেকে আরম্ভ ক'রে একেবারে ১৯০০ সাল পর্যন্ত ছাপা বাংলা বই বা ইংরেজী-বাংলা বই (যার মধ্যে বাংলা অক্ষরে ছাপা আছে), যদি প্রত্যেক বছরের একখানা ক'রে নমুনা হিসেবে সংগ্রহ করা যায়, তাহ'লে সেটা অত্যন্ত মূল্যবান সংগ্রহ হতে পারে। একখানা ক'রে বই সংগ্রহ করলেই চলে, বিষয়বস্তু বা সংস্করণের দিকে নজর দেবার কোন প্রয়োজন নেই, কেবল যে বছরে ছাপা হয়েছে সেই বছরের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অর্থাৎ হলহেডের বই পেলে ১৭৭৮ সালের আর কোন বই ছাপা থাকলেও দরকার নেই সংগ্রহ করার। তেমনি ১৮১৬ সালে গঙ্গাকিশোরের ছাপা বাংলা 'অন্নদামঙ্গল' গ্রন্থ পেলে, ঐ সালের ছাপা আর কোন বই সংগ্রহ করতে হবে না। এইভাবে ১৭৭৮ থেকে ১৯০০

সাল পর্যন্ত ১২৩ বছরের জন্য মাত্র ১২৩ খানা বাংলা হরফে ছাপা বই সংগ্রহ করতে পারলে অনেক কাজ করা যায়। হাজার হাজার বই কেনার বা সংগ্রহ করার কোন দরকার হয় না। যদি আদর্শ 'বুক কলেক্টর' হতে চান, বিশেষ ক'রে বাংলা বইয়ের, তাহ'লে এই ১২৩ খানা বই, বা দুখানা ক'রে প্রতি বছরের যদি করেন তাহ'লে ২৪৬ খানা বই সংগ্রহ করুন। মোটামুটি আড়াইশ' খানা বই সারাজীবনে সংগ্রহ করুন। বই-সংগ্রহের যদি বাতিক থাকে, তাহ'লে বাতিকটাকে এই ধরনের একটা নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করুন। তাতে বাতিকের গুরুত্ব বাড়বে এবং বাতিক মিটলে আমাদের সকলের অনেক উপকার হবে, অনেক কাজ হবে। কি কাজ হবে?

প্রথমতঃ যদি কেউ এইভাবে এই বইগুলি সংগ্রহ করতে পারেন, তাহ'লে তিনি অন্ততঃ তিনচারটি বিষয়ের ইতিহাস রচনা করতে পারবেন তাই থেকে। বাংলা ছাপাখানার ইতিহাস, বাংলা ছাপার হরফের ক্রমবিকাশের ইতিহাস, বাংলা বইবাঁধাইয়ের ইতিহাস এবং সচিত্র বাংলা বইয়ে ছবি ছাপার ও ছবি আঁকার পদ্ধতির ইতিহাস। এর মধ্যে কোন বিষয়েরই ইতিহাস আজও লেখা হয়নি, অথচ প্রায় পৌনে দু'শ বছর হ'ল বাংলা দেশে বই ছাপা হ'চ্ছে, উইলকিন্স ও পঞ্চানন কর্মকারের পর থেকে বাংলা ছাপার হরফের বিকাশ ও প্রকরণভেদ হ'চ্ছে, গ্রন্থ-চিত্রণের টেকনিক বদলাচ্ছে, ছবি ছাপার পদ্ধতি বদলাচ্ছে, বই বাঁধাইও বদলাচ্ছে। এই ইতিহাস লেখার আজ বিশেষ দরকার। লিখতে হ'লে ঐ বইগুলি চাই। বইয়ের মধ্যে ছাপাখানার নাম থাকে, ঠিকানাও প্রায় থাকে। তাই থেকে ছাপাখানার ইতিহাস এবং তার আঞ্চলিক অবস্থানের ইতিহাস রচনা করা যায়। ছাপার হরফ তুলনা ক'রে তার ক্রমোন্নতির ধারা জানা যায়। বাঁধানোর নমুনা দেখে, তারও একটা চমৎকার ধারাবাহিক ইতিহাস লেখা যেতে পারে। গঙ্গাকিশোরের সচিত্র 'অন্নদামঙ্গল' থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত ছাপা সচিত্র বাংলা বইয়ের সংগ্রহ পেলে বাংলায় চিত্র-প্রতিলিপি মুদ্রণের অত্যন্ত মূল্যবান ইতিহাস রচনা করা যায়। স্টীল বা কপারপ্লেট এনগ্রেভিং ইয়োরোপে যেমন সেকালে খুব চালু ছিল, তেমনি আমাদের দেশেও কাঠখোদাই ও ধাতুখোদাই শিল্পীর অভাব ছিল না। প্রথম ছাপা সচিত্র বাংলা বইয়ের ধাতুখোদাই ও কাঠখোদাই চিত্রগুলি এঁকেছিলেন রামচাঁদ রায়। কেউ তাঁর নাম জানেন না। এরকম আরও অনেক

শিল্পী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিশ্বম্ভর আচার্য, রামধন স্বর্ণকার, মাধবচন্দ্র দাস, রূপচাঁদ আচার্য, রামসাগর চক্রবর্তী, বীরচন্দ্র দত্ত, কাশীনাথ মিস্ত্রী, জোড়াসাঁকো নিবাসী বিখ্যাত খোদাইশিল্পী হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। বাংলা ছাপা বইয়ের ইতিহাসে যেমন হরফনির্মাতার দান আছে, তেমনি এইসব খোদাই-শিল্পীদের যথেষ্ট মূল্যবান দান আছে। অথচ তার কোন ইতিহাস নেই। একমাত্র 'বুক কলেক্টররাই' এই ইতিহাস রচনার উপকরণ যোগাতে পারেন।

ইয়োরোপ আমেরিকায় এই রকম বড় বড় বুক-কলেক্টর আছেন, তাঁদের মুখপত্র আছে এবং পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগও আছে। তাঁরাই অনেকে এই ছাপাখানার ইতিহাস, ছাপা বই, বাইন্ডিং ইত্যাদির ইতিহাস রচনা করেছেন। আমাদের দেশে সেরকম কলেক্টর কোথায়? অথচ অবসর সময়ের নেশা হিসেবে কি চমৎকার নেশাই না 'বুক কলেকশন' হ'তে পারে! এমন অনেককে দেখেছি যাঁরা ছুটির দিনে বা অবসর সময়ে কোন একটা ধান্ধা নেই ব'লে আফশোস করেন। এখানে সেখানে অকারণে তাঁরা ঘুরে বেড়ান, সময় কাটানোর জন্য। তা না ক'রে বইয়ের ধান্ধায় ঘুরে বেড়ান। কোথায় বেড়াবেন বইয়ের সন্ধানে? কলকাতার রাস্তায় রাস্তায়—বৌবাজারে, কলেজ ষ্ট্রীটে, ওয়েলেসলি পাক-সার্কাসে, বটতলায় চিৎপুরে। তাতেও হবে না। কলকাতার কাছাকাছি জায়গায় সেকালের লোকদের খোঁজ নিয়ে যোগা-যোগ করুন—হুগলি, শ্রীরামপুর, চুঁচুড়া, চন্দননগর, জয়নগর, সোনার-পুর, চাংড়িপোতা, বোড়াল ইত্যাদি জায়গায়। কাজে হাত দিলেই দেখবেন আরও অনেক পথের সন্ধান মিলে যাবে। নিলেম ঘরের নিলাম, পুরানো জিনিস 'বিক্রিওয়ালাদের' আড্ডা তো আছেই, অনেক অজানা লোকের ছোট ছোট বইয়ের সংগ্রহও আছে। একটা নেশার ঝোঁকে তাঁরা হয়ত কিছু বইপত্র সংগ্রহ করেছেন, কিন্তু তাঁর বংশধর-দের নেশা ভিন্নজাতের। সুতরাং তাঁদের মৃত্যুতে সেই বংশধররা বইগুলি প্রথমে ঘরছাড়া ক'রে দেন। কলকাতা শহরে একদল লোক আছেন যাঁরা এইসব বংশ ও বংশধরদের খোঁজ রাখেন। কলেক্ট করতে করতে তাঁদের সঙ্গেও আপনার সুযোগ মতন পরিচয় হবে এবং এই রকম নানাসূত্রে আপনি বই কলেক্ট করতে পারবেন। দুষ্প্রাপ্য বইয়ের ব্যবসা যাঁরা করেন তাঁদের সঙ্গেও আপনার বিরোধ হবার কোন সম্ভাবনা নেই। কারণ আপনি যে বইয়ের সন্ধানে বেরিয়েছেন তার

এমনিতে একখানা বই হিসেবে (যত দুষ্প্রাপ্যই হোক) কোন মূল্য নেই, একটা ধারাবাহিক কলেক্‌শনের মধ্যেই তার মূল্য। কিন্তু একবার যদি সংগ্রহের কাজে নেমে পড়েন, দেখবেন পণ্ডিত ও ব্যবসায়ীর চেয়ে বই কলেক্টরের কাজ কত বেশী আনন্দের। জ্ঞানের নেশা আছে, মুনাফার নেশাও মারাত্মক নেশা। কিন্তু শুধু কুড়িয়ে বেড়ানোর নেশা মানুষের সনাতন নেশা, তার কাছে কোন নেশাই লাগে না। সুতরাং আজই বইয়ের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ুন, বাংলা বইয়ের সন্ধানে।

বটতলার সাহিত্য

(এক)

মধুরস কথা ভাই জানিবে তাহাতে
বান্ধা বটতলায় তারে দিয়াছি ছাপিতে।

—আজেহর আলি

বৌবাজারের এক অশ্বত্থগাছের তলা ছিল চার্নক সাহেব ও অন্যান্য বণিকদের বিশ্রাম নেবার বৈঠকখানা। বাজারের কাছে, শিয়ালদহ-বৌবাজারের মোড়ের মাথায় এই অশ্বত্থের ছায়ায় ব'সে জব চার্নক কয়েকটি গ্রামকে কলকাতা শহরে পরিণত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেই অশ্বত্থগাছটা আজ নেই, কিন্তু বৈঠকখানা নামটা রয়েছে এবং তার সঙ্গে অক্ষুণ্ণ রয়েছে এই অঞ্চলের সেই ঐতিহাসিক বাণিজ্য-ধারা। বৌবাজারের এই অশ্বত্থগাছের মতন সেকালের কলকাতায় আর একটি বিখ্যাত বটগাছ ছিল শোভাবাজারে। বাংলাদেশের অনেক দীর্ঘায়ু বটগাছের মতন, শোভাবাজারের বটগাছেরও একটা বাঁধানো চাতাল ছিল। সেই বাঁধানো বটতলায় কবিগানের আসর জমত প্রায়, নিধুবাবুর টপ্পাসুরে বটতলার পরিপার্শ্ব সরগরম হয়ে উঠত। শুধু তাই নয়, ছাপার অক্ষরে নবযুগের বাঙালীর সাহিত্য-সাধনার উদ্বোধনও হয় এই বটতলার আশেপাশের ছাপাখানায়। বাঙালী হিন্দু-মুসলমান প্রকাশক যাঁরা এই উদ্‌যোগপর্বের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন তাঁদের বংশধররা আজও হয়ত কেউ কেউ জীবিত আছেন এবং পুরুষানুক্রমে সেই প্রকাশকের ব্যবসায়ই করছেন। কিন্তু কলকাতার সম্ভ্রান্ত পাঠকরা আজ তাঁদের কোন খোঁজই রাখেন না। তাঁদের বিজ্ঞাপনও কোন সম্ভ্রান্ত পত্রিকায় ছাপা হয় না এবং প্রকাশিত বইয়ের সমালোচনাও কোথাও করা হয় না। পঞ্জিকার পৃষ্ঠায় ওলকপির বীজ ও রমণীমনোহর ম্যাজিক আংটীর বিজ্ঞাপনের পাশে আজ তাঁদের পরিচয় সীমাবদ্ধ এবং পঞ্জিকার বহুদূরবিস্তৃত গ্রাম্য পাঠকরাই তাঁদের পৃষ্ঠপোষক। আজ তাঁরা কলকাতা শহরের ভদ্রলোকদের কালচার-চক্রের বাইরে চিৎপুরের আনাচে-কানাচে নির্বাসিত।

কলেজ স্ট্রীট ও আজকের বটতলার মধ্যে আসলে মাসতুতো ভাইয়ের সম্পর্ক থাকলেও তাদের মধ্যে মুখদেখাদেখি নেই। বিশ্ব-বিদ্যালয়াশ্রিত কলেজ স্ট্রীট অঞ্চলের কালচার-অভিযান আজ সমুদ্যত। তার কাছে বটতলা আজ অবজ্ঞার পাত্র। যে-কোন কুৎসিত সাহিত্য ও কদর্য ছাপা গ্রন্থকে আজ কলেজ স্ট্রীটের কালচার-বাগীশরা "বটতলার সাহিত্য" ব'লে বিদ্রূপ ক'রে থাকেন। কিন্তু কলেজ স্কোয়ার অঞ্চলের হরেকরকমের যৌন-সাহিত্য ও পত্রিকাদির দিকে চেয়ে বটতলা মুচ্‌কি হাসে শুধু, বোবার মতন চুপ ক'রে থাকে, কোন উত্তর দেয় না। কলেজ স্ট্রীট থেকে বটতলা বেশী দূর নয়. কিন্তু মানসিক দূরত্বটা আজ অনেক বেশী। কলকাতার মধ্যবিত্ত কালচারের স্তরে স্তরে অনেক পলেস্তারা জমেছে, তারই তলার স্তরে বটতলা, উপরের স্তরে বর্তমানে কলেজ স্ট্রীট। কলেজ স্ট্রীট যে বটতলারই বংশধর, আজও তাই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বটতলা তাই শুধু বিদ্রূপের পাত্র নয়, তার একটা ইতিহাস আছে এবং একটা বিশেষ কালের সাহিত্যের ইতিহাসে তার একটা ভূমিকাও আছে। বিদ্রূপ করবার আগে কলেজ স্ট্রীটের "কালচার্ডদের" সেটা জানা উচিত।

প্রথমে ছাপাখানার কথা বলি, কারণ বাংলাদেশের ইতিহাসে বটতলার ছাপাখানা একটা রোমাণ্টিক অধ্যায় জুড়ে আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই বটতলার এই অভিযান শুরু হয়েছে বলা চলে। ১৮১৮-১৮২০ সালের মধ্যে বটতলার প্রথম ছাপাখানা করেন বিশ্বনাথ দেব। তার আগে কলকাতায় অবশ্য আরও চার-পাঁচটি ছাপাখানা হয়েছিল এবং লঙ্‌ সাহেব বলেন যে, তার মধ্যে দেশী লোকের অন্তত চারটি প্রেস ছিল। এই চারটি প্রেসই হয়ত "হিন্দু-স্থানী প্রেস", "বাঙগালী প্রেস", "সংস্কৃত প্রেস" ও "বিশ্বনাথের প্রেস"। সে যাই হোক, প্রেসের অবস্থা কিন্তু তখন ছিল খুব শোচনীয়। কারণ বাঙলা হরফ নির্মাতা পঞ্চানন কর্ম-কারের ছেনিকাটা বাংলা অক্ষর তখনও খুব উন্নত হয়নি। ১৭৯৮ সালের গোড়ার দিকে পঞ্চানন যে প্রথম বাংলা টাইপ-ফাউণ্ড্রি কল-কাতায় স্থাপন করেন (শুধু বাংলাদেশে নয়, সারা ভারতবর্ষে এই হ'ল প্রথম দেশীয় ভাষায় টাইপ-ফাউণ্ড্রি), তা ছাড়া আর কোন টাইপ-ফাউণ্ড্রি তখনও হয়েছিল কি না সন্দেহ। হলেও, পঞ্চাননের অক্ষরের চেয়ে বাংলা ছাপা অক্ষরের যে আরও উন্নতি হয়েছিল তা

মনে হয় না। বটতলার ছাপাখানায় বাংলা বই এই অক্ষরেই ছাপা হ'ত। মুদ্রাযন্ত্র ছিল তখন কাঠের, তাও নড়বড়ে, খুব মজবুত নয়। ছাপার সময় মনে হ'ত, এই বুঝি যন্ত্রই খ'সে পড়ে! আজও চিৎপুর আহিরিটোলার অলিগলিতে প্রায় এই ধরনেরই ছাপাখানা দু'চারটে খুঁজলে যে পাওয়া যায় না তা নয়। ছেনিকাটা ছাঁচেঢালা অক্ষর সাধারণত খুব সূক্ষ্ম, সুতরাং অল্পদিনের ব্যবহারেই তা ভেঙে যেত। তাছাড়া কাগজের কলও তখন এদেশে হয়নি। ছাপার কাগজও ছিল জীর্ণশীর্ণ, মধ্যে মধ্যে ভাতের মাড় দিয়ে জোড়া। কম্পোজিটাররাও তখন খুব ওস্তাদ হননি এবং মাত্র এক টাকায় বড় চারখানা কোয়ার্টো পৃষ্ঠা তাঁরা কম্পোজ ক'রে দিতেন। এ-হেন গলিতনখদন্ত কাষ্ঠযন্ত্রে, ছেনিকাটা ছাঁচেঢালা হরফে, হাতে-তৈরী জীর্ণ কাগজে বটতলার বই যে এখনকার মতন ঝক্‌ঝকে ছাপা হতে পারে না, তা সকলেই বোঝেন। তাই ভুল ছাপা তো হ'তই, এমনকি বিসদৃশ ছাপা হওয়াও আশ্চর্য নয়। বটতলার ছাপাকে লক্ষ্য ক'রে একটা বিদ্রূপাত্মক প্রবচন তাই এককালে চালু হয়েছিল। সেই প্রবচনটি এই ঃ

"শবল কাবল ভুষি ভুষি সে কাবল"

হয়ত ভাবছেন, এ আবার কি? বটতলার ছাপা, আর কিছু নয়। 'ক' অক্ষরের ধারের লেজটা অনেক সময় চাপের চোটে খ'সে যায়; 'শ' ও 'স' যদি যথেষ্ট না থাকে তাহ'লে যথাস্থানের বদলে যদৃচ্ছা ব্যবহার করতেই হয়, 'র' অক্ষরের মধ্যের পেটটি কাটা, কিন্তু সেটা ক্ষয়ে যায়; গলিঘুপ্‌চির অন্ধকারের মধ্যে বসে' ছেনিকাটা 'ভ' ও 'ত' হরফের পার্থক্য সবসময় বোঝা যায় না এবং 'ম' যদি কম প'ড়ে যায় তাহ'লে 'ষ' দিয়ে কোনরকমে তার কাজটা চালিয়ে নিতে হয়। এত কিছু ঘটে এবং এত ব্যাপার করতে হয় ব'লে—"সকল কারণ তুমি তুমি সে কারণ" যখন কপি থেকে ছাপা হয়ে বাইরে প্রকাশিত হয় তখন শেষ পর্যন্ত তা দাঁড়ায়—"শবল কাবল ভুষি ভুষি সে কাবল" রূপে। তা দাঁড়াক, তবু এই 'ভুষি ভুষি' ছাপা পড়েই একসময় আমাদের দেশের সাধারণ লোক সাহিত্য-সম্পদের আস্বাদ কি তা বুঝতে পেরেছেন এবং ছেনিকাটা হরফে ভুল ছাপা কৃত্তিবাস-কাশীরাম-মুকুন্দরাম-ভারতচন্দ্রের কাব্য, চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত, প্রহ্লাদচরিত, কৃষ্ণমঙ্গল, রাধিকামঙ্গল ইত্যাদি তাঁদের মনটাকে সরস ও সংস্কৃত করেছে। ১৮২০ সালে ছাপা বাংলা বইয়ের যে তালিকা

লঙ্ সাহেব দিয়েছেন তাতে দেখা যায় ঊনিশখানা কাব্যের মধ্যে আট-খানা বৈষ্ণবগ্রন্থ, তিনখানা শাক্ত শৈব ও ভক্তিগ্রন্থ এবং চারখানা আদি-রসাল নিবন্ধ, যেমন আদিরস, রতিমঞ্জরী, রতিবিলাস ও রসমঞ্জরী। সুতরাং শুধু আদিরসাত্মক বই বটতলার প্রকাশকরা ছাপতেন ভাবলে ভুল হবে এবং প্রকাশকদের প্রতি অবিচার করা হবে। বটতলার প্রকাশকরা যদি ক্রমে আদিরসের দিকে বেশী নজর দিয়ে থাকেন তাহ'লে তার জন্য কলকাতার নব্যবাবুদের "বিদ্যাসুন্দর" ও "খেউড়" কালচারকেই দায়ী করতে হয় বেশী, প্রকাশকদের নয়। হঠাৎ-গজিয়ে-ওঠা কলকাতার নব্যবাবুদের বিকৃতরুচির খোরাক যোগাতে বাধ্য হয়েছেন বটতলার প্রকাশকরা, তার বেশী তাঁরা কিছু করেননি। তাঁদের আসল লক্ষ্য ছিল ছাপার অক্ষরে গ্রন্থাকারে বাংলা সাহিত্যকে জন-সমাজে পৌঁছে দেওয়া এবং রাজদরবার ও পণ্ডিতসভার বন্দীদশা থেকে তাকে মুক্ত করা।

ছেনিকাটা হরফে কাষ্ঠযন্ত্রে শুধু যে বই ছাপা হয়েছে বটতলায় তা নয়, পঞ্চানন কর্মকারের সুযোগ্য শিষ্য মনোহর মিস্ত্রী ও তার পুত্র কৃষ্ণ মিস্ত্রী কাঠখোদাই ব্লকে ছবি পর্যন্ত ছেপে তখন তাক্ লাগিয়ে দিয়েছিলেন। এইভাবে বটতলায় অনেকদিন ধ'রে যেসব ছবি বইয়ের মধ্যে ছাপা হয়েছে আজও তা দেখলে কলেজ ষ্ট্রীটের প্রকাশকরা অনেকে চম্‌কে যাবেন ও লজ্জিত হবেন। এছাড়া শোনা যায়, বট-তলায় নাকি বিশুদ্ধ হিন্দুমতেও বই ছাপা হ'ত। বিখ্যাত লেখক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম যুগে বটতলার একজন অন্যতম প্রকাশক ছিলেন। তিনি যে শুধু "শ্রীমদ্‌ভাগবত" ছেপেছিলেন তা নয়, বিশুদ্ধ হিন্দুমতে ছেপেছিলেন। গোঁড়া ব্রাহ্মণ কম্পোজিটার এই ভাগবতগ্রন্থের টাইপ সেট্ করেছিল এবং বিশুদ্ধ গঙ্গাজল-সংযোগে ছাপার কালি তৈরী করা হয়েছিল। পুঁথির ধরনে বইখানা ছাপা হয়েছিল এবং পাটা সমেত তার অগ্রিম মূল্য নির্ধারিত হয়েছিল তেত্রিশ টাকা, ছাপা হবার পর চল্লিশ টাকা। বটতলায় তখন কয়েকজন মুসলমান প্রকাশকও ছিলেন, তবে তাঁরা বিশুদ্ধ মুসলমানী মতে কোন ইসলামধর্মের গ্রন্থ ছেপেছিলেন কিনা জানা যায় না।

"তুমি তুমি"-র বদলে "ভুযি ভুযি" ছাপা হলেও বাঙালীর সংস্কৃতির ইতিহাসে বটতলার প্রকাশকদের একটা অবিস্মরণীয় দান আছে। এই প্রকাশকদের চেষ্টাতেই বাংলা ছাপা বইয়ের দাম ক্রমে আশাতীত পরিমাণে ক'মে যায়, মাত্র পঁচিশ-তিরিশ বছরের মধ্যে।

প্রথমে বই ছাপা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার ছিল, ছাপতে খরচ পড়ত যথেষ্ট এবং দামও ছিল বেশী। পরে বটতলার প্রকাশকদের অক্লান্ত চেষ্টায় বাংলা ছাপা বইয়ের দাম অনেক ক'মে যায় এবং তা বাংলার ঘরে ঘরে হাজার হাজার বাঙালী পাঠক-পাঠিকার হাতে পেঁছিয়। কয়েকটা তার দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। মুকুন্দরামের ''চণ্ডীমঙ্গল কাব্য'' বিশ্বনাথ দেবের প্রেসে যখন ছাপা হয় ১৮২৩ সালে, তখন তার দাম ছিল ছয় টাকা, পরে ১৮৫৬ সালে যখন কমলালয় প্রেসে ছাপা হয় তখন দাম হয় মাত্র এক টাকা। কালিদাস কবিরাজের "বেতালপঞ্চবিংশতি" সমাচার চন্দ্রিকা প্রেসে ছাপা (১৮৩১ সালে) দাম দু'টাকা, পরে সুধাসিন্ধু প্রেসে ছাপা (১৮৫৬ সালে) দাম চার আনা মাত্র। কৃত্তিবাসের "আদিপর্ব" রামকৃষ্ণ মল্লিকের প্রেসে ছাপা (১৮৩১ সালে) তিন টাকা, সুধাসিন্ধু প্রেসে ছাপা (১৮৫৬) মাত্র দুই আনা। পরবর্তীকালে অন্যান্য গাছতলার অনেক প্রকাশক প্রথমে সুলভে বই ছাপার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন, কিন্তু বটতলার প্রকাশকরা সবার আগে সকলের পথপ্রদর্শক। এইদিক দিয়ে বিচার করলে বটতলার প্রকাশকদেরই বাংলাদেশের প্রথম গণতান্ত্রিক প্রকাশক বলা চলে। বটতলার দৌলতেই বাংলা সাহিত্য প্রথম বাঙালীর কাছে লোকপ্রিয় হয়ে ওঠে।

এছাড়া বটতলার প্রকাশকদের ভ্রাম্যমাণ সেলস্‌ম্যান বা ক্যানভাসারও ছিল। আধুনিক বিজ্ঞাপনের কায়দাকানুন তাঁরা জানতেন না. সামান্য যে দু'চারখানা পত্রিকা ছিল তার পাঠকসংখ্যাও এত অল্প ছিল যে, তাতে বিজ্ঞাপন দিলে বিশেষ কাজও হ'ত না। তাই বটতলার প্রকাশকরা ক্যানভাসারের উপরেই নির্ভর করতেন বেশী। বইয়ের বোঁচকা কাঁধে ক'রে ক্যানভাসাররা শহরে ও গ্রামে ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। এঁদের রোজগারও নেহাৎ কম ছিল না। লঙ্‌ সাহেব একজন ক্যানভাসারের কথা বলেছেন যাঁর রোজগার ছিল প্রায় মাসে শতাধিক টাকা। গ্রামে গ্রামে বই ফিরি করবার সময় এই ক্যানভাসাররা সস্তা দামে এবং নতুন বইয়ের বিনিময়ে অনেক মূল্যবান পুঁথি সংগ্রহ ক'রে এনেছেন, যা অনেক অনুসন্ধানী স্কলাররাও পরবর্তীকালে করতে পারেননি। বটতলার প্রকাশকরা না থাকলে তাঁদের ক্যানভাসারদের মাধ্যমে এতবড় মূল্যবান কাজটা হয়ত কোনদিনই করা হ'ত না এবং অনেক পুঁথি চালের বাতায় গোঁজা থেকে নষ্ট হয়ে যেত। বাংলা সাহিত্যের প্রতি বটতলার প্রকাশক ও ক্যানভাসারদের এই যে আন্তরিক দরদ ছিল, কলেজ ষ্ট্রীটে আজ তা ক'জনের আছে?

(দুই)

গ্রহন্ত গ্রাহক কারি যে জন হইবে
বটতলা আসিয়া সেই তল্লাস করিবে।
তিনশো প'য়ত্রিশ নম্বর দোকান মাঝার
তালাস করিলে পাবে আবশ্বক জার।
এক্ষণ মালেক জেই হৈল কেতাবের
তাহারই নামেতে পুথি হৈল জাহের।

—মফিজদ্দিন আহম্মদ

বটতলার প্রকাশকরা নিজেরাই বইয়ের শেষে এইরকম আত্ম-পরিচয় দিতেন। কবিরা যে দিতেন না তা নয়। গ্রন্থের মালিকানার ব্যাপারে প্রকাশক ও লেখকের মধ্যে কিরকম সম্পর্ক ছিল তা অবশ্য স্পষ্ট বোঝা যায় না। তবু আন্দাজ করা যায় যে, প্রকাশকরাই গ্রন্থের "সোল প্রপ্রাইটর" ছিলেন। একশ' বছর আগের বটতলার প্রকাশক-দের তার জন্য খুব দোষ দেওয়া চলে না, কারণ মাত্র কুড়ি-প'চিশ বছর আগেও কলেজ স্ট্রীটের প্রকাশকরা এইভাবে মালিকানা-স্বত্ব কিনে নিয়ে বইয়ের ব্যবসা ক'রে অনেকে লক্ষপতি হয়েছেন। সেইসব প্রকাশকদের গায়ে হয়ত বটতলার ছাপ নেই, হয়ত বা তাঁরা পরবর্তী-কালের কোন বিখ্যাত আমড়াতলার প্রকাশক, কিন্তু আমড়াতলার সাংস্কৃতিক আভিজাত্য একেবারে ভূয়ো। বটতলার প্রকাশকদের মালিকানা-স্বত্ব সম্বন্ধে যে সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়—"এক্ষণে মালেক জেই হৈল কেতাবের, তাহারই নামেতে পুঁথি হৈল জাহের"—সেই পরিচয় কলেজ ষ্ট্রীট-কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট-বহুবাজার ষ্ট্রীটের অনেক প্রকাশকের "প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত" ঘোষণার মধ্যেও অত্যন্ত উগ্রভাবে পাওয়া যায়। অতএব বটতলার প্রকাশকদের এই মালিকানা-প্রবৃত্তির জন্য কেবল বটতলার পরিবেশকে দায়ী ক'রে কোন লাভ নেই।

প্রকাশকদের সঙ্গে লেখকদের ব্যবসায়ের সম্পর্ক যাই থাকুক না কেন, তাদের পরস্পরের মধ্যে যে যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। এখনকার প্রকাশকদের ভাগ্যে লেখকদের প্রশস্তি পাওয়া রীতিমত দুরূহ ব্যাপার। যদি কেউ পান তাহ'লে বলতে

হবে যে, তিনি খুবই ভাগ্যবান। বটতলার প্রকাশকরা কিন্তু এ বিষয়ে খুবই ভাগ্যবান ছিলেন। লেখকদের প্রশস্তি তাঁরা না চাইতেই অকৃপণভাবে পেতেন। শুধু কি টাকার জোরে পেতেন? ক্ষেত্রবিশেষে হয়ত তাই পেতেন, কিন্তু সব সময় যে আর্থিক পেট্রন হিসেবে পেতেন তা মনে হয় না। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান কাজী সফিউদ্দিন বটতলার একজন অন্যতম প্রকাশক ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে কোন কবি লিখছেনঃ

কাজি সফিউদ্দি নাম বড়া হোসমন্দ
কাজি দেলেরদ্দির তিনি জানহ ফরজন্দ।
জরুরি করিয়া তিনি কহিল আমায়
আম্বিয়া লোকের কেচ্ছা কর বাঙ্গালায়।

কাজটি অসমাপ্ত রেখে কবি মারা যান। পরে যিনি এই কাজের ভার নিলেন, তিনি লিখলেন—

বাকি যাহা ছিল তাহা সায়েরি করিতে
বলিলেন কাজিজি আমার খাতিরেতে।

কিন্তু এর পর প্রকাশক মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়লেন, বই ছাপতে দেরী হ'তে লাগল। কবি নিজেই সেকথা লিখে দিলেন পাঠকদের জন্য—

কেতাব ছাপিতে নাহি গাফেলি তাহার
নাগেহালি হরকতে ছিলেন লাচার।
এখন করহ দোত্তা জত দিনরাত
দুস্মন জাহানে জেয়ছা না থাকে তাহার।
করিলেন শুরু ফের কেতাব ছাপিতে
আল্লা যদি করে দের না হবে এহাতে।

আধুনিক আমড়াতলার প্রকাশকরা হয়ত বলবেন যে, তাঁদের কথাও লেখকরা ভূমিকাতে উল্লেখ ক'রে থাকেন। কিন্তু সে-লেখা আর এই লেখার মধ্যে পার্থক্য নেই কি? একালের আমড়াতলা ও সেকালের বটতলার মধ্যে পার্থক্য এইখানে যে, আমড়াতলার প্রকাশকদের কথা লেখকরা নেহাৎ অন্নের দায়ে ভদ্রতার খাতিরে উল্লেখ করেন, কিন্তু বটতলার লেখকরা শুধু সেই কারণে করতেন না। বটতলার লেখক ও প্রকাশকদের বাণিজ্যিক সম্পর্কের মধ্যেও যে একটা মানবিক সম্পর্ক ছিল, আজকের আমড়াতলার প্রকাশকদের সেকথা মধ্যে মধ্যে মনে করা উচিত। অবশ্য একথা ঠিক যে, আধুনিক প্রকাশকদের মধ্যে কয়েকজন আছেন যাঁরা রুচিবান, প্রগতিশীল ও 'হিউম্যান' এবং প্রকাশনকে

কেবল মুদির দোকানের ব্যবসা না মনে ক'রে, একটা মহান্ সাংস্কৃতিক কর্তব্য বলেও তাঁরা মনে করেন। তাঁরা যে আধুনিক প্রকাশনের মোড় ঘুরিয়ে দিচ্ছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আজও আমাদের দেশে তাঁদের সংখ্যা নগণ্য নয় কি?

* * *

বটতলার লেখকরা অবশ্য শুধু প্রকাশকদের কথা বলেই ক্ষান্ত হতেন না, নিজেদের কথাও বলতেন। নিজের কথা অথবা নিজের রচনার কথা বলতে তাঁরা মোটেই লজ্জিত হতেন না। কলকাতার কড়েয়া অঞ্চলের মুসলমান কবি আশরফ পরিষ্কার মুসলমানী বাংলায় জানিয়ে দিচ্ছেন—

কড়ায়্যাতে কসাইর মছজেদ আছে যেথা
মছজেদ সামেল বাটী জানিবেন সেথা।
বাড়িঘর কোথা ফকিরখানাতে গোজরান
এইতক হলে জানাইনু মেহেরবান।

কড়েয়ার কসাইয়ের মসজিদের সামনের বাড়ী কবি আশরফের বাড়ী। তাতেও যদি কবির বাড়ী খুঁজে বার করতে কষ্ট হয় তাহ'লে ফকির-খানে 'গোজরালেই' তা নিশ্চিত জানা যাবে। কড়েয়ার কবির এই যে সৎসাহস, এ যেন আজকালকার কবি ও লেখকদের নেই বললেই হয়। আধুনিক লেখকরা নাম দিয়ে ধামটা গোপন করতে চান, নামধাম দুই-ই জানাতে চান না। অবশ্য বটতলার লেখকদের আধুনিক লেখকদের মতন সভা-সমিতির ঠ্যালা সামলাতে হ'ত না, এমন কি সমালোচক-দের আক্রমণের ভয়ও তখন তাঁদের বিশেষ ছিল না। সুতরাং কড়েয়ার কবির মতন বুক ফুলিয়ে তাঁরা বাড়ীর ঠিকানা জানাতে পারতেন। আধুনিক লেখকদের এই ভয়ই সবচেয়ে মারাত্মক ভয়, সুতরাং ঠিকানা গোপন ক'রে তাঁরা যে খুব অন্যায় করেন তা মনে হয় না। দেশের আবহাওয়া বদলালে হয়ত লেখকরা সকলেই আবার বাড়ীর ঠিকানা জানাবেন, তার আগে বটতলার কবিদের মতন সৎসাহস দেখানো যথেষ্ট রিস্কি।

বটতলার প্রকাশকরা আর একটি কাজ করতেন যাতে পাঠকদের যথেষ্ট উপকার হ'ত বলে মনে হয়। যে বই তাঁরা প্রকাশ করতেন তার মধ্যে কি "মূল্যবান" বিষয়বস্তু আছে তা তাঁরা নিজেরাই পাঠক-দের বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করতেন। এতে পাঠকদের পক্ষে অনেক দুর্বোধ্য রচনার পাঠোদ্ধার করার সুবিধা হ'ত, লেখকরা দুর্নাম

থেকে বাঁচতেন এবং পাঠকরাও গলদঘর্ম হতেন না। যেমন কেউ লিখছেন—

কিবা আছে কেতাবেতে শুন ভাইজান
একে একে কহিতেছি করিয়া বয়ান।
হাম্‌দো নায়াত প্রথমেতে কেতাব লিখিল
ঈমানের বয়ান ফের খোলছা কহিল।
আর্বী-বাংলা হরফেতে লিখিলেক সব
পড়িয়া করহ ভাই আমল এসব।

এ যে ঠিক লেখার ব্যাখ্যা তা নয়, কতকটা হদিশ বলা যেতে পারে। এরকম হদিশ পেলেও অনেক কাজ হয়। আজকাল গদ্য গ্রন্থের পরিচয় অনেক সময় প্রকাশকরা দিয়ে থাকেন, অন্তত বিজ্ঞাপনে তো দেনই। কিন্তু মুশকিল হয় আধুনিক কাব্যগ্রন্থের বেলায়। প্রকাশকরা বিজ্ঞাপনে কিছুই বলেন না, কবিরা তো বলাটাকে অন্যায় বলেই মনে করেন। এর ফলে হয় কি, হয়ত অনেক "যুগান্তরী" কাব্যগ্রন্থ পাঠকের পক্ষে "প্রাণান্তকর" হয়ে "অপ্রিয়" হয়ে ওঠে। তাই ব'লে আধুনিক প্রকাশকরা যে বটতলার প্রকাশকদের মতন পয়ারছন্দে কাব্য-পরিচয় লিখে দেবেন, তা আমি বলছি না। তবু মনে হয়, এমন কিছু কিছু আধুনিক কাব্যগ্রন্থ দুচারখানা দেখা যায় যার শেষে রেফারেন্স নোট ও "গ্লসরি" যোগ ক'রে দিলে পাঠকদের সুবিধা হয়। পয়ার-ছন্দে না লিখেও এইভাবে সমস্যাটার সমাধান করা যায়। তাতে প্রকাশকের বইও বিক্রী হয় এবং কবিরও সুনাম বাড়ে। সুতরাং কোন কোন ক্ষেত্রে বটতলার এই আদর্শকে প্রকাশকদের আজও মেনে চলা উচিত।

*　　　*　　　*

বটতলায় হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই প্রকাশক ছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে যথেষ্ট প্রীতির সম্পর্ক ছিল ব'লে মনে হয়। বট-তলায় প্রধানত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান প্রকাশকরা এবং শিয়ালদহ ও মেছুয়াবাজার অঞ্চলে ছিলেন পূর্ববঙ্গের মুসলমান প্রকাশকরা। শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের কম্পোজিটার গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য এবং 'সমাচার-চন্দ্রিকার' সম্পাদক ও বিখ্যাত সাহিত্যিক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বটতলার হিন্দু প্রকাশকদের মধ্যে অন্যতম। আদিরসাত্মক গ্রন্থ প্রকাশে এঁরা যথেষ্ট হাত পাকিয়ে-ছিলেন। কেন পাকিয়েছিলেন, সেকথা পরে বলব। প্রকাশনক্ষেত্রে

তাঁরা যদি কুরুচির পরিচয় দিয়ে থাকেন, তবে তার জন্য শোভাবাজারের তথা তাৎকালিক কলকাতার তালুকদারী ও বাবু-কালচারই অনেকটা দায়ী। একটা কথা জানা দরকার এখানে। বটতলার হিন্দু প্রকাশকরাই ইসলামী বাংলা সাহিত্যের প্রচারে প্রধান পান্ডা ছিলেন। হিন্দু প্রকাশকরা বহু মুসলমান লেখকদের বই ছেপেছেন যেমন, মুসলমান প্রকাশকরাও তেমনি হিন্দু লেখক, এমন কি হিন্দু পন্ডিত-দের দিয়েও অনেক বই লিখিয়েছেন। বটতলার কালচারে আর যাই থাকুক, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের কোন বিষ ছিল না তার মধ্যে। আর একটা কথা বিশেষভাবে মনে হয়। বটতলার মুসলমান লেখকদের সংখ্যা হিন্দু লেখকদের চেয়ে বিশেষ কম ছিল না। যাই লিখুন না কেন তাঁরা, মুসলমান লেখকদের তখন বেশ প্রাচুর্য ছিল। পরবর্তী-কালে এই মুসলমান লেখকরা কলকাতা শহর থেকে কোথায় অন্তর্ধান ক'রে গেলেন এবং কেন গেলেন? তাঁদের সংখ্যাই বা এত দ্রুত কমে গেল কেন? একদল প্রতিভাবান হিন্দু কবিয়াল যেমন হঠাৎ কিছু-দিন কলকাতার সংস্কৃতিমঞ্চ সরগরম ক'রে কোথায় সরে পড়লেন, আর খোঁজ পাওয়া গেল না, তেমনি একদল কড়েয়ার ও মেছুয়া-বাজারের বাঙালী মুসলমান কবি হঠাৎ কিছুদিন জাঁকিয়ে কাব্য রচনা ক'রে কোথায় উধাও হয়ে গেলেন। মনে হয় যেন বাংলার লোক-সংস্কৃতির শেষের সেডিমেণ্ট বা তলানিটুকু নতুন যুগপ্রবাহে কলকাতা মহানগরে এসে জমা হয়েছিল বিগত শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত, তারপর তার সমাধি রচিত হয়েছে এই কলকাতাতেই। বটতলা সেই শেষ তলানির স্মৃতি বহন করছে।

(তিন)

"The truth is that an artist who demands appreciation from the public on his own terms and on none but his own terms, is either a god or a conceited and impractical fool. And he is somewhat more likely to be the latter than the former...The sagacious artist, while respecting himself, will respect the idiosyncracies of the public."

—Arnold Bennet (Dr. Schuchking-এর The Sociology of Literary Taste গ্রন্থে উদ্ধৃত)।

শিল্পী ও সাহিত্যিক মাত্রেই লোকসমাজে বাহবা কামনা করেন। যশবৈরাগ্যের বড়াই করাটাও আত্মপ্রচারের একটা কৌশল মাত্র। দেশে দেশে, কালে কালে, সাধারণের রুচি বদলায়। ভোজনের রুচি, পোষাকের রুচি, শিল্প-সাহিত্যের রুচি। যুগে যুগে শিল্পী ও সাহিত্যিকরা সেই লোকরুচি পরিতৃপ্ত ক'রে থাকেন, কারণ তা না হ'লে লোকপ্রিয় হওয়া যায় না। তা যাঁরা করেন না তাঁরা আর্নল্ড বেনেটের ভাষায় হয় দেবতা, না হয় নীরেট বোকা। পৃথিবীর সমস্ত শ্রেষ্ঠ শিল্পী কম-বেশী তাই ক'রে এসেছেন। আত্মমর্যাদা একেবারে না বিসর্জন দিয়েও তা করা যায়। "পাবলিক" ব'লে যে পদার্থকে কেউ কেউ অবজ্ঞা করেন, তা অবজ্ঞার বস্তু নয়। আসলে কেউ কিন্তু একেবারে অবজ্ঞা করেন না, করতে সাহসও পান না। সেক্সপীয়র থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কেউ তা করেননি। গ্যেটের মতন মহাকবিও তাই বলেছেন—

What were I without thee
O my friend, the Public ?
All my impressions monologues
Silent all my joys.

মহাকবি গ্যেটের সঙ্গে কলকাতার বটতলার কবির কোন তুলনা আমি করছি না। শুধু এই কথা বলছি যে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকরা যদি যুগধর্মের সেবা ক'রে থাকেন, পরিবর্তন-শীল লোকরুচির খোরাক যুগিয়ে লোকপ্রিয় হয়ে থাকেন, তাহ'লে বটতলার সাহিত্যিকরা তাঁদের কালে তাই ক'রে গর্হিত কাজ কিছু করেননি।

অনেক রুচিবান সমালোচক বলেন, বিকৃতরুচি বটতলার সাহিত্যিকরা ও প্রকাশকরা নাকি ব্যাঙের ছাতার মতন গজিয়ে উঠেছিলেন। হয়ত তাই উঠেছিলেন, কিন্তু ব্যাঙের ছাতাও তো যত্রতত্র গজিয়ে ওঠে না। গজাবার মতন আবহাওয়া থাকা চাই একটা, মরসুম থাকা চাই। **বটতলার সাহিত্য একটা মরসুমী ফুল এবং সেটা কলকাতা শহরের বিগত শতাব্দীর বিকৃত বাবু-কালচারের মরসুম।** মরসুমটা কি রকম? তখনকার বটতলার পরিবেশ থেকেই বোঝা যায়ঃ "শোভাবাজারের বটতলার পশ্চিমাংশে বড় একখানা আটচালা ছিল। নিধুবাবু প্রতি দিবস রজনীতে তথায় গিয়া সংগীত বিষয়ের আমোদ করিতেন।...নিমতলা নিবাসী সুবিখ্যাত বাবু শ্রীনারায়ণচন্দ্র মিত্র মহাশয় পক্ষীর দল করিয়া উক্ত প্রসিদ্ধ আটচালায় সর্বদা উল্লাস করিতেন, পক্ষীর দলের পক্ষীসকল ভদ্রসন্তান, উপস্থিত বক্তা এবং সৌখিন নামধারী সুখী ছিলেন, পক্ষির দলেরা নিধুবাবুকে অত্যন্ত মান্য করিতেন। পক্ষিগণ আপন আপন গুণানুসারে নাম পাইতেন।" শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণের কালেই নাকি পক্ষির দল গজিয়ে উঠেছিল। পক্ষির দলের সৃষ্টিকর্তা শিবচন্দ্র ঠাকুর নাকি অনেককে কলকাতায় উড়তে শেখান। এঁদের একখানা পাবলিক আটচালা ছিল, সেই-খানে এসে সকলে পাখী হতেন, বুলি ঝাড়তেন ও উড়তে শিখতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়ের কথা। তারপরই বোধ হয় পক্ষীর দল ও বটতলার আড্ডা দুইই উঠে যায়। কারণ হুতোম দুঃখ ক'রে বলছেন ঃ "এখন আর পক্ষীর দল নাই, গুখুরি ও ঝকমারির দলও অন্তর্ধান হয়ে গ্যাচে, পাখীরা বুড়ো হয়ে মরে গেছেন, দু'-একটা আধমরা বুড়োগোছের পক্ষী এখনও দেখা যায়, দলভাঙ্গা ও টাকার খাঁকতিতে মনমরা হয়ে পড়েছেন, সুতরাং সন্ধ্যার পর ঝুমুর শুনে থাকেন। আড্ডাটি মিউনিসিপ্যাল কমিশনরেরা উঠিয়ে দেছেন, এখন কেবল তার রুইন মাত্র পড়ে রয়েছে।"

দেখা যাচ্ছে, বটতলা তখন কলকাতা কালচারের একটা প্রধান কেন্দ্র ছিল এবং সেখানে একটা আটচালা ঘরে আজকালকার নানা কৃষ্টিচক্রের বৈঠকের মতন নিয়মিত বৈঠকও বসত। সেই বৈঠকে ও আড্ডায় কলকাতার ফুলবাবু ও হাফ্‌বাবুরা অনেকেই যোগ দিতেন, নিধুবাবু, হরু ঠাকুরের মতন কবিগায়করাও তার পান্ডা

ছিলেন। এই ধরনের একটা কালচারাল আড্ডা অন্তত প্রায় অর্ধ-শতাব্দী ধ'রে যে চলেছিল বটতলায় তাতে কোন সন্দেহ নেই। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত। শুধু বটতলা নয়, এখানে লক্ষণীয় হচ্ছে বিশেষভাবে আটচালা ঘরটি এবং তার আড্ডাটি। দুটোই বাঙালী জীবনের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতীকস্বরূপ ছিল বটতলায়। কলকাতার কমিশনরেরা আড্ডাটি উঠিয়ে দিয়েছিলেন, কারণ কুরুচি ও অশ্লীলতার দিক দিয়ে আড্ডাটি চরমে উঠেছিল। বিখ্যাত সাহিত্যিক ও বটতলার অন্যতম প্রকাশক ভবানীচরণ তাঁর "নববাবুবিলাস" গ্রন্থে কলকাতার বাবুদের সম্বন্ধে লিখেছেন ঃ "মনিয়া বুলবুল আখড়াই গান, খোষ পোষাকী যশমী দান, আড়িঘুড়ি কানন ভোজন, এই নবধা বাবুর লক্ষণ।" এ ছাড়া তিনি বলেছেন যে পাশা, পায়রা, পরদার, পোষাক, খানা, খয়রাত, বারাঙ্গনা, এসবও বাবুর গুণ। বাবুদের এই সব গুণ ও লক্ষণের সমন্বয়েই বাবু-কালচারের সৃষ্টি। এই কালচারের আবাদ ক'রে বটতলা এককালে যুগধর্ম পালন করেছিল। বটতলার সাহিত্যিক ও কবিরা (এবং প্রকাশকরাও) সমাজের প্রধানশ্রেণীর সাংস্কৃতিক রুচির খোরাক যুগিয়ে লোকপ্রিয় হয়েছিলেন।

* * *

বটতলার কালচার ও বাবু-কালচার যেমন এক বৃন্তের দুই ফুল, তেমনি অষ্টাদশ শতাব্দীর নদীয়ার বৈষ্ণবকালচারই হ'ল কলকাতার বাবু-কালচারের মূল। শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বাঙালীর কালচার শেষ পর্যন্ত মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে যে অবনতির কোন্ চরম সীমায় পেঁছেছিল তা কল্পনা করা যায় না। বৈষ্ণবরা তখন শতাধিক দল উপদলে ভাগ হয়ে গেছেন—নেড়ানেড়ীর দল, আউলের দল, বাউল দল, সাহেবধনী, সহুজে সম্প্রদায়, বলরাম-ভজা, কর্তাভজা, অবধূত, কিশোর-ভজনী, চূড়াধারী, তিলকদাসী, রাধা-বল্লভী, হরিবোলা, সখীভাবক ইত্যাদি নানারকমের দল বিচিত্র পদ্ধতিতে ভজন করছেন। সাধনভজনের মধ্যে আদিরসের বাঁধভাঙা স্রোত বয়ে চলেছে। পূতিগন্ধ পাঁকের মধ্যে বাঙালীর কালচার তখন হাবুডুবু খাচ্ছে। পাঁকের মধ্যেও অবশ্য পদ্মফুল ফোটে এবং পাঁকাল মাছ থাকে। ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদের মতন কবি, অথবা জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের মতন পণ্ডিত, হয়ত সেই ধরনের পদ্মফুল ও পাঁকাল মাছ। কিন্তু পাঁকের পরিচয় পদ্মে নয়, তার পঙ্কিলতায়

ও পূতগন্ধে। পাঁক যদি বজ্‌বজিয়ে ওঠে, পদ্মের গায়েও পাঁক লাগে। তার প্রমাণ ভারতচন্দ্র নিজে, তাঁর 'বিদ্যাসুন্দর' ও 'রস-মঞ্জরী' কাব্য। রাজদরবারের কৃত্রিমতা ও কুরুচিপ্রবণতায় পরিপূর্ণ! শুধু রাজদরবারের নয়, বাইরের লোকসমাজেরও। বিদ্যা যখন সুন্দরকে কিছুদিন পতিগৃহে থাকবার জন্য লোভ দেখাচ্ছে এই ব'লে

নদে শান্তিপুর হতে খেঁড়ু আনাইব
নূতন নূতন ঠাটে খেঁড়ু শুনাইব—

তখন বোঝা যায়, নদে-শান্তিপুরের লোকরুচি খেঁড়ু বা খেউড় শোনার দিকে ঝুঁকেছে। পদাবলী কীর্তন থেকে খেউড়। কীর্তনের মধ্যেই নানারকমের ঠাট ঢুকেছে এবং তার সঙ্গে রামায়ণ ও কৃষ্ণ-লীলার গীতভঙ্গীও বদলেছে। আখড়ায় আখড়ায় কবিগান, পাঁচালি গান, আখড়াই গান, তরজা গান, ঝুমুর গান পুরোদমে শুরু হয়েছে। আদিরসই তার প্রধান উপজীব্য।

আমাদের কালচারের যখন এই অবস্থা তখন তার কেন্দ্রস্থল ক্রমে স্থানান্তরিত হ'তে থাকল শান্তিপুর-কৃষ্ণনগর-নবদ্বীপ থেকে হুগলী-চুঁচুড়া-শ্রীরামপুর হয়ে কলকাতার দিকে। অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী কালচারের ইতিহাসপ্রসঙ্গে একথা বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত। হঠাৎ কলকাতা শহরে বৃটিশযুগে কোন একটা নতুন কালচার গজিয়ে ওঠেনি। বাঙালীর সংস্কৃতি-ভাগীরথীর ভাঁটার স্রোত নালা-নর্দমার ভিতর দিয়ে সুতানটি-কলকাতা-গোবিন্দপুর ছাড়িয়ে একেবারে টালির নালা পর্যন্ত পৌঁছল। তখন ভগীরথ হ'ল টাকা ও বাণিজ্য এবং তার লেনদেনের মালিকরা। অর্থাৎ এই নতুন কৃষ্টিগঙ্গার ভগীরথ হলেন পর্তুগীজ, ফরাসী, ডাচ ও বৃটিশ বণিকরা এবং তাঁদের বাঙালী দালাল, গোমস্তা, দেওয়ান, বেনিয়ান ও মুন্‌শীরা। এঁরাই খাল কেটে কেটে যেন বাঙালীর কৃষ্টিগঙ্গার পঙ্কিল ধারাকে নদে-শান্তিপুর থেকে কলকাতায় নিয়ে এলেন। এই পঙ্কিল ধারার সঙ্গে এল বিদ্যা ও সুন্দরের প্রেম, কৃষ্ণলীলার বিকৃত গীতভঙ্গী, কবিগান, পাঁচালি গান, ঝুমুর গান, তরজা গান—কুরুচিপ্রবণ ও আদিরসাত্মক যা কিছু আছে সব। অবশেষে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও মহারাজা নবকৃষ্ণ যেন এক যুগসন্ধিক্ষণে হাত মেলালেন কল-কাতায়। নদে-শান্তিপুরের সঙ্গে সুতানটি তালুক ও অষ্টাদশ শতাব্দীর লণ্ডনের কালচারের মহামিলন হ'ল কলকাতা শহরে। সুতরাং বটতলাও বজ্‌বজিয়ে উঠলো প্রথমে।

বটতলার সাহিত্যিকদের যেন গুরু হয়ে উঠলেন ভারতচন্দ্র এবং প্রেরণার অফুরন্ত নির্ঝর হ'ল 'বিদ্যাসুন্দর' ও 'রসমঞ্জরী'।

কলকাতার সুতানটির কবি কালীপ্রসাদের 'চন্দ্রকান্ত' কাব্য এবং 'কামিনীকুমার', 'রহস্যবিলাস', 'সুকুমারবিলাস', 'জীবনযামিনী', 'মধুমালতী', 'সতীত্বসুধাসিন্ধু', 'প্রেমোপদেশ নাটক', 'স্ত্রী-লোকের দর্পচূর্ণ', 'কমলদত্তাহরণ', 'প্রেমোল্লাস', 'রসিকতরঙ্গিণী' প্রভৃতি বটতলার সাহিত্য মূলতঃ বিদ্যাসুন্দর ও রসমঞ্জরীর ধারা বহন ক'রে চলল। এই ধারায় ভেসে গিয়ে যদি মদনমোহন তর্কালংকারের মতন সিরিয়াস্ লোকও বিশ বছর বয়সে "বাসবদত্তা" কাব্য লিখতে পারেন—

শুন হে প্রাণ বঁধু
যে সব মধু মধু
হাসিয়া মৃদু মৃদু জানালে

ইত্যাদি ছন্দচাতুর্য দেখিয়ে (ভারতচন্দ্রের ভঙ্গীতে) এবং অক্ষয়কুমার দত্তের মতন কড়া গদ্য ও পাঠ্যপুস্তক-লেখকও যদি 'অনঙ্গমোহন' কাব্য লেখার লোভ না সামলাতে পারেন, তাহ'লে কড়েয়া মেছুয়া-বাজার, ভবানীপুর ও সুতানটীর ''বটতলার কবিদের'' আর অপরাধ কি?

বিদ্যাসুন্দর ও রসমঞ্জরীর স্রোতধারা শুধু যে মদনমোহন ও অক্ষয়কুমারের মতন পণ্ডিত ও গদ্যভাবাপন্নদেরই কাৎ ক'রে ফেলেছিল তা নয়, ইংরেজরাও রীতিমত ঘায়েল হয়ে গিয়েছিলেন। ''ক্যালকাটা গেজেট'' ও অন্যান্য পত্রিকায় এই সব আদিরসাত্মক কবিতার ইংরেজী অনুবাদও তাঁরা প্রকাশ করতেন। একটির নমুনা দিচ্ছি ঃ

My Veedya's beauty fills my head
—I study nought beside;
My Veedya's name I dwell upon
from morn till even-tide;
She only is my every hope,
my wish, my aim, my end;
My orisons to Veedya,
and to her alone ascend.

বিদ্যাসুন্দর কতদূর পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করেছিল, এই ইংরেজী অনুবাদ তার প্রমাণ। কৃষ্ণনগর-শান্তিপুর থেকে যদি লণ্ডনকেও তা স্পর্শ ক'রে থাকে, তাহ'লে বটতলা রেহাই পাবে কেন?

কলকাতার কমিশনাররা বটতলার আড্ডাটি উঠিয়ে দিলেন, আটচালাটি ভেঙে দিলেন। পুরনো বটতলার রুইন মাত্র পড়ে রইল, পক্ষীর দলের বাবুদের অশরীরী আত্মা তার মধ্যেই ডানা ঝাপটাতে ও বোল ঝাড়তে লাগল। কিন্তু পক্ষীবাবুরা মনমরা হয়ে ঝুমুর শুনে বেড়ালেও, বাবু-কালচারের ধারা শুকিয়ে গেল না। দমনের ফলে অবদমিত বাবু-কালচার যেন শেষবারের মতন গা-ঝাড়া দিয়ে উঠলো। ঊনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে বটতলার এক আনা ও ছ'পয়সা সিরিজের পুস্তিকাবলীর মধ্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল—

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের

"কোনের মা কাঁদে আর টাকার পুঁটলি বাঁধে"।

"আপনার মুখ আপনি দেখ।"

রামকৃষ্ণ সেনের

"হুড়কো বৌএর বিষম জ্বালা।"

গোলাম হোসেনের

"কলির বৌ হাড়জ্বালানী।"

শেখ আজিমুদ্দিনের

"কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে।"

অজ্ঞাতনামার

"জাত গেল পেট ভরল না।"

"ইয়ং বেঙ্গল ক্ষুদ্র নবাব" ইত্যাদি।

অবশেষে গভর্ণমেণ্ট আইন ক'রে এই সব বইয়ের প্রকাশ বন্ধ ক'রে দিলেন। লঙ্ সাহেব লিখেছেন যে, আইন করবার আগের বছর এই ধরনের একখানা পুস্তিকা ত্রিশ হাজার কপি বিক্রী হয়েছিল। ছাপার জন্য তিনজন প্রকাশককেও অভিযুক্ত করা হয়েছিল এবং সুপ্রীম কোর্টে তাঁদের জরিমানা হয়েছিল তেরশ' টাকা। বটতলার লেখক প্রকাশকরা তারপর থেকেই ভয় পেয়ে সাবধান হয়ে গেলেন। কিন্তু বটতলার অস্তিত্ব কি একেবারে শেষ হয়ে গেছে? আজ কি তার কোন চিহ্ন নেই? বটতলার প্রকাশকদের দুঃখের কথা এবং বটতলার লেখকদের রহস্যময় পরিচয় আজও যেন রোমাঞ্চ জাগায়।

কলকাতার কমিশনাররা ও বাংলা সরকার 'বটতলার সাহিত্য' প্রকাশ আইন ক'রে বন্ধ ক'রে দিয়ে হয়ত ভালই করেছেন। কিন্তু বটতলার প্রকাশক ও লেখক তো তাঁদের সমর্থনে গ্যেটের মতন বলতে পারেন—

What were I without thee
O my friend, the public ?

(চার)

নির্দিষ্ট সীমারেখায় ঘেরা বটতলার কোন মানচিত্র নেই, কোন ইতিহাস বা গেজেটিয়ারও নেই তার। **বাঙালীর সংস্কৃতি-জীবনের এক ঐতিহাসিক যুগসন্ধিক্ষণের অন্যতম লীলাকেন্দ্র বটতলা চিরদিনই শিক্ষিতের উপেক্ষিতা। নির্বিচার অবজ্ঞার বাণবিদ্ধ বটতলা সাহিত্যের আবর্জনা-স্তূপে সমাধিস্থ।** কে তাকে খুঁজে বার করবে? চিৎপুরের আশেপাশের অলিগলিতে, আহিরিটোলায়, দর্জিপাড়ায়, জোড়াসাঁকোয়, গরানহাটায়, জোড়াবাগানে, চোরবাগানে, বড়বাজারে, শোভাবাজারে। শুধু তাই বা কেন? শিয়ালদহ মির্জাপুর, কলুটোলা কসাইটোলা, বৌবাজার জানবাজার, ঠিক বটতলার ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে না পড়লেও, সাহিত্যিক সীমানার মধ্যে নিশ্চয় পড়ে। মির্জাপুরের "সম্বাদ তিমিরনাশক প্রেস" ও মুন্শী হেদাতুল্লার প্রেস এবং শিয়ালদহের পীতাম্বর সেনের সিন্ধুযন্ত্র থেকেই বটতলার যুগের সূচনা হয়নি কি? সুতরাং বটতলা শুধু তার ভৌগোলিক সীমারেখাতেই আবদ্ধ ছিল না, চিৎপুর রোড থেকে সার্কুলার রোড এবং আরও অনেক দূর পর্যন্ত তার বিস্তার ছিল। সেই কথা ভেবে বটতলা অভিযান ক্রমেই যেন বিশুদ্ধ "এ্যাড্ভেঞ্চার" বলে মনে হতে লাগল। ট্রাম থেকে নেমে পড়লাম। সামনেই কয়েকজন বনেদী বটতলার প্রকাশকের দোকান। নাকের ডগায় চশমা লাগিয়ে, খেরোবাঁধানো খাতায়, মেজেয় বসে, স্বয়ং বৃদ্ধ "সোল্ প্রোপ্রাইটারই" বোধ হয় হিসেব লিখছেন। ফুটপাথের সঙ্গে লাগানো শো'কেস্ ও কাউণ্টার, সুতরাং ক্রেতাদের ভিড় ফুটপাথেই। ডাব, সরবৎ ও দইবড়া ফুটপাথেই রয়েছে, দোকানদার ও খরিদ্দার

যাঁর যখন দরকার স্বাধীনভাবে কিনে খাচ্ছেন এবং তার মধ্যে বই কেনা-বেচাও চলছে। "সোল্ প্রোপ্রাইটারের" মুখের দিকে চেয়ে প্রথমটা ঘাবড়ে গেলাম। বাঘ নয়, ভাল্লুক নয়, তবু যেন বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ করে উঠলো।

সাহস ক'রে এগিয়ে গিয়ে বললাম ঃ "আপনাদের ছাপানো বইয়ের কোন লিষ্টি আছে?" আমার দিকে না তাকিয়েই ধর মহাশয় বললেন ঃ "ছাপানো বই তো আমাদের অনেক রকমের আছে, কিসের লিষ্টি চান আপনি বলুন?" তাইতো, কি বলব? বললাম ঃ "কিছু ধর্মগ্রন্থ, কিছু প্রহসন রঙ্গনাট্য জাতীয় বই, আর অন্য রকম কিছু আর কি।" আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলাম, অর্থাৎ বটতলার সাহিত্য কিছু নগদ টাকায় না কিনলে যে অভিযানের অনেকটাই ব্যর্থ হবে, তা জানতাম। বই কেনার আগে অধিকাংশ "সোল্ প্রোপ্রাইটারের" যে ঔদাসীন্য দেখেছিলাম, বই কেনার পরে আর তা দেখিনি। বটতলার সাহিত্য সামান্য যা কিছু সংগ্রহ ক'রে এনেছি (নগদ মূল্যে) তার একটা তালিকা দিচ্ছি ঃ

রুচিতে অরুচি
ঠকাঠকি তরজা
প্রেমের লুকোচুরি
নাস্তানাবুদ
মাগসর্বস্ব
পাশ-করা মাগ
আক্কেল সেলামী
ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি
লবোরতন
বিদ্যাসুন্দর (রঙ্গনাট্য)
প্রিয়ার চিঠি (নবদম্পতীর প্রথম পত্রালাপ)
দফারফা
বাসরে বিপাক

বটতলার কয়েকটি বিখ্যাত দোকান ঘুরে, সোল প্রোপ্রাইটার বা প্রকাশকদের সঙ্গে আলাপ ক'রে এবং প্রত্যেকের পুস্তক-তালিকা ঘেঁটে দেখেছি, এখনও বটতলার সাহিত্যকে মোটামুটি পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায় ঃ (১) **ধর্মগ্রন্থ**—যেমন মহাভারত, রামায়ণ, শ্রীমদ্-ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, পুরাণ গ্রন্থ, বৈষ্ণব গ্রন্থ ইত্যাদি।

এর মধ্যে বৈষ্ণব গ্রন্থের এখনও প্রাধান্য আছে ব'লে মনে হ'ল। (২) **যাদুবিদ্যা, তন্ত্রমন্ত্র, জ্যোতিষ ইত্যাদি গ্রন্থ**—যেমন অদ্ভুত ইন্দ্রজাল, কামশাস্ত্র, রাক্ষসী-তন্ত্র, গুপ্তমন্ত্র ইত্যাদি। (৩) **বিচিত্র বিষয়-শিক্ষার গ্রন্থ**—যেমন, হোমিওপ্যাথি শিক্ষা, কম্পাউণ্ডারী শিক্ষা, পেটেন্ট ঔষধ শিক্ষা, কবিরাজী শিক্ষা, পশু চিকিৎসা, নাড়ীবিজ্ঞান শিক্ষা, কম্পোজিটরী শিক্ষা, ইংরাজী ভাষা, তবলা-তরঙ্গিনী, বেহালা শিক্ষা ইত্যাদি। (৪) **উপন্যাস**—যেমন, জীবন-সঙ্গিনী, মনের মতো মেয়ে, মন নিয়ে খেলা, বৌদিদি, বন্ধুর বৌ, বিয়ে বাড়ী, ফুল-শয্যা, একালের মেয়ে, এলো যবে যৌবন ইত্যাদি। (৫) **নাটক ও প্রহসন**—যেমন, বিপ্লবী বাঙ্গালী, নীলকুঠী, মহারাজ নন্দকুমার, রাজা সীতারাম ইত্যাদি ঐতিহাসিক নাটক; নারী-রাক্ষসী, রূপের নেশা, প্রেমের গুলবাগ ইত্যাদি সামাজিক নাটক; মিলন-মন্দির, সরমা, হরিশ্চন্দ্র ইত্যাদি পৌরাণিক নাটক এবং প্রহসন ও রঙ্গনাট্য।

বটতলায় বই বিক্রী এখনও যা হয় তা শুনলে কলেজ স্ট্রীটের প্রকাশকরা চম্‌কে যাবেন। ধর্মগ্রন্থের টান আছে, কিন্তু তার চেয়ে বেশী টান যাদুবিদ্যা, তন্ত্রমন্ত্র ও হস্ত-গণনার। টান শহরের চেয়ে গ্রামের দিকে অনেক বেশী। বাংলার গ্রাম্য-জীবনে আজও যে যাদু-বিদ্যা ও তন্ত্রমন্ত্রের প্রাধান্য অটুট রয়েছে, বটতলার এই জাতীয় বইয়ের একাধিক সংস্করণ তার জ্বলন্ত প্রমাণ। ধর্মগ্রন্থের টান অনেক বেশী, সুতরাং ধর্মের টানেরও একটা বৈশিষ্ট্য আছে দেখা যায়। বটতলার শিক্ষা-বিষয়ক গ্রন্থ প্রাথমিক বা মাধ্যমিক কোন শিক্ষাতেই কাজে লাগে না, ডি-পি-আই বা শিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক অনুমোদিতও নয় একটিও, তবু অধিকাংশ বাঙালী জনসাধারণের জীবন আজও এই বটতলার বইয়ের শিক্ষাতেই চলছে। গ্রামাঞ্চলের হাজার হাজার ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার ও কবিরাজ আজও বটতলার ''নাড়ী-জ্ঞান শিক্ষা'' পড়ে রুগীর নাড়ী টিপতে শেখেন, ''পেটেন্ট ঔষধ শিক্ষা'' পড়ে আজও গ্রামের, এমন কি কলকাতার মতন শহরেও অনেক ডাক্তার কবিরাজ ''উপদংশ, প্লীহা, যকৃৎ, আমাশয়, ওলাউঠা, শোথ, অর্শ পাথুরি, দদ্রু প্রভৃতি রোগে ফলপ্রদ ঔষধ প্রস্তুত করিয়া ব্যবসা চালাইবার সহজ উপায়" শিক্ষা করেন এবং পুরোদস্তুর ব্যবসাও চালান। "বেহালা শিক্ষা" ও "তবলা তরঙ্গিনীর" সাহায্যে আজও বাংলার গ্রামের অনেক যাত্রার দলের বেহালাবাবু ও তবলাবাবু আসর মাৎ ক'রে দেন। সুতরাং এসব বইয়েরও বেশ টান আছে

দেখলাম, ভাঁটার টান নয়, জোয়ারের টান বলেই মনে হ'ল। "উপন্যাসের" টান যেমন অন্যত্র আছে, তেমনি বটতলাতেও আছে। কিন্তু বটতলার উপন্যাসের বিষয়বস্তু দেখলে মনে হয়, প্রধানতঃ বিয়ের উপহারের জন্যই যেন সেগুলি লেখা ও ছাপানো। বালিগঞ্জ ও শ্যামবাজারের বাইরেও যে বাংলাদেশের যথেষ্ট ছেলেমেয়ের বিয়ে হয়, সেই সব বিয়েতেও যে বই উপহার দেওয়া হয়, তা বটতলার উপন্যাসগুলি দেখলেই বোঝা যায়। "প্রিয়ার চিঠি" নাম শুনে হয়ত অনেকে হাসবেন, কিন্তু আজও যদি বাংলাদেশের বহু নবদম্পতী বটতলার এই বই প'ড়ে প্রথম প্রেমপত্রালাপ অভ্যাস করেন, তাহ'লে সেটা হাস্যকর মনে না করাই উচিত নয় কি? বটতলায় আজও কিন্তু দোর্দণ্ড প্রতিপত্তি হ'ল নাটক ও প্রহসনের। এইটাই হ'ল আমার বটতলা-অভিযানের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার।

বটতলার প্রহসন ও ছোট ছোট রঙ্গনাট্য আজও সেই ঊনবিংশ শতাব্দীর চার আনার পুস্তিকামালার ধারা অক্ষুণ্ণ রেখে চলেছে, লঙ সাহেব যে-জাতীয় পুস্তিকা ত্রিশ হাজার কপি বিক্রীর কথা পর্যন্ত বলেছেন এবং গভর্ণমেণ্ট একসময় যার মুদ্রণ ও প্রচার বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন। এই জাতীয় পুস্তিকামালার একটি তালিকা আগে দিয়েছি। অদম্য কৌতূহল নিয়ে কোন প্রবীণ বটতলার প্রকাশককে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ "এই সব প্রহসন ও নক্‌শা আজকাল বিক্রী হয় কেমন?" গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন ঃ "হয়, তবে আগের মতন আর হয় না।" তার কারণ তিনি যা বললেন, তার মধ্য দিয়ে আমি বটতলার সুদূরপ্রসারী জটপাকানো শিকড়ের একটা নতুন সন্ধান পেলাম। শীল মহাশয় (প্রকাশক) বললেন ঃ "আগে যেসব যাত্রার দল ছিল, অপেরা পার্টি ছিল কলকাতায়, এখন আর তা নেই। আজকাল সিনেমাই সব সর্বনাশ ক'রে দিয়েছে। আগে যাত্রা হ'লে, প্রধান নাটক অভিনয়ের শেষে সবসময় একটা প্রহসন ও রঙ্গনাট্য অভিনীত হ'ত। এখন যাত্রার দল, অপেরা পার্টি প্রায় সব উঠে গেছে, যাত্রাও বিশেষ হয় না, প্রহসনও তেমন কাট্‌তি নেই। যা কিছু নাটক প্রহসন বিক্রী হয়, তার অধিকাংশই মফঃস্বলে।"। আরও কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ "যে সব যাত্রার দল, অপেরা পার্টির কথা বললেন, সেগুলো কি এই অঞ্চলেই ছিল?" প্রকাশক বললেন ঃ "তা ঠিক বলতে পারব না, তবে মনে হয় এই বটতলা অঞ্চলেই বেশীর ভাগ ছিল। এখনও দু' চারটে

যে নেই তা নয়।" এই সব যাত্রার দল ও অপেরা পার্টির পরিচয় কিছু কিছু বটতলায় ঘুরে সংগ্রহ করেছি। এখানে শুধু কয়েকটির নাম জানালাম ঃ

রয়েল বীণাপাণি অপেরা
মিনার্ভা অপেরা
চণ্ডী অপেরা
আর্য অপেরা
নিউ নারায়ণ অপেরা
ষষ্ঠী অপেরা
ভাণ্ডারী অপেরা
রঞ্জন অপেরা
শিবদুর্গা অপেরা
নট্ট কোম্পানীর দল
সত্যম্বর অপেরা
গণেশ অপেরা
নিউ বাসন্তী অপেরা
শ্রীদুর্গা অপেরা

বেশ বোঝা যায়, কলকাতা শহরের পক্ষীর দলের বাবুরা এবং তাঁদের বংশধরেরা অন্তর্ধান করবার পরেও বটতলার কালচার বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। এ্যামেচার যাত্রার দল ও অপেরা পার্টি অসংখ্য গজিয়ে উঠেছিল বটতলা অঞ্চলে এবং শুধু সখের নয়, পেশাদার দলও ছিল তার মধ্যে। এই সব অপেরা দলই বটতলার সাহিত্যকে দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রেখেছিল। এদেরই কল্যাণে নাটক ও প্রহসনের যে আবাদ হয়েছিল বটতলায়, তাতে সোনা বিশেষ না ফললেও, সবটাই তার তামা-পেতল নয়। বটতলার প্রকাশকদের প্রায় সকলের "মুকুন্দ দাসের দলে অভিনীত" নাটকগুলিও আছে দেখলাম এবং শুনলাম যে মফঃস্বলে আজও এই সব বইয়ের খুব চাহিদা। বটতলার "প্রেমের গুলবাগ" নাটকের নাম শুনেই হাসবেন না। আগে তার পরিচয় শুনুন ঃ "ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক। তরুণ-তরুণীর প্রেমের উৎস। উভয়ে ভালবেসেছিল উভয়কে, কিন্তু তাদের ভালবাসার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল ভারত সম্রাট। তরুণ গেল কারাগারে, তরুণীও করল স্বেচ্ছায় কারাবরণ দয়িতের জন্য। উভয়ের অশ্রুজলে ভেসে গেল কারাগার—উভয়ের সমাধি হ'ল সেখানে—পরস্পর প্রেমের

আলিঙ্গনে বদ্ধ হয়ে। সেই করুণ দৃশ্যে সম্রাটের কঠোর প্রাণ কেঁদে উঠলো, তখন তিনি বললেন—এ কারাগার নয়, সত্যই প্রেমের গুল-বাগ"। সুতরাং সবসময় বাইরে থেকে নাম দেখে বটতলার বিচার করলে ভুল করা হবে। এর সঙ্গে অবশ্য "নারী-রাক্ষসী" আছে, শ্রীদুর্গা অপেরায় সগৌরবে অভিনীত ঃ "সংসার পথে মা-জাতির এক গ্লানিময় কাহিনী, ইন্দ্রিয়চরিতার্থের জন্য জগতে নারীর পৈশাচিক কর্মের বিকাশ। সব ভেসে যায়—শুধু জেগে ওঠে কামনার কালানল ইত্যাদি।" কিন্তু তারই পাশে আছে মুকুন্দ দাসের স্বদেশী যাত্রায় অভিনীত "নীলকুঠী", আর্য অপেরায় অভিনীত "জন্মভূমি", শিবদুর্গা অপেরায় অভিনীত "শৃঙ্খল মোচন"। একটা কথা বার বার মনে হতে লাগলো, কোথায় সেই সব অপেরার দল? কি তার ইতিহাস? কলকাতার রঙ্গাভিনয়ের ইতিহাসে তাদের দান কি?

বটতলার অভিযান থেকে এইটুকু বুঝেছি, দূর থেকে বালিগঞ্জে বসে বটতলার বিচার করা যায় না। শুধু কলকাতার বাবু-কালচারের প্রতিবিম্ব বটতলা নয়। একসময় হয়ত তাই ছিল, কিন্তু তবু বাঙালীর জাতীয় কালচারের সঙ্গে যোগসূত্র কোনদিনই বটতলা ছিন্ন করে দেয়নি। আজও তাই বটতলা সমগ্র বাঙালী জীবনের প্রতিচ্ছবি হয়ে আছে। আমাদের ধর্মকর্ম, আমাদের জাদুবিদ্যা তন্ত্রমন্ত্র, আমাদের কবিরাজী কম্পাউণ্ডারী, আমাদের রঙ্গাভিনয়, সব কিছুর পসরা সাজিয়ে বসে আছে বটতলা। এখনও তাই মনে হয়, বাঙালীর জনসমাজের আসল পরিচয় পেতে হলে বটতলায় যেতে হবে, অন্য কোন গাছতলায় নয়। আজ বটতলার 'রুইন'মাত্র পড়ে থাকলেও, আমাদের জাতীয় জীবনের অন্যতম 'মিরর' বটতলা।

কালীঘাটের পট

(এক)

"আমরা বিশ্বকর্মার পুত্র বটি, আমরা বাঙালীর ছেলে; কর্মদোষে ছোট হয়ে পড়েছি।" বীরভূম জেলার পানুড়িয়া গ্রামের পটুয়া ছবিলাল চিত্রকরের কথা, শহরের কোন শিক্ষিত সমালোচকের কথা নয়। ছোট্ট কথার মধ্যে অনেক বড় কথা বলা হয়েছে। বাংলার পটুয়ারা বাঙালীর ছেলে এবং বিশ্বকর্মার পুত্র, কর্মদোষে ছোট হয়েছে সমাজে। কালীঘাটের পট যারা এঁকেছে তাদেরও পরিচয় তাই। তারা বাঙালীর ছেলে, বাংলার মাটিতেই তাদের পটশিল্পের বিকাশ হয়েছে। 'কলকাতা কালচারের' সংস্পর্শে তাদের অবনতি ও বিলুপ্তি ঘটেছে। কলকাতার লিথোগ্রাফিক প্রেস বটতলার খোদাইশিল্পী ও কালীঘাটের পটুয়াদের নির্মূল ক'রে দিয়েছে।

কালীঘাটের পট ও পটুয়াদের সম্বন্ধে কোন কথা বলার আগে মনে হয়, পট কি? পটুয়ারা কারা? কোথা থেকে তারা কলকাতা শহরে এল এবং কেনই বা কালীঘাটের মন্দিরের আশেপাশে বাসা বাঁধল? কেন তারা সমসাময়িক বটতলার শিল্পীদের সঙ্গে যোগ দেয়নি? কেনই বা বাঙালীর ছেলে এবং বিশ্বকর্মার পুত্র হয়েও অবশেষে তাদের অমন শোচনীয় অধঃপতন হ'ল? কেন তারা পটের বিষয়বস্তু ও অঙ্কনরীতির বৈশিষ্ট্য ছেড়ে বিদেশী ইংরেজ ও ফরাসী শিল্পীদের অনুকরণ করল? এবং কেন শেষ পর্যন্ত কালীঘাটের সেই বিখ্যাত পটুয়াপাড়ার সমস্ত খ্যাতি অবলুপ্ত হয়ে গেল? কালীঘাটের পট ও পটুয়াপ্রসঙ্গে এই ধরনের অনেক প্রশ্ন মনে জাগে!

'পট্ট' বা 'পট' বলতে কাপড় বোঝায়। তুলি দিয়ে ছবি আঁকাকে বলে 'চিত্রলিখন'। পটুয়ারা তাই 'পট আঁকা' না ব'লে 'পটলেখা' বলে। এককালে আমাদের দেশে কাপড়ের উপর ছবি আঁকার রীতি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। এইজন্য 'পটকার' বা 'পট্টীকার' বলতে তন্তুবায় ও চিত্রকর উভয়কেই বোঝাত। বাংলাদেশে সাধারণত দুই শ্রেণীর পট দেখা যায়, (১) একচিত্রের ছোট ছোট

চৌকা পট, (২) সারবন্দীভাবে আঁকা বহুচিত্রের 'দীঘল-পট' বা 'জড়ানোপট'। আট দশ হাত থেকে বিশ-পঁচিশ হাত দীর্ঘ কাগজের উপর (কাপড়ের উপরে পরে অর্থাভাবে আর আঁকা হ'ত না) সাধারণত কোন পৌরাণিক কাহিনী চিত্রিত ক'রে পটুয়ারা সুর-সহযোগে সেই কাহিনীকাব্য আবৃত্তি করত, এবং পট দেখিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াত। দীর্ঘপটের দুই প্রান্তে দু'টি বাঁশের দণ্ড লাগিয়ে, একটিতে পট জড়িয়ে রাখা হ'ত। চব্বিশ পরগণা, বীরভূম, বর্ধমান প্রভৃতি জেলায় কিছুদিন আগেও পটুয়ারা এইভাবে গান গেয়ে, পট দেখিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াত এবং গ্রামের লোকের আর্থিক সাহায্যে জীবনধারণ করত। আজ আর তাদের দেখা যায় না। ''বীরভূমের ইতিহাস'' লেখক ৺গৌরীহর মিত্র লিখেছেন ঃ "পল্লীতে পল্লীতে তখন পটুয়াগণ ভগবল্লীলার নানাবিধ পট চিত্রিত করিয়া তদন্তর্গত বিষয় গানের দ্বারা সাধারণ লোক ও মহিলাগণের আয়ত্ত করিতে যথেষ্টরূপ সহায়তা করিত। এই পটুয়াগণই আমাদের পল্লীগ্রামের চিত্রশিল্পের অন্যতম প্রধান রক্ষক।"

পুরাণকাররা বলেন, ব্রাহ্মণবেশী বিশ্বকর্মার ঔরসে গোয়ালিনী-বেশী ঘৃতাচীর গর্ভে চিত্রকরদের আদিপুরুষের জন্ম। তাঁদের ন'জন পুত্রসন্তান হয়েছিল—মালাকার, কর্মকার, শংখকার, তন্তুবায়, কুম্ভকার, কাংস্যকার, সূত্রধর, স্বর্ণকার ও চিত্রকর। সুতরাং পটুয়ারা শুধু একা ন'ন, বাংলার অন্যান্য শিল্পীরাও তাঁদের সগোত্র। চিত্রকরদের সম্বন্ধে আরও বলা হয়েছে—

ব্যতিক্রমেণ চিত্রাণাং সদ্যশ্চিত্রকরস্তথা।
পতিতো ব্রহ্মশাপেণ ব্রাহ্মণানাঞ্চ কোপতঃ॥

চিত্রকররা চিত্রাংকনের ব্যতিক্রম করায় কুপিত ব্রাহ্মণের শাপে পতিত হয়েছে। বেশ বোঝা যায়, বাংলাদেশের আদিম অধিবাসী-দের মধ্যেই পটুয়া চিত্রকরদের উৎপত্তি হয়েছিল। তারপর আর্য-ভাষীদের এদেশে আগমনের পর এবং হিন্দু ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের আধি-পত্য বিস্তারের ফলে সমাজে তারা পতিত হয়েছে। এই ইতিহাস-টুকুই নানারকম কিংবন্তীর অন্তরালে আত্মগোপন ক'রে আছে।

সমাজে পতিত হবার ফলে পটুয়াদের অস্তিত্ব একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি। অবশ্য এই জাতিভেদ তাদের বিলুপ্তির পথে এগিয়ে দিয়েছে, কারণ একদিন যে পটলিখনের সাংস্কৃতিক প্রয়োজন ছিল আদিম গোষ্ঠীসমাজে ও গ্রাম্যসমাজে এবং পটুয়াদেরও গোষ্ঠী

হিসেবে যে মর্যাদা ছিল, পরবর্তীকালে সেই পটশিল্পের পেশা হেয় প্রতিপন্ন হওয়ায় অনেকে জাতিগত ও বংশগত পেশা ছেড়ে অন্য কোন বৃত্তি গ্রহণ করেছে। এইভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্মের উগ্রতার যুগে পটুয়াশ্রেণী ধীরে ধীরে বিলুপ্তির পথে এগিয়ে গেছে। তবু যত দিন পর্যন্ত প্রাচীন গ্রাম্যসমাজের কাঠামোটিতে ভাঙন ধরেনি, অর্থাৎ প্রায় বৃটিশপূর্ব যুগ পর্যন্ত, ততদিন পটুয়াদের অস্তিত্বও একেবারে লোপ পেয়ে যায়নি। বৃটিশযুগে গ্রাম্যসমাজের কাঠামোটি যখন ভাঙতে আরম্ভ করল, তার আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা নষ্ট হয়ে গেল, তখন পটুয়াশ্রেণীর যেটুকু অস্তিত্ব ছিল তাও একেবারে লোপ পেয়ে গেল। ১৮৭২ সালের লোকগণনায় যোগী (তন্তুবায়) ও পটুয়াদের অভিন্ন জাতি ব'লে গণ্য করা হয়, এবং তাতে দেখা যায় যে তখনও, অর্থাৎ আজ থেকে ৭৫ বছর আগেও চব্বিশ-পরগণায় প্রায় ৮২,৯০৩, বীরভূমে ২৯৯৯, বর্ধমানে ৭৪৫৯ জন যোগী ও পটুয়া ছিল।

কিন্তু কলকাতা শহরে কালীঘাটে পটুয়ারা এল কোথা থেকে এবং কেন এল?

আগে বটতলার কথা বলেছি। কিন্তু বটতলাই শুধু কলকাতার সংস্কৃতিক্ষেত্র জাঁকিয়ে বসেছিল না। কালীঘাটও ছিল। উত্তরে বটতলা এবং দক্ষিণে কালীঘাট, এই ছিল কলকাতার দুই প্রধান সংস্কৃতিকেন্দ্র, বিশেষ ক'রে অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে। কলকাতা ও তার আশপাশের মধ্যে কালীঘাটই হ'ল প্রাচীনতম। বটতলা তার অনেক পরে গজিয়ে উঠেছে। বিপ্রদাসের ''মনসামঙ্গলে'' (১৪৯৫ খৃঃ অঃ) এবং কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের "চণ্ডী" কাব্যে (১৫৭৭ খৃঃ) "কালীঘাটের" উল্লেখ আছে, তার সঙ্গে ''চিৎপুর'', ''কলিকাতার'' কথাও আছে। কিন্তু চিৎপুর বা কলকাতা তখন গ্রাম ছিল, বটতলায় বটগাছটিও হয়ত ছিল, তবে বটতলা ব'লে প্রসিদ্ধি লাভ করেনি। কথিত আছে, প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত রাজা বসন্ত রায় কালীঘাটের মন্দির প্রথম নির্মাণ করেন। বর্তমান মন্দির তৈরী করেন বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরী বংশের সন্তোষ রায়, ১৮০৯ সালে। এই মন্দিরের আশেপাশেই বিভিন্ন বৃত্তির লোকদের সমাবেশে ধীরে ধীরে একটা বাজার গজিয়ে ওঠে। স্বর্ণকার, কুম্ভকার, শঙ্খকার প্রভৃতির সঙ্গে চিত্রকর পটুয়ারাও এই সময় আসতে থাকে, সম্ভবত ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই। উত্তর

কলকাতায় গোবিন্দপুর থেকে সুতানুটি, অর্থাৎ চিৎপুর বটতলা পর্যন্ত প্রধানত তখন শেঠ বসাকদেরই বাস ছিল এবং তাদের হাট-বাজার ছাড়া আর কিছু ছিল না। কলকাতার তখন অন্যতম গন্তব্য স্থান ছিল কালীঘাটের কালীমন্দির। চৌরঙ্গী ও ভবানীপুরের অধিকাংশই তখন জঙ্গলাকীর্ণ, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত লোকালয়ের আশেপাশে বন্য জন্তুদেরও বসবাস ছিল। পথঘাট বিশেষ ছিল না। কিন্তু অন্য কোন পথঘাট বিশেষ না থাকলেও, জঙ্গলাকীর্ণ চৌরঙ্গীর ভিতর দিয়ে কালীঘাট-অভিমুখী তীর্থযাত্রীদের পায়ে-হাঁটা একটি অরণ্যপথ তৈরী হয়েছিল। পথের আশেপাশে বন্য জন্তু ও চোরডাকাতরা ওঁৎ পেতে থাকত যাত্রীদের উপর হামলা করার জন্য। দলবদ্ধ হয়ে গ্রাম্য তীর্থযাত্রীরা কালীঘাটে যাতায়াত করত।

গ্রামের এই তীর্থযাত্রীদের জন্যই কালীঘাটের পটুয়ারা পট আঁকত (লিখত বলা উচিত), শহরের লোকদের জন্য নয়। গ্রামে তাদের প্রতিষ্ঠা ও পসার ক্রমে কমে আসছিল, গ্রামের লোকজনের আর্থিক সংগতিও আর ছিল না তাদের বাঁচিয়ে রাখার মতন। গ্রাম্য-সমাজের মধ্যে বা গ্রাম্যসীমানার মধ্যে পট লিখে, গ্রাম্য দেবালয়ে ছোট ছোট চৌক পট বিক্রী ক'রে, গ্রামের লোকের বাড়ী বাড়ী দীর্ঘ পট দেখিয়ে পালাগান ক'রে ভিক্ষা চেয়ে দিন আর কাটছিল না, কোনরকমে বেঁচে থাকাও সম্ভব হচ্ছিল না। একে ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রাম্যসমাজে তাদের কোন সামাজিক মর্যাদা নেই, তার ওপর শাস্ত্র-কারদের কঠোর অনুশাসন মেনে পট বা চিত্র আঁকারও তারা বিরোধী। বংশানুক্রমে যেরকম বলিষ্ঠ সাবলীল ভঙ্গীতে, বাধা-বন্ধহীন কল্পনার সাহায্যে পটুয়ারা চিরদিন অবলীলাক্রমে পটচিত্র এঁকেছে, সেইভাবেই তারা আঁকতে চায়—তা সে দেবদেবীর মূর্তিই হোক, আর জন্তুজানোয়ার বা যে-কোন বিষয়ের ছবিই হোক। শাস্ত্রীয় অনুশাসনের কাছে বাংলার পটুয়ারা তাদের যুগযুগান্তের ঐতিহ্য-গত তুলিকলমের স্বাধীনতা বিসর্জন দেয়নি এবং এই 'ব্যতিক্রমের' ('বিদ্রোহই' বলা উচিত) জন্যই ব্রাহ্মণের অভিশাপে তারা পতিত হয়েছে।

গ্রাম ছেড়ে শহরে আসার প্রয়োজন দেখা দিল। জাতিভেদ-কলুষিত গ্রাম্যসমাজের ক্রমিক অবনতি এবং আর্থিক দুর্গতি হ'ল তার কারণ। গ্রামের সংকীর্ণ গন্ডী ছেড়ে জীবিকার জন্য পটুয়াদের কোন বৃহত্তর ক্ষেত্রে যাবার প্রয়োজন হ'ল, গ্রাম্য দেবালয়, গ্রাম্য তীর্থ

ছেড়ে কোন বৃহত্তর তীর্থস্থানে। তা না হ'লে অবশ্য বংশগত বৃত্তি ছাড়তে হয়, পট আঁকা ছেড়ে দিয়ে অন্য কিছু দিনমজুরী করতে হয়। অনেকে তাই করল, বংশবৃত্তি ছেড়ে ভিন্নবৃত্তি অবলম্বন করল বা দিনমজুর হয়ে গেল। যারা তা করল না এবং করতে পারল না, রঙ-তুলি-কাপড়-কাগজ ছেড়ে হাল-বলদ বা হাতুড়ি ধরতে পারল না, তারা হয় কায়ক্লেশে গ্রামের মধ্যেই পট এঁকে বেঁচে রইল, অথবা শহরে ও বৃহত্তর তীর্থস্থানের দিকে গ্রাম ছেড়ে চলে গেল। চব্বিশ-পরগণা, বর্ধমান, বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চল থেকে এইভাবেই গ্রাম্য পটুয়ারা এসেছে কলকাতার কালীঘাট অঞ্চলে। কালীঘাটের বিখ্যাত "পটোপাড়ার" (পটুয়াদের পাড়া) উৎপত্তিও হয়েছে এইভাবে। এই পটুয়াদের বংশধরদেরই কলকাতার শহরবাসীরা পরে "কালীঘাটের পটুয়া" নাম দেন এবং তাঁদের আঁকা পটচিত্রকে "কালীঘাটের পট" বলেন।

(দুই)

বালিঘাটা এড়াইল বেণিয়ার বালা।
কালীঘাটে গেল ডিঙ্গা অবসান বেলা॥
মহাকালীর চরণ পূজেন সদাগর।
তাহার মেলান বেয়ে যায় মাইনগর॥

শ্রীমন্ত সদাগরের বাণিজ্য-যাত্রার কথা কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম বর্ণনা করেছেন। বেলেঘাটা এড়িয়ে "বেণিয়ার বালা" কালীঘাটে যখন পৌঁছলেন তখন বেলা অবসানপ্রায়। মহাকালীর চরণ-পূজা করলেন সদাগর। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বাণিজ্যযাত্রাকালে বাঙালী বণিকরা কালীঘাটের কালীমন্দিরে পূজা দিয়ে যেতেন। হয়ত বণিকদের ছাড়াও অন্যান্য যাত্রীদের ডিঙ্গা কালীঘাটের গঙ্গার ঘাটে এসে ভিড়ত। শাঁখারী, কাঁসারী ও আরও সব কারিগরদের মতন কালীঘাটের পটুয়ারাও নানারকমের পট বেচে কিছু পয়সা পেত। তবে গঙ্গার উপর দিয়ে নৌকাপথে খুব বেশী যাত্রীর সমাগম হ'ত না তখন। নৌকাপথ ছাড়াও আরও দু'একটি পথ ছিল কালীঘাট যাবার। প্রধানত কালীঘাটের তীর্থযাত্রীরাই পায়ে

হে'টে সেই পথ তৈরী করেছিলেন। গঙ্গার পূর্বদিকে কলকাতার মধ্যে চৌরঙ্গীর ভিতর দিয়ে কালীঘাট পর্যন্ত একটি পথ, আর একটি পথ গঙ্গার পশ্চিমদিকে বড়িশা-বেহালা থেকে কালীঘাটের মন্দিরের উল্টোদিক পর্যন্ত। ঘাটে খেয়া পার হয়ে মন্দিরে আসতে হ'ত, কারণ কালীঘাটের ব্রীজ তৈরী হয়েছে ১৮২২—'২৩ সালে। বড়িশা-বেহালা তখন এই অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে বর্ধিষ্ণু স্থান। স্থানীয় জমিদার (কলিকাতা, গোবিন্দপুর, সুতানুটি প্রভৃতি গ্রামের) সাবর্ণ চৌধুরীদের বাসস্থান বড়িশায় এবং বাঙালী ভূঞা-দের অন্যতম রাজা প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত বসন্ত রায়ের পরিবারের বাস বড়িশার কাছাকাছি সরশুনায়। এ'রাই কালীঘাট মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সুতরাং সরশুনা-বড়িশা থেকে কালীঘাট পর্যন্ত যাতায়াতের পথ তখন নিশ্চয় ছিল এবং সেই পথ দিয়ে গঙ্গার পশ্চিমপারের অনেক তীর্থযাত্রী খেয়া পার হয়ে কালীমন্দিরে আসতেন। চৌরঙ্গী-কালীঘাটের পথেও যাত্রীরা আসতেন। দক্ষিণে বারুইপুর, সোনারপুর, গড়িয়া, টালিগঞ্জের পথেও যাত্রীরা আসা-যাওয়া করতেন। কিন্তু পথগুলি শুধু পায়ে-হাঁটা গ্রাম্যপথ নয়, অত্যন্ত বিপদসংকুল পথ। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পথ, তার উপর আশেপাশেও বন্যজন্তু ও চোরডাকাতের উপদ্রব। সুতরাং বিশেষ পালপার্বণ ছাড়া যাত্রীদের পক্ষে কালীঘাটের মন্দিরে আসা সম্ভব হ'ত না। তবু আশপাশের অন্যান্য গ্রাম্য দেবালয়ের চেয়ে কালীঘাটের প্রাধান্য তখন বেশী এবং যাত্রীসমাগমও বেশী। তাই কালীঘাট কেন্দ্র ক'রে কারিগর ও কারুশিল্পীদের বাজার জ'মে উঠলো, যেমন এদেশের সব তীর্থস্থানে উঠেছে। সেই বাজারে গ্রাম্য-যাত্রীদের কাছে দু'এক পয়সায় পট বিক্রী ক'রে কালীঘাটের পটুয়ারা তখন স্বচ্ছন্দে জীবনধারণ করত। শুধু যে বাজারে পট তারা বিক্রী করত তা নয়। কালীঘাটের আশেপাশে তখন গ্রাম ও গ্রাম্য পরিবেশই ছিল। দীর্ঘপট দেখিয়ে, গান গেয়ে, গ্রামে গ্রামে ঘুরেও হয়ত তারা জীবিকা অর্জন করত। না করাটাই আশ্চর্য, কারণ পট বিক্রীর চেয়ে পট দেখিয়ে গান গেয়ে জীবিকা অর্জন করাই ছিল তাদের বংশানুক্রমিক পেশা।

ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর কালীঘাটের পটুয়াদের আঁকা সেই সব পট আজও কেউ দেখেছেন কিনা জানি না, এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দীর কালীঘাটের পটের আসল বা প্রতিলিপি কোনটাই আমার

চোখে পড়েনি। না দেখলেও ক্ষতি নেই, কারণ সেই সময়কার বাঙালী পটুয়াদের আঁকা পট দেখেই অনেকটা বোঝা যায় কালী-ঘাটের পটুয়ারা কি আঁকত। পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন ক'রে দেবদেবী, দৈত্যদানব, পশুপক্ষীর মূর্তি তারা আঁকত। তাছাড়াও উল্লেখযোগ্য হ'ল পটুয়াদের আঁকা বৈষ্ণবচিত্রাবলী। একটা কথা এখানে বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। নদীয়া, বর্ধমান, চব্বিশ-পরগণা প্রভৃতি জেলায়, কলকাতা ও কালীঘাটের চতুর্দিকে তখন বৈষ্ণব-ধর্ম, সাহিত্য, সঙ্গীত ও চিত্রকলার জোয়ার এসেছিল। বৈষ্ণব-ধর্মের এই প্রভাব বাঙালী পটুয়াদের উপরেও প্রচণ্ডভাবে পড়েছিল। তারই প্রভাবে পটুয়ারা শুধু দেবদেবীর মূর্তি নয়, শ্রীচৈতন্য, অদ্বৈতাচার্য, নিত্যানন্দ, হরিদাস, রূপগোস্বামী, জীবগোস্বামী প্রভৃতির মূর্তিচিত্র আঁকতে আরম্ভ করে। এই ধরনের অনেক মূর্তি-চিত্র স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন একসময় অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে সংগ্রহ করেছিলেন। এই সব বৈষ্ণবগুরু ও আচার্যদের মূর্তিচিত্রগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, শুধু বলিষ্ঠ লীলায়িত রেখা নয়, টানা-টানা ভাবাবিষ্ট আয়ত চোখ ও মুখাবয়ব। দেহের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে আমাদের এই বাঙালী পটুয়ার তুলি যেন একটা স্বতঃস্ফূর্ত ছন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত। বাংলার বৈষ্ণব-ধর্ম বাঙালী পটুয়ার তুলির উপর কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা এখনও কেউ বিশেষ বিচার ক'রে দেখেননি। গতিশীলতাই যে চিত্রের প্রাণ, এ-শিক্ষা বাঙালী পটুয়ারা তাদের পূর্বপুরুষ বাংলার আদিম শিল্পীদের কাছ থেকেই বংশানুক্রমে পেয়েছিল। তারপর বৌদ্ধ, হিন্দু ও বৈষ্ণব-ধর্মের যুগে সেই চিত্রকে তারা ভাবমণ্ডিত করেছে। বৈষ্ণব-যুগে তারা যে মূর্তিচিত্র আঁকতে সিদ্ধহস্ত ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং ইংরেজ শিল্পীদের কাছ থেকে যে কালীঘাটের পটুয়ারা সামাজিক মূর্তিচিত্র আঁকতে শিখেছিল তা মনে হয় না। জন্তু-জানোয়ারের চিত্রও তার অনেক আগে থেকেই তারা আঁকতে পারত। ইংরেজ ও ফরাসী শিল্পীদের কাছ থেকে কালীঘাটের পটুয়ারা কেবল পটচিত্রের একটি নতুন বিষয়বস্তু নির্বাচন করেছিল, সেটি হ'ল সমসাময়িক সমাজের ব্যঙ্গচিত্র। এ-ছাড়া তাদের আঁকা মূর্তির মধ্যে পরে বিলেতী ঢঙের ছাপও পড়েছিল। কিন্তু তারপর থেকেই কালীঘাটের পটুয়াদের অধঃপতন হয়েছে এবং ধীরে ধীরে অবলুপ্তির পথে তারা এগিয়ে গেছে। সেকথা পরে বলছি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝির পর থেকেই কালীঘাটের মন্দির ও তার পরিপার্শ্বের রূপ দ্রুত বদলাতে থাকে ব'লে মনে হয়। আমাদের চাঁদ সদাগর, শ্রীমন্ত সদাগরদের যুগ তখন কেটে গেছে। ঘরে ব'সে বাঙালীর ছেলেরা রূপকথার মতন সেই বাঙালী সদাগরদের কাহিনী শুনছে। ইংরেজ সদাগরের যুগ এসেছে এবং নতুন একশ্রেণীর বাঙালী জমিদার ও বেনিয়ানদের। কালীঘাটের মন্দিরে মানত ও পূজার্চনার ধূমধামও বেড়েছে। ইংরেজ সদাগরদের হাতে কাঁচা পয়সা, তার উপর সদ্য তাঁরা রাজসিংহাসন পেয়েছেন। বাঙালী সমাজের সঙ্গে তাঁরা নতুন মিশছেন, তাঁদের আদবকায়দা, রীতি-নীতি, এমন কি ধর্মকর্ম পর্যন্ত তাঁরা অনুসরণ করছেন। ওদিকে নতুন একশ্রেণীর বাঙালী জমিদার, বেনিয়ান, দেওয়ান, মহাজনদের হাতেও কাঁচা পয়সা আসছে। সুতরাং কালীঘাট বেশ সরগরম। ১৮১৮ সালে কালীঘাট সম্বন্ধে পাদ্রী ওয়ার্ড সাহেব লিখছেন ঃ "আমি শুনেছি পঞ্চাশ বছর আগে মহারাজা নবকৃষ্ণ কালীঘাটে পূজো দিয়েছিলেন প্রায় একলক্ষ টাকা খরচ ক'রে। আমি এমন ইংরেজদেরও দেখেছি যাঁরা দশ হাজার টাকা খরচ ক'রে কালীঘাটে পূজো দিয়েছেন। কিছুদিন আগেও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক ইংরেজ কর্মচারী একটি মামলায় জিতে তিন হাজার টাকা খরচ ক'রে পূজো দিয়েছিলেন কালীঘাটে।'' কোম্পানীর আমলে শুধু মহরাজা নবকৃষ্ণ ন'ন, আরও অনেক বাঙালী দেওয়ান, জমিদার এবং কৃষ্ণনগর থেকে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র পর্যন্ত কালীঘাটে জাঁকজমক ক'রে পূজো দিতেন। ১৮২২ সালে মহারাজা গোপীমোহন দেব যখন পূজো দিতে এসেছিলেন তখন মন্দিরের চারিদিকে পুলিশ পাহারা রেখে লোকের ভীড় ঠেকাতে হয়েছিল। কালীঘাট যে তখন কি রকম সরগরম ছিল তা এই সব পূজার্চনার ধূম থেকেই বোঝা যায়। শুধু পূজার্চনা নয়, তখনও লোকে কালীঘাটে মানতের জন্য জিহ্ববলি, আঙ্গুলবলি দিতে আসত এবং গঙ্গাজলির জন্য বহুদূর থেকেও মুমূর্ষু বৃদ্ধবৃদ্ধাদের কালীঘাটের গঙ্গাঘাটে নিয়ে আসা হ'ত। সুতরাং কালীঘাট আর বটতলা এক নয়। কালীঘাটের বাজার যখন জমজমাট, বটতলার আশেপাশে তখন টপ্পা আর কবিগানের সুর শোনা যাচ্ছে শুধু। তাছাড়া বটতলার চেয়ে কালীঘাটের আভিজাত্য ও জাঁকজমকও তখন অনেক বেশী। পাল্কি, জুড়িগাড়ী ও দোলদার ছক্কোড়ের সমাগম তখন কালীঘাটে যেমন

হ'ত, তেমন আর কোথাও হ'ত না। কালীঘাটের পটুয়াদের তখন স্বর্ণযুগ। ইংরেজরা, বাঙালী রাজা-মহারাজা, দেওয়ান-বেনিয়ান ও সাধারণ তীর্থযাত্রীরা তখন পট কিনতেন, আজকালকার সমঝদার-দের মতন সংগ্রহ করার জন্য নয়, দু'এক পয়সায় নানারকমের পট পাওয়া যেত ব'লে। কোন বাঙালী রাজা-মহারাজার ঘরে সেযুগের সেসব কালীঘাটের পট একটিও নেই, কারণ তার শিল্পমূল্য তাঁদের কাছে কিছুই ছিল না। তাঁরা কিনেছেন, দু'দিন পরে আবর্জনা স্তূপে ফেলে দিয়েছেন। ইংরেজরাও তখন তা বহন ক'রে ইংলণ্ডে নিয়ে যাননি। কালীঘাটের পটুয়ার আসল পট তাই আর দেখবার কোন উপায় নেই।

কালীঘাটের পটুয়াদের যখন স্বর্ণযুগ, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া (১৮২০-'২৫ সাল) পর্যন্ত, তখন বৃটিশ, ফরাসী প্রভৃতি বিদেশী শিল্পীরা অনেকে কলকাতা শহরে এসেছিলেন। তাঁরা সব বড় বড় ইংরেজ ও বাঙালী বাবুদের পোর্ট্রেট এবং সামাজিক চিত্র আঁকতেন। তাঁদের মধ্যে মঁশিয়ে ও মাদাম বেল্নস, মঁশিয়ে স্যাভিঞ্যাক, ফ্যানি পার্কস্, ড্যানিয়েল প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ফ্যানি পার্কসের "Wanderings of a Pilgrim in search of the Picturesque" (কলকাতা, ১৮৫০), মাদাম বেল্নসের "Twenty-four Plates illustrative of Hindoo and European manners in Bengal" (লণ্ডন ১৮৩২), অজ্ঞাতনামা ইংরেজ শিল্পীর "An Anglo-Indian Domestic Sketch" (কলকাতা, ১৮৪৯) ইত্যাদির গ্রন্থের মধ্যে এই জাতীয় প্রচুর ছবি আছে। এঁরা যে শুধু আঁকতেন তাই নয়, ছবি ছেপেও প্রকাশ করতেন। ছবি ছাপার জন্য ১৮২০-২২ সালের মধ্যে কলকাতায় লিথোগ্রাফিক প্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ছবি ও ছবির বই ছাপা হ'তে থাকে। প্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় পূর্বোক্ত দু'জন ফরাসী শিল্পীর চেষ্টায়। বিদেশী শিল্পীদের আঁকা ছবি যখন সস্তায় ছাপা হয়ে বাজারে বেরুল তখন থেকেই কালীঘাটের পটুয়া ও বট-তলার শিল্পীদের দুর্দিন ঘনিয়ে এল। অর্থাৎ নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিয়ে বিদেশীদের নকল করার প্রবৃত্তি তাদের মধ্যে জাগল। কালীঘাটের পটুয়ারা সস্তায় সামাজিক চিত্র আঁকতে আরম্ভ করল, গ্রাম্য সাধারণ লোকদের জন্য নয়, তীর্থযাত্রীদের জন্যও নয়, প্রধানত কলকাতার বিকৃতরুচি নব্যবাবুদের জন্য। কালীঘাটের পট সস্তা

বটতলার সাহিত্যের আসরে নেমে এল, তার সমস্ত অতীতের ঐতিহ্য ছেড়ে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝির পর রেলপথ যখন তৈরী হ'ল, কলকাতায় যাতায়াতের সুবিধার ফলে কালীঘাটযাত্রীর ভীড় যখন ক্রমে বাড়তে লাগল, তখন কালীঘাটের পটুয়ারাও সস্তায় বেশী ছবি বিক্রীর প্রলোভন বোধ হয় সামলাতে পারল না। বিদেশী শিল্প, লিথোগ্রাফিক প্রেস, নব্য বাঙালী বাবুদের বিকৃতরুচি এবং রেলপথে বহু যাত্রীর সমাগম—সব একসঙ্গে মিলে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝির পর থেকে কালীঘাটের পটুয়া ও তার পটকে অবনতির পিচ্ছিল পথে টেনে নিয়ে গেল। বিশ্বকর্মার পুত্র বাঙালীর ছেলে, কালীঘাটের পটুয়ারা কবে কোন্ প্রাচীন যুগে ব্রাহ্মণের অভিশাপে সমাজে পতিত হয়েছিল, আর এই আধুনিক যুগে বাণিজ্য, ছাপাখানা, বিদেশী আদর্শ ও এদেশী বিকৃতরুচির চাপে নির্মূল হয়ে গেল মাটি থেকে।

(তিন)

সেই কালীঘাটও নেই, সেই পটুয়াও নেই, কালীঘাটের পটও নেই আর। পুরুষানুক্রমে যাঁরা কালীঘাটে বাস করছেন, পটুয়াদের যাঁরা পট আঁকতে ও পট বেচতে দেখেছেন, তাঁদের মধ্যে যে কয়েক-জনের সঙ্গে আমার আলাপ-আলোচনা হয়েছে, তাঁরা সকলেই তাই বললেন। তাঁরা যে শুধু কালীঘাটের বাসিন্দা তাই ন'ন, কালী-মন্দিরের পুরোহিত পূজারী। আজকের পূজারী বা পুরোহিত ন'ন, সাতপুরুষের পূজারী। তাঁদের কথা অগ্রাহ্য করা যায় না।

কালীঘাটের জাত-পটুয়া যারা তাদের আজ আর চিহ্ন নেই কোথাও। অকারণে কল্পনার ফানুস উড়িয়ে লাভও নেই। যা নেই তা নিয়ে বাঁধাবুলির জাবর কাটাও বৃথা। কিছু নেই, পোকায় কাটা পটের একটা টুকরো পর্যন্ত নেই কোথাও। পটুয়াপাড়া থেকে কেওড়াতলা পর্যন্ত আদিগঙ্গার পাড়টাকে তোলপাড় ক'রে ফেলেও কিছু পাওয়া যায়নি, পটের 'প' পর্যন্ত না। যা খুঁজেছিলাম, হয়ত তা ক্ষ্যাপার "পরশ পাথর" খোঁজার মতন, তাই পাইনি। আজকালকার অধিকাংশ পূর্ববঙ্গের পটুয়াদের মধ্যে কালীঘাটের জাত-

পটুয়াদের দু'চারজন বংশধর বোধ হয় শেষ বাতিটি জ্বালিয়ে বসে আছে আদিগঙ্গার পাড়ে। প্রায় নিভ নিভ বাতি। কেউ উকিলের মুহুরি, কেউ কারখানার মজুর, পালপার্বণে প্রতিমা গড়ে, দৃশ্যপট আঁকে, কিন্তু পট আর আঁকে না। একটা চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে, দুঃখ ক'রে তারা বলল। দুর্গম বস্তির দেড়হাত চওড়া অন্ধকার গলির মধ্যে দাঁড়িয়ে, একহাতে ল্যাম্পো নিয়ে, আর একহাতে পোষা নেড়ী কুকুরটার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে একজন বললে : "আসল কালীঘাটের পট পাবেন না কোথাও"। আসলই চাই, নকল কি হবে? দ্বিতীয় জন বলল : "পট আনিয়ে দিতে পারি; আর যদি বলেন তো নতুন এঁকেও দিতে পারি।" "কোথা থেকে আনিয়ে দেবে?" জিজ্ঞাসা করলাম। সে বলল "কাছাকাছি ডায়মণ্ডহারবারের কাছে একটা গ্রাম থেকে। আর যদি কয়েকদিন দেরী করেন তো মেদিনীপুর ও বীরভূম থেকে জড়ানো পট এনে দিতে পারি।" এদের মধ্যে একজন বেশ গম্ভীর চালে বলল : "কত পট এর মধ্যে আমরা এঁকে দিলাম, আনিয়েও দিলাম। অমুক লোকেরা তো প্রায় এসে নিয়ে যেতেন, এখনও মধ্যে মধ্যে নিতে আসেন।" খ্যাতনামা দু'একজন সংগ্রাহক ও কলা-সমালোচকের নাম করল তারা। আমরা বললাম, "দরকার নেই, আমরা কলেক্টরও নই, আর্ট-ক্রিটিকও নই, তোমাদের পূর্বপুরুষদের আঁকা আসল পট যদি কিছু থাকে, তাই দেখতে চেয়েছিলাম।" দেখা হ'ল না বটে, কিন্তু এইটুকু পরিষ্কার বোঝা গেল যে, চব্বিশপরগণা, বর্ধমান, বীরভূম, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চল থেকে পটুয়ারা কালীঘাটে এসেছিল এককালে, হয়ত বা শ্রীমন্ত সদাগরদের বাণিজ্য-যাত্রার কালে।

কলকাতা শহরের একাধিক সংগ্রাহকের কাছে কালীঘাটের পট দেখেছি এবং পটুয়াদের কাছ থেকেই এমন দু'-একটি দোকানেরও সন্ধান পাওয়া গেছে যেখানে পট বিক্রী করা হয়। একখানা কালীর পটের দাম আড়াইশ' টাকা। মনে হয়, যারা পট এঁকেছিল এবং এখনও আঁকছে, তারা যদি আড়াইটা টাকাও পেত! পটুয়াটি নিজেই বলল : "দেখতে পারেন, তবে কিনবেন না যেন, পাঁচ টাকায় অনেক ভাল পট পাবেন।" দুঃখ হ'ল এই ভেবে যে, কালীঘাটের পট ও পটুয়ার আজ অস্তিত্ব নেই বলেই হয় তার কদর এত বেড়েছে এবং জাত-পটুয়ার আসল পটের বদলে তার বংশধরদের দিয়ে ফরমায়েসি নকল পট আঁকিয়ে নিয়ে তথাকথিত "দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যের" ব্যবসায়ীরা

দিব্যি ব্যবসা ফেঁদে বসেছেন। অথচ আজকের সমঝদারদের সমাদরের শতাংশের একাংশও যদি কালীঘাটের পটুয়ারা মাত্র পঞ্চাশ বছর আগেও পেত, তাহ'লে বাংলাদেশের শিল্পকলার ইতিহাসে আজ এক নতুন অধ্যায় রচনা করতে হ'ত।

কালীঘাটের প্রাচীনতম পুরোহিত পরিবারের মুখ থেকে শুনেছি—কালীমন্দিরের আশেপাশে পটুয়ারা প্রথমে থাকত, তারপর ধীরে ধীরে উত্তর দিকে পটুয়াপাড়া অঞ্চলে স'রে যায়। স্বামী-স্ত্রী, ছেলেমেয়ে একসঙ্গে পট আঁকত, শুধু পুরুষরা নয়। মন্দিরের পাশে পট বিছিয়ে তারা রোজ বেচতে বসত। খুব বেশী মূল্য হ'লে একপয়সা থেকে চার পয়সার বেশী দাম নয়। কিনবে কে? গ্রামের তীর্থযাত্রীদের পয়সা কোথায়? ভদ্রলোকরা কোনদিনই পটের মূল্য বুঝতেন না। একশ' বছর আগেও নব্যবাবুদের কাছে পট ও পটুয়া অস্পৃশ্য ছিল। তখন বাবুদের কাছে বিদেশী প্রিণ্ট ছবির সমাদর বেশী। আর সবচেয়ে বড়বাবু যাঁরা তাঁরা মোগল শিল্পীদের ছবির 'কপি' রাখতেন দেয়ালে ঝুলিয়ে। শোভাবাজারের রাজবাড়ীর নাচ-ঘরে আজও তা ঝুলে রয়েছে। যুগটাই হ'ল মোগলাই ও ইংরেজী কালচারের মুর্গমসল্লার যুগ—বাংলার পুঁটিমাছ, পট পটুয়া পুতুল তখন অবজ্ঞার রসাতলে দ্রুত নেমে যাচ্ছে।

পূজনীয়াদের মুখ থেকে পটুয়াদের গল্প শুনছি। কথাপ্রসঙ্গে তাঁরা বললেন: 'এই পটের একটুখানি আদরও যদি কয়েকটা দিন আগে হ'ত! কালীঘাটের পট কিন্তু মেয়েরাও আঁকত। আমরা তো মেয়েদেরই আঁকতে দেখেছি বেশী। অদ্ভুত তাদের আঁকার ক্ষমতা। জলচৌকির সামনে ব'সে পটুয়াদের ঘরের মেয়েরা পট আঁকত—কয়েকটা বলিষ্ঠ তুলির টানে এক-একখানা পট শেষ ক'রে ফেলত। ভূষো কালিই বেশী, রঙও তারা নিজেরা তৈরী ক'রে নিত। অনেক সময় পাঁঠার ঘাড়ের চুল দিয়েও তারা তুলী তৈরী ক'রে নিত! সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমরা তন্ময় হয়ে দেখতাম। কি আশ্চর্য দক্ষতা! সামনে দাঁড়িয়ে পুরুষ পটুয়াদের আঁকা দেখিনি, তারাও অবশ্য ওস্তাদ আঁকিয়ে। কিন্তু মেয়ে-পটুয়ারা তাদের তুলনায় কোন অংশেই কম ওস্তাদ ছিল না। আজও মেয়েরা পুরুষ পটুয়াদের সঙ্গে প্রতিমা গড়ে, দৃশ্যপট আঁকে—কিন্তু আগেকার সেই সব পট আর কেউ আঁকে না।'

আমি যা খুঁজছিলাম, তা পেয়ে গেলাম। কালীঘাটের পটুয়া-

দের মধ্যে মেয়ে-পটুয়াদের এই প্রাধান্য থেকে তাদের বহুযুগ-বিস্তৃত অতীত ইতিহাসের অনেকটা আভাষ পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, বাংলার শিল্পকলায় সর্বস্তরের ও সর্বশ্রেণীর ঘরের মেয়েদের যে মূল্যবান দান আলপনা-চিত্র, কাঁথাশিল্প, হাঁড়িকলসি-সরাচিত্র প্রভৃতিতে দেখা যায় তারও একটা ঐতিহাসিক উৎসের হদিশ পেলাম। প্রথম মনে হয় প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম শিল্পীদের কথা, মেয়ে-পুরুষ উভয়েই শিল্পী, বরং ঘরের মেয়েদেরই প্রাধান্য বেশী। সাঁওতাল পরগণা ও ছোটনাগপুর অঞ্চলে সাঁওতাল-হো-মুণ্ডাদের মধ্যে আজও দেখা যায়। বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর হ'ল এই আদিবাসীপ্রধান অঞ্চলের সীমান্ত জেলা এবং ঝাড়খণ্ড, জঙ্গলখণ্ড, মল্লভূমি (বিষ্ণুপুর), বীরভূমি—সবই একদিন জঙ্গলাকীর্ণ আদি-বাসী-প্রধান অঞ্চল ছিল। ধীবর, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, গোপ ও মাহিষ্যদের মধ্যে স্বাধীন রাজা ও রাজ্যের যেসব কাহিনী শোনা যায়, তার মধ্যে বাস্তব ইতিহাসের বিরাট একটা কঙ্কাল সমাধিস্থ হয়ে আছে। তখনই ছিল বাংলার পটুয়াদের আসল স্বর্ণযুগ। কিন্তু কে সেই কঙ্কাল খুঁড়ে বার ক'রে তাদের বিস্তৃত ইতিহাস রচনা করবে? তার-পর উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়রা নতুন ক'রে রাজ্য দখল করেছেন, এবং তাঁদের অভিশাপে শুধু বাংলার পটুয়ারা নয়, সকল শ্রেণীর লোক-শিল্পীরা সমাজে পতিত হয়েছে। বীরভূমের ছবিলাল চিত্রকরের কথাই ঠিক। তারা হিন্দুদের দেবদেবীর মূর্তি আঁকে, লোকাচার মানে, আবার মুসলমানদের মতন নমাজও পড়ে। কালীঘাটের পটুয়ারাও তাই করত। কালীঘাটের পটুয়ারা বাংলার এই পটুয়া-দেরই আত্মীয় ও বংশধর। তাদের ইতিহাস আজও লেখা হয়নি। যতদিন না লেখা হবে ততদিন বাংলার শিল্পকলার ইতিহাস রচনা অসম্পূর্ণ থাকবে। কলকাতায় বসে আজ আর সেই ইতিহাস লেখা যাবে না। কলকাতার বাবুদের রুচি, ইংরেজ শিল্পী ও লিথোগ্রাফিক প্রেস পটুয়াদের নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়েছে।

বটতলার যাত্রাগান

হাসি কাঁদি সাজিগ্‌জি জাগি সারা রাত।
নেচে গেয়ে প‍ুর‍ুষ মেয়ে প্রাণটা করি পাত॥
আমোদ গড়াই, প্রমোদ ছড়াই, নিজের আমোদ নাই।
বারো মাসে একটি বার হাত পেতে দাঁড়াই॥

—মিনার্ভা থিয়েটারের বিজ্ঞাপন-পত্র (১৩২০ সাল)

মাত্র চল্লিশ বছর আগে কলকাতা শহরের অন্যতম রঙ্গালয় থেকে এই ধরনের বিজ্ঞাপন-পত্র ছেপে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হ'ত। সাধারণ লোকের কাছ থেকে থিয়েটার তখনও তার যোগ্য মর্যাদা পায়নি। তার কারণ, যাত্রাগান থেকে থিয়েটার পর্যন্ত অগ্রগতির যে ইতিহাস, তার মধ্যে বিকৃতর‍ুচি বিলাসিতা ও কৃত্রিমতার স্থ‍ূল পদচিহ্ন এত স্পষ্ট যে সাধারণ লোক থিয়েটারের নাম শ‍ুনলেই আঁৎকে উঠতো ভয়ে। তারা ভাবত, থিয়েটার হ'ল কোন বড়লোকের বাগানবাড়ীর বাই-নাচের আসর, বরাখ‍ুরে কামণ্ডুলে ও বারাঙ্গনাদের একটা বারোয়ারী আড্ডাখানা। মাত্র পঁচিশ বছর আগেও এই ধারণা বদ্ধম‍ূল ছিল লোকের মনে। ছেলেবেলায় আমরাও থিয়েটার দেখার অন‍ুমতি পাইনি কোনদিন। থিয়েটারকে এই একঘরে অস্পৃশ্য অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করেছেন প্রথম য‍ুগের অভিনেতারা। প্রায়শ্চিত্ত তাঁদের যথেষ্ট করতে হয়েছে। সেই অতীতের কথাই বলছি—যাত্রাগানের অতীত, এবং যাত্রা থেকে থিয়েটারের পথে অগ্রগতির অতীত। কলকাতা শহরটাকে যখন রাজা-মহারাজা ও শৌখিন বাব‍ুদের বাগানবাড়ী বা বৈঠকখানা ব'লে মনে হ'ত এবং 'কলকাতা কালচার' বলতে যখন বাগানবাড়ীর বৈঠকী কালচার ছাড়া আর বিশেষ কিছ‍ুই বোঝাত না, সেই অতীতের কথা।

তখনও যাত্রাগানের প্রাধান্যের য‍ুগ অস্তমিত হয়নি। উনবিংশ শতাব্দীর কথা। এই দেশী যাত্রাগানের সঙ্গে বিলেতী নাচ ও থিয়েটার 'পাঞ্চ' ক'রে, কলকাতার বাব‍ুদের বৈঠকখানায় ও বাগান-

৯

বাড়ীতে 'সখের থিয়েটার' গজিয়ে উঠেছে এবং সখের থিয়েটার থেকে ক্রমে 'সাধারণ থিয়েটারের' চেতনা জেগেছে। নতুন সখের থিয়েটারের উপর যেমন দেশী যাত্রার প্রভাব পড়েছে, তেমনি আবার সখের থিয়েটার ও বিলেতী নৃত্যাভিনয়ের প্রভাবে দেশী যাত্রাগান ক্রমে 'থিয়েট্রিকাল যাত্রা' হয়ে উঠেছে। যাত্রা ও থিয়েটারের লেনদেনের দীর্ঘ সন্ধিক্ষণের ইতিহাস আজও লেখা হয়নি, লেখার চেষ্টাও করেননি কেউ। ব্রজেন্দ্রনাথ সাল-তারিখ ধ'রে সখের থিয়েটারের একটা বিস্তৃত ইতিবৃত্ত লিখেছেন। তাঁর আগে আরও কয়েকজন সেই ইতিহাস লেখার চেষ্টা করেছেন, তাঁদের মধ্যে ব্যোমকেশ মুস্তাফী, গুহঠাকুরতা, অমরেন্দ্রনাথ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু যাত্রাগানের সুদীর্ঘ ক্রমবিকাশের ধারাটাকে অনেকেই লক্ষ্য করেননি, অবহেলা করেছেন। থিয়েটারের ইতিহাস-প্রসঙ্গে ঠাকুর পরিবার, পাইকপাড়া ও শোভাবাজারের রাজবংশ এবং কলকাতার অন্যান্য বড়লোক বাবুদের কথা আমরা যতটা জানি, তার তুলনায় শিশুরাম অধিকারী, শ্রীদাম-সুবল, পরমানন্দ, প্রেমানন্দ, গোপাল উড়ে, কৃষ্ণকমল গোস্বামী, গোবিন্দ অধিকারী, বদন অধিকারী প্রভৃতির কথা কতটুকু জানি? অথচ রঙ্গালয় বা রঙ্গাভিনয়ের কোন ইতিহাস যাত্রাগান বা তার অধিকারীদের বাদ দিয়ে লেখা সম্ভব নয়। এরকম একপেশে ইতিহাসের মধ্যে সমস্ত বিষয়টার একটা বিকলাঙ্গ ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে, সত্যিকারের ঐতিহাসিক ধারার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। এখানে সেই ধারার প্রতি ইঙ্গিত করা ছাড়া, তার বিস্তারিত পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়।

'যাত্রা' কথার অর্থ 'প্রসেশন' যেমন শোভাযাত্রা, শবযাত্রা ইত্যাদি। উৎসব-পার্বণের সময় গ্রামের সমস্ত লোক, স্ত্রী পুরুষ ছেলে-মেয়ে মিলে নৃত্যগীত রঙ্গভঙ্গী ক'রে গ্রামের মধ্যে এবং গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ানোর নাম 'যাত্রা'। আজও সাঁওতাল, হো, মুণ্ডাদের মধ্যে এই ধরনের উৎসব-যাত্রা হ'তে দেখা যায়। সুতরাং 'যাত্রা'র ইতিহাস দু'এক শতাব্দীর ইতিহাস নয়, তার দিগন্তরেখা সুদূর প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম লোক-সংস্কৃতির ধারাকে পর্যন্ত স্পর্শ করেছে। তারপর এই যাত্রা থেকেই চণ্ডী-যাত্রা, ভাসান-যাত্রা, গম্ভীরা প্রভৃতির বিকাশ হয়েছে এবং ক্রমে রাম-যাত্রা, কৃষ্ণ-যাত্রা ইত্যাদির ভিতর দিয়ে বিদ্যাসুন্দর-যাত্রার যুগ অতিক্রম ক'রে আমরা থিয়েটারের যুগে পদার্পণ করেছি। চণ্ডী-যাত্রা ও ভাসান-যাত্রাই

সবচেয়ে প্রাচীন। তারপর বৈষ্ণবধর্মের আন্দোলনের যুগে বোধ হয় কৃষ্ণ-যাত্রার চূড়ান্ত বিকাশ হয়। নগর-সংকীর্তন ও কৃষ্ণযাত্রার প্রচণ্ড শক্তিশালী মাধ্যমেই যে জনসাধারণের মধ্যে বৈষ্ণবধর্মের প্রচার সম্ভব হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই শক্তিশালী প্রচার-মাধ্যমের আবিষ্কারই বোধ হয় শ্রীচৈতন্য ও তাঁর শিষ্যদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত চণ্ডী-যাত্রা ও ভাসান-যাত্রার পাশে কৃষ্ণযাত্রার প্রবল প্রতিপত্তির যুগ গেছে। সেই সময়, রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের যুগে শিশুরাম ছিলেন কৃষ্ণযাত্রার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অধিকারী। যাত্রাগানের প্রযোজনায় তিনি যুগান্তর এনেছিলেন। শিশুরাম অধিকারীর সুযোগ্য শিষ্য শ্রীদাম-সুবল সেই ধারাকেই বহন ক'রে এগিয়ে যান। তারপর পরমানন্দ দাস কৃষ্ণযাত্রায় এক অভিনব ধারার প্রবর্তন করেন। তিনি নিজেই দূতী সেজে, রাধা-কৃষ্ণ প্রভৃতিকে সামনে রেখে, একাই যাত্রার আসর জমাতেন। তা ছাড়া, তিনি এক নতুন টেক্‌নিকও আবিষ্কার করেন, তাকে 'তুক্কো' বলা হয়। পয়ার ছন্দের গান কতকটা পয়ারের সুরে গাইতে গাইতে তার শেষাংশ যদি কীর্তনের সুরে গাওয়া যায় তাহ'লে তাকে 'তুক্কো' বলে। এই 'তুক্‌কো' নাকি আগে ছিল না, এটা পরমানন্দেরই অভিনব সৃষ্টি। এই তুক্কোর সাহায্যে পরমানন্দ কৃষ্ণযাত্রায় নতুন জীবন সঞ্চার করেছিলেন। পরমানন্দের সমসাময়িক প্রেমচাঁদও যাত্রায় নতুনত্ব আনেন। প্রেমচাঁদের তুক্কো ছিল না, তিনি মহাজনী-পদের প্রাচীন ভাষার সঙ্গে প্রচলিত ভাষা মিশিয়ে সবটাই কীর্তনের সুরে গাইতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিক থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত ছিল এই পরমানন্দ ও প্রেমচাঁদ অধিকারীর যাত্রাগানের যুগ।

কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের যুগে কবি, খেউড় ও আখড়াই গানের সঙ্গে বিদ্যাসুন্দর-যাত্রারও প্রবর্তন হয় নতুন ধারায়। পরমানন্দের সমসাময়িক প্রেমচাঁদ ছিলেন এই বিদ্যাসুন্দর-যাত্রার অন্যতম অধিকারী এবং তিনিই পরমানন্দের তুক্কোর সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার জন্য মহাজনী পদের ব্রজবুলির মধ্যে চলিত ভাষা মিশিয়ে কীর্তন গেয়ে আসর জমিয়েছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কৃষ্ণযাত্রা ও বিদ্যাসুন্দর-যাত্রার দুটো ধারাই আখড়াই-কবি-পাঁচালির সঙ্গে নদীয়া থেকে এসে কলকাতার নতুন সংস্কৃতিগঙ্গায় মিলিত হ'ল। কলকাতার সংস্কৃতি-গঙ্গার ভগীরথ তখন ইংরেজরা এবং তাঁদেরই পার্শ্বচর ও অনুচর

এদেশী রাজা-রাজড়া ও শৌখিন বাবুরা। বিদেশী সাহেবরাই তখন পূর্ণোদ্যমে থিয়েটারে মনোযোগ দিয়েছেন—ক্যালকাটা থিয়েটার, চৌরঙ্গী থিয়েটার, সাঁ সোচি থিয়েটার ইত্যাদি তার প্রমাণ। মিঃ ক্লিঙ্গার, মিঃ রবার্টস, মিঃ পার্কার, মিঃ বার্নাড মেসিঙ্ক, মিসেস ব্রিষ্টো, মিসেস লীচ প্রভৃতি বিদেশী প্রযোজক, অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা তখন কলকাতার আসর জমিয়েছেন। তাই দেখে বাবুদের বৈঠকখানায় ও বাগানবাড়ীতে সখের থিয়েটারের ধূম পড়ে গেছে। তার সঙ্গে খেঁউড়, কবি, আখড়াই, হাফ-আখড়াই ইত্যাদিও চলেছে। উৎসব-পার্বণে ও ভোজসভায় বাইনাচ ও ভাঁড়ের নাচ চলেছে। এমন কি নবাবী আমলের বাইজীরা তখনও পর্যন্ত দিব্যি আসর গরম ক'রে রেখেছেন। রামমোহন রায়ের বাড়ীতে নিকী-বাইজীর নাচ দেখে ফ্যানি পার্কস নিকিকে বলেছেন—"the Catalani of the East"। নিকী ছাড়া বেগমজান, হিঙ্গুল, নান্নিজান, সুপনজান, জিন্নাৎ, ফৈয়দ বক্স প্রভৃতি বাইজীরা তখন শোভাবাজার, চোরবাগান, বটতলা থেকে শুঁড়ো, মাণিকতলা পর্যন্ত সর্বত্র এদেশী ধনীদের গৃহে নেচে বেড়াচ্ছেন। এই ইংরেজ-নবাব ও দেশী হঠাৎ-নবাবদের যুগের বাইনাচ ও ভাঁড়ের নাচের মধ্যে পড়ে কবিগান তার কবিত্ব হারাল, পুরো আখড়াই গান হয়ে গেল হাফ-আখড়াই এবং যাত্রাগানও তার যাত্রাত্ব বিসর্জন দিল। কলকাতা কালচারের সংস্পর্শে বাংলার যাত্রাগান দ্রুত অবনতি ও বিলুপ্তির পথে নেমে গেল এবং গ্রাম থেকে বটতলায় এসে ভিড় করল।

এই সময় পরমানন্দের শিষ্য গোবিন্দ অধিকারী (১৭৯৮—১৮৭০) এবং কৃষ্ণকমল গোস্বামী (১৮১০—১৮৮৮) কৃষ্ণযাত্রাকে অনেক উপায়ে বাঁচাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। গোবিন্দ অধিকারী তাঁর গুরুর তুক্কো ছেড়ে অনুপ্রাসের চটকদার পথ ধরলেন বটে, কিন্তু তাতেও কিছু হ'ল না। কৃষ্ণকমল গোস্বামী অনেক সংস্কার করলেন কৃষ্ণযাত্রার এবং ১৮৩৫ সালে রচিত তাঁর "স্বপ্নবিলাস" প্রায় বিশ হাজার কপি বিক্রীও হ'ল। কিন্তু কৃষ্ণকমল বা গোবিন্দ অধিকারী কারও চেষ্টায় কলকাতার নব্য-সংস্কৃতিগঙ্গার জোয়ার রোধ করা সম্ভব হ'ল না। গোবিন্দ অধিকারী তুক্কো ছাড়লেন, কিন্তু প্রেমচাঁদের শিষ্য বদন অধিকারী তুক্কো ধ'রে বিদ্যাসুন্দর-যাত্রা মাৎ ক'রে দিলেন। গোবিন্দের শিষ্য নীলকণ্ঠ গ্রামে গ্রামে কৃষ্ণযাত্রার পালা গেয়ে বেড়াতে লাগলেন। এর মধ্যে গোপাল উড়ে (১৮১৯—১৮৫৯)

এক অভিনব ধারায় বিদ্যাসুন্দর-যাত্রার প্রবর্তন ক'রে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলেন। হীরার নাচগানে যাত্রার আসর সরগরম হয়ে উঠলো। কেউ কেউ বলেন, পাথুরিয়াঘাটার বীরনৃসিংহ মল্লিক মশাই নাকি গোপাল উড়ের যাত্রার দলের প্রতিষ্ঠাতা। গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর-যাত্রা কলকাতা শহরের রঙ্গলোকে নতুন সাড়া জাগাল।

কলকাতার বাবুরা আগে থেকেই উৎসাহিত হয়ে সখের কবির দল, আখড়াই দল ইত্যাদি করছিলেন। তাই দেখে জনৈক ভবঘুরে মুচে ডোম কবিওয়ালা তখন সংবাদপত্রে দুঃখ ক'রে চিঠি লিখলেন এই মর্মে (১৮২৮ সালে) ঃ বিলেতী সুতোয় বিধবা স্ত্রীলোকের অন্ন গেছে। বাষ্পের নৌকায় গেছে এদেশের দাঁড়ি মাঝি। মাছ-ধরার কারখানায় জেলেদের অন্ন গেছে। এখন দেশের কবি-ওয়ালাদের মারছেন বিশিষ্ট ভদ্রসন্তানেরা। সখের কবির দল ক'রে, বিনামূল্যে অন্যের বাড়ীতে নাচগান ক'রে, বাবুরা আমাদের অন্ন মারছেন। এরকম দৌরাত্ম্য আর একবার নেড়ী বৈষ্ণবীরা আমাদের উপর করেছিল, এখন সৌখিন নেড়ার দল করছেন। এই হ'ল কবিয়াল মুচে ডোমের অভিযোগ। বিশেষ প্রণিধানযোগ্য অভিযোগ। যাত্রার অধিকারীরাও এই অভিযোগ স্বচ্ছন্দে করতে পারেন। বটতলা থেকে কালীঘাট পর্যন্ত বাবুদের সখের যাত্রার দল গজিয়ে উঠলো। পেশাদার অধিকারীদের যাত্রার দল মারা গেল। ১৮২০-'২২ সাল থেকে কলকাতার নতুন যাত্রার দলের খবর পাওয়া যায়,—বিদ্যাসুন্দর-যাত্রা, কামরূপ যাত্রা, কলিরাজার যাত্রা, নলদময়ন্তীর যাত্রা ইত্যাদি। বাইরে থেকেও যাত্রার দল আসত কলকাতায়। ১৮২৬ সালে মণিপুর থেকে এক যাত্রার দল কলকাতায় মতিলাল শীলের বাড়ীতে অভিনয় করতে এল। মণিপুরী যাত্রার বর্ণনা করা হ'ল এইভাবে ঃ

আশ্চর্য্য সম্প্রদায় এই স্ত্রীলোকের দল।
স্ত্রীলোকেতে কৃষ্ণ সাজি করয়ে কৌশল।
ললিতা বিসখা চিত্রা আর রঙ্গদেবী।
সুদেবী চম্পকলতা তং বিদ্যাদেবী।

ভবানীপুরের ভদ্রসন্তানেরা নলদময়ন্তীর যাত্রার দল করলেন, রাম বসু তার গান ও ছড়া লিখতে লাগলেন। যেমন সুর, তেমনি গান—

যথা—

কেন গো, সজনী আমার, উড়ু উড়ু
করে মন।

পিঞ্জরের পাখি যেমন, পলাবারি
আকিঞ্চন।
তথা—
নল নল নল, বলিস্ কি, তা বল।
দাবানল, মনানল, প্রেমানল, কি অনল;
কি সেই, কুল-মজানে কামানল।
—ইত্যাদি

সৌখিন বাবুদের সখের যাত্রার দলের এই উদ্যমানলের দৌরাত্ম্যে শেষ পর্যন্ত অধিকারীদের যাত্রার দল আর টিকতে পারল না। তারপর বটতলার যাত্রার সঙ্গে যখন সখের থিয়েটারও এল, তখন বোঝা গেল যাত্রাগানের যুগ শেষ হয়েছে। অবশ্য বটতলার যাত্রার অনুকরণেই থিয়েটারের সূচনা হ'ল, কিন্তু সেটা অন্য কাহিনী।

বটতলার ছবি

বটতলার ছবি ও বাঙালী শিল্পীরা কোনদিন কোন শিল্প-রসিকের আলোচ্য বিষয় ছিল বলে মনে হয় না। বাইরে জন্মে বট-তলার অলিগলিতে তাঁরা বাস করেছেন, অথবা বটতলায় জন্মেছেন, বটতলায় ব'সে শিল্পচর্চা করেছেন, বটতলার লেখক পাঠক ও প্রকাশকরা তার তারিফ করেছেন। তারপর একদিন বটতলার কোন অন্ধকার গলিতে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। কেউ তাঁদের জন্য একবিন্দু চোখের জল ফেলেনি, কোন শ্রদ্ধাঞ্জলিও তাঁরা পাননি। বটতলার এই বাঙালী শিল্পীরা তার মুখাপেক্ষীও ছিলেন না, কারণ তখনও তাঁরা আত্মসচেতন আর্টিষ্ট হননি, দক্ষ কারিগর ছিলেন মাত্র। আর্টিষ্ট ও ক্র্যাফ্‌টসম্যানে বিচ্ছেদ ঘটেনি বটতলার কালেও।

বটতলা থেকে চৌরঙ্গী অনেক দূর, যুগের ব্যবধানও অনেক। প্রায় একশ'-দেড়শ' বছরের ব্যবধান। এর মধ্যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পথে আমরা অনেক দূর এগিয়ে গেছি। বটতলার যুগে 'ব্যক্তি' থাকলেও, 'ব্যক্তিত্ব' ছিল না। ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র বোধ হয় বটতলা নয়, অন্তত তখনও হয়নি। মধ্যযুগের অস্তগামী সূর্যের বর্ণচ্ছটায় তখনও বটতলার আকাশ বেশ উদ্ভাসিত। তাই বটতলার শিল্পীরা তখনও আধুনিক অর্থে শিল্পী হননি, তাঁরা প্রধানত কারিগরই ছিলেন এবং চিরপুরাতন কারিগর। তাঁদের গোষ্ঠী ছিল, গিল্ড ছিল, গিল্ডের কারিগরির বিশেষত্ব ও সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ছিল, কিন্তু কোন ব্যক্তিকেন্দ্রিক 'স্কুল' ছিল না। 'মুড' বা মর্জির জন্ম হয়নি তখনও। অর্থাৎ "ইডিওসিনক্রেসী" নয়, "ট্রেডিশনই" তখন সবচেয়ে বড় কথা। এই ট্রেডিশন বা ঐতিহ্যের নোঙর ছিঁড়ে খামখেয়ালের উত্তাল সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার যুগ তখনও আসেনি। বটতলার শিল্পীরা তাই ট্রেডিশনই আঁকড়ে ধরে ছিলেন। তাঁরা ছিলেন কারিগর, চিরাচরিত রীতি ও গতানুগতিক ধারাই ছিল তাঁদের একমাত্র সম্বল। নোঙর ছেঁড়ার তাঁরা সাহস

পাননি পাবার মতন অবস্থাও সৃষ্টি হয়নি তখনও। চিরকাল তাঁদের পিতা, পিতামহরা যা এঁকেছেন, যেভাবে এঁকেছেন, বটতলার শিল্পীরা তাই এঁকেছেন এবং সেই একই পদ্ধতিতে এঁকেছেন। বিষয়বস্তু বা পদ্ধতি কোনটাই তাঁরা বদলাননি।

বটতলার যুগ ছাপাখানার যুগ, ছাপা বইয়ের যুগ, বটতলার সাহিত্যের যুগ। বটতলা আর সেই নবাবী আমলের বা নবকৃষ্ণের আমলের বটতলা নেই। পুঁথি-পাণ্ডুলিপির যুগও প্রায় অস্তাচলে। বই ছাপা শুরু হয়েছে, বাংলা বইও। বাঙালী কম্পোজিটার গঙ্গাকিশোর প্রথম উদ্‌যোগী হয়ে বাংলা বই ছেপে প্রকাশ করা ও বিক্রী করা আরম্ভ করলেন। ছাপলেন ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল", ১৮১৬ সালে বৌবাজারের 'ফেরিস এ্যান্ড কোম্পানীর' প্রেস থেকে বৌবাজার বটতলার পৌরসীমানার বাইরে হলেও, নৈতিক সীমানার বাইরে ছিল না তখন। দেড়শ' বছর আগে বৌবাজারে জব চার্ণকের সেই বিখ্যাত পিপুলতলায় ব'সে শোভাবাজারের বটতলা খুব বেশী দূর মনে হ'ত না। ইমারৎ অট্টালিকার প্রাচীর তখনও বটতলা ও বৌবাজেরর পিপুলতলার মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করেনি। "অন্নদামঙ্গল" ছাপা হ'ল অবশ্য পিপুলতলা থেকে এবং যিনি ছাপলেন তিনি নিজে "বেঙ্গল গেজেটি" প্রেস ক'রে (১৮১৮ সালে) বটতলার কোলের কাছে উঠে এলেন চোরবাগানে। প্রায় সেই সময় বটতলায় বিশ্বনাথ দেব প্রেস করলেন এবং চোরবাগানের মল্লিকরাও পিছিয়ে রইলেন না। গঙ্গাকিশোরের বইয়ের ব্যবসায়ে অনুপ্রাণিত হয়ে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করলেন বটতলার মধ্যেই, এবং অল্পদিনের মধ্যেই রঙ্গব্যঙ্গ-কৌতুক-সাহিত্যের পসরায় বটতলার আসর সরগরম ক'রে তুললেন।

এই সময় শুধু যে বটতলার সাহিত্যিকদেরই চাহিদা বাড়ল তা নয়, শিল্পীদেরও ডাক পড়ল। বই শুধু ছাপা হলেই হ'ল না, অনেক বইয়ের সঙ্গে ছবিও ছাপা দরকার হ'ল। অর্থাৎ শুধু ছাপা বই নয়, সচিত্র ছাপা বইয়েরও প্রয়োজন। এতদিন পুঁথির পাটায় ও পৃষ্ঠায় যাঁরা ছবি এঁকেছেন, তাঁদের ডাক পড়ল ছাপা বই চিত্রিত করার জন্য। কাঠখোদাই তাঁদের ভালই জানা আছে, সুদীর্ঘ পুঁথি-পাণ্ডুলিপির যুগে এই কাঠখোদাইয়ে তাঁরা যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছেন। ছাপাখানার প্রথম যুগে কাঠখোদাই ছাড়া ছবি ছাপার উপায়ও ছিল না, তার সঙ্গে শুধু ধাতু-খোদাই চলত। সুতরাং

বটতলার সাহিত্যিকদের সঙ্গে বাঙালী কারিগর-শিল্পীদেরও চাহিদা বাড়ল।

"অন্নদামঙ্গল" যখন ছাপা হ'ল তখন শুধু ছাপা হ'ল না, নদীয়ার বিখ্যাত পণ্ডিত পদ্মলোচন চূড়ামণি মহাশয়কে দিয়ে পাঠ-সংশোধন ক'রে ছাপা হ'ল। তাতেও বই ছাপালে বিক্রী হবে কি-না এবং ছাপার খরচ পোষাবে কি না, সে সন্দেহ গঙ্গাকিশোরের মন থেকে গেল না। নবকৃষ্ণের আমল থেকেই বটতলার একটা নিজস্ব রুচি তৈরী হয়েছিল এবং সেটা সুরুচি কি কুরুচি তা বিচার করলে বটতলার বই ব্যবসায়ীর চলে না। শুধু পদ্মলোচন পণ্ডিতের সংশোধনে ও ছাপাখানার ছাপায় যদি বটতলার বাবুরা খুশী না হন, তাহ'লে গঙ্গাকিশোরের সমস্ত উদ্যম পণ্ড হয়ে যাবে। অন্নদামঙ্গল ছাপা হবে, অথচ বিদ্যা ও সুন্দরের কাহিনীর কোন ছবি থাকবে না, এ যেন বটতলার যুগে ভাবাই যায় না। দূরদর্শী গঙ্গাকিশোর ছ'খানি কাঠখোদাই ও ধাতুখোদাই ছবি দিয়ে এই সমস্যার সমাধান করলেন। খোদাই-শিল্পী হলেন রামচাঁদ রায়। বইয়ের বিজ্ঞাপন দেওয়া হ'ল ছবির কথা উল্লেখ ক'রে :

"অন্নদা মঙ্গল ও বিদ্যা সুন্দর পুস্তক ... ... উত্তম বাঙ্গলা অক্ষরে ছাপা হইতেছে পুস্তকের প্রতি উপক্ষণে এক ২ প্রতিমূর্ত্তি থাকিবেক।"

গঙ্গাকিশোরের পথ আরও অনেকে অনুসরণ করলেন। বই সচিত্র না হ'লে বটতলার বই বলেই যেন মনে হয় না। শুধু বই নয়, কতকটা যেন পাল্লা দিয়েই 'পঞ্জিকা' ছাপা আরম্ভ হ'ল। পীতাম্বর সেনের যন্ত্রালয়ের পঞ্জিকা, চোরবাগানের মল্লিকদের প্রেসের পঞ্জিকা, চন্দ্রিকা যন্ত্রের পঞ্জিকা, বিশ্বনাথ দেবের প্রেসের পঞ্জিকা, এইরকম আরও অনেক পঞ্জিকা ছাপা শুরু হ'ল। সবই পঞ্জিকা, সুতরাং তার মধ্যে বৈচিত্র্য ও বিশেষত্ব না থাকলে চলবে কেন? পাঁজির আবার বিশেষত্ব কি? তিথি-নক্ষত্র গণনার ও দেব-দেবীর ছবির, দু'য়েরই বিশেষত্ব পাঁজিতে থাকতে পারে। একেবারে রাশিচক্র থেকে দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, অন্নপূর্ণা, কার্তিক, গণেশ, কালী, ভাইফোঁটা ইত্যাদির ছবির মধ্যেও বৈচিত্র্য থাকতে বাধা নেই। অতএব পণ্ডিত ও খোদাই-শিল্পীরা প্রকাশকদের হয়ে পাল্লা দিতে লাগলেন। কাঠখোদাই ও ধাতুখোদাই ছবিতে পঞ্জিকার পৃষ্ঠা ক্রমে ভরে গেল! বটতলার ছবি অমর হয়ে রইল পাঁজির পৃষ্ঠায়। দুর্গা,

লক্ষ্মী, সরস্বতী ইত্যাদি দেব-দেবীর মূর্তির কত পরিবর্তন হ'ল পটুয়ার হাতে, কিন্তু পঞ্জিকার পৃষ্ঠায় আজও সেই সব দেব-দেবী বটতলার খোদাই-শিল্পীর অক্ষয় কীর্তিস্বরূপ রয়ে গেছেন।

* * *

এছাড়া, বটতলার শিল্পীদের সঙ্গে এই সময় ইয়োরোপের গ্রীণউডতলার খোদাই-শিল্পীরাও যোগ দিয়েছিলেন। কলকাতা শহরে বৃটিশ, ফরাসী, ডাচ শিল্পীরা তখন এসেছিলেন এদেশের জন্তুজানোয়ার, লোকজন, গাছপালা ও সাহেব-নবাবদের ছবি আঁকার জন্য। তাঁদের মধ্যে খোদাই-শিল্পীর সংখ্যাও কম ছিল না। বট-তলার শিল্পীদের সঙ্গে এই বিলাতী শিল্পীদের যেভাবেই হোক একটা যোগাযোগ যে হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কে কার শিক্ষক ছিলেন বা কার কাছে শিক্ষানবীশী করেছেন, তা সঠিক বলা যায় না। এইটুকু বলা যায় যে, একটা লেনদেন উভয়ের মধ্যেই হয়েছে। ধাতুখোদাইয়ের নতুন রীতিনীতি হয়ত এদেশী শিল্পীরা কিছুটা আবার বিদেশীদের কাছ থেকে শিখেছিলেন। সে যাই হোক, এই ইয়োরোপীয় শিল্পীরা কেবল যে ছবি আঁকতেন তা নয়। আমাদের দেশে লিথোগ্রাফি বা পাথরে ছাপার প্রচলন এঁদের চেষ্টাতেই প্রথম হয়। ১৮২০-২২ সালের মধ্যেই কলকাতায় লিথো-গ্রাফিক প্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮২২ সালে "ক্যালকাটা জার্নালের" (২৬শে সেপ্টেম্বর) এক সংবাদ থেকে জানা যায় যে, মঁশিয়ে বেল্নস (Belons) ও মঁশিয়ে শ্যাভিঘাঁক (Shavighnac) নামে দু'জন ফরাসী শিল্পীর চেষ্টায় কলকাতা শহরে লিথোগ্রাফিক প্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বেল্নস নামে আর একজন মহিলা শিল্পী এদেশের সামাজিক চিত্রও অনেক এঁকেছিলেন। ইনি বোধ হয় মাদাম বেলনস, স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই শিল্পী।

লিথোগ্রাফিক প্রেস প্রতিষ্ঠার পর রীতিমত ছবির বইও ছাপা হ'তে থাকে। এ সম্বন্ধে একটি চমকপ্রদ খবর ১৮২৯ সালের ২৬শে ডিসেম্বর "সমাচার দর্পণ" পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ঃ

"...চিত্রবিদ্যা বিষয়ক যাহা সর্বজনগ্রাহ বিশেষতঃ এতদ্দেশে শ্রীশ্রীপ্রতিমার প্রতিমূর্তি চিত্র করিতে ও গৃহে রাখিতে সকলের অভিলাষ হয় কিন্তু চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিবার কোন উপায় এদেশে না থাকাতে অনেকের তাহাতে মনোযোগ নাই এবং পটুয়া আদি যাহারা জানে তাহারাও উত্তমরূপে পারে না এ প্রযুক্ত চিত্রবিদ্যা সর্বজন

শিক্ষার নিমিত্ত ইঙ্গরেজী উত্তম চিত্রাভিজ্ঞ সকলের মত গৌড়ীয় ভাষার সঙ্কলন করিয়া ও চিত্র আদর্শ নিমিত্ত মনুষ্য ও পশ্বাদির ছবি ১৫ খান পরিমাণ বিশেষ করিয়া এক গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে...”

ইয়োরোপীয় শিল্পীদের আঁকা ও ছাপা এই সব বই যে এদেশের শিল্পীদের মনের উপর কোন রেখাপাত করেনি, তা নয়। নিশ্চয় করেছে। লোকজন, জন্তু-জানোয়ারের মূর্তির উপর, অঙ্কন-রীতির উপর তার প্রভাব নিশ্চয় পড়েছে। বেশ বোঝা যায়, কলকাতা শহরে তখন খোদাই-শিল্পী ও পটুয়া শিল্পীরাই বেশী থাকতেন। খোদাই-শিল্পীদের বাজার বটতলার সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জমে উঠলো, বটতলাতেই তাঁরা শিল্পচর্চা করতে লাগলেন। আর পটুয়া-শিল্পীরা ছিলেন কালীঘাটের মন্দিরের কাছাকাছি, তাঁরা প্রধানত তীর্থযাত্রীদের জন্য পট আঁকতেন। কলকাতার নবাগত ইয়োরোপীয় শিল্পীদের সঙ্গে শুধু যে বটতলারই যোগাযোগ হ'ল তা নয়, বটতলা থেকে কালীঘাটের পটুয়াপাড়া পর্যন্ত তার বিস্তার হ'ল। সেকথা কালীঘাটের পটুয়াদের ছবি প্রসঙ্গে বলেছি।

বটতলা ও বটতলার সাহিত্যকে কেন্দ্র ক'রে যেসব বাঙালী খোদাই-শিল্পীর আবির্ভাব হয়েছিল তাঁদের মধ্যে রামচাঁদ রায়, বিশ্বম্ভর আচার্য, রামধন স্বর্ণকার, মাধবচন্দ্র দাস, রূপচাঁদ আচার্য, রামসাগর চক্রবর্তী, বীরচন্দ্র দত্ত প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কলকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির দ্বিতীয়-বার্ষিক বিবরণে (১৮১৮-'১৯ সাল) শিল্পী কাশীনাথ মিস্ত্রীর দক্ষতা ও কারিগরির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৮২০ সালের (সেপ্টেম্বর) ‘‘ফ্রেন্ড অফ্ ইণ্ডিয়া’’ পত্রিকায় জোড়াসাঁকো নিবাসী শিল্পী হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলাকুশলতার উচ্চ প্রশংসা করা হয়েছে। বটতলার শিল্পীরা শুধু বটতলার বাবুদের সাময়িক রুচির খোরাক যোগাননি। তাঁরা যে তখনকার শিক্ষিত সমঝদারশ্রেণীর কাছেও বাহবা পেয়েছিলেন, সেটা কম কৃতিত্বের কথা নয়। বটতলার ছবিতে হয়ত নূতনত্ব কিছু নেই, কারিগরিটাও তার অনেকটা অন্ধ অভ্যাস-গত যান্ত্রিক কারিগরি। বটতলার ছবি সব ফ্রেমে-আঁটা খাঁচায় বন্দী ছবি, তার প্রাণ নেই, প্রসার নেই। না থাক, তবু ছবির ইতিহাসে তার মূল্য আছে। বিশেষ ক'রে কলকাতার বিদেশী শিল্পীদের ছবির সঙ্গে বটতলার ছবির এবং বটতলার ছবির সঙ্গে কালীঘাটের

পটুয়াদের ছবির কথা ভাবলে, তার মূল্য স্বীকার না ক'রে উপায় নেই। বটতলার ছবির আজ কদর না থাকলেও, তার মূল্য আজও রয়েছে দেখা যাচ্ছে। বটতলাতে তো আছেই, স্কুলের অনেক পাঠ্য-পুস্তকে এবং পঞ্জিকার পাতায় বটতলার ছবি আজও বিরাজমান। অথচ বটতলার যুগ কবে কেটে গেছে তার ঠিক নেই এবং বটতলার সাহিত্য বা বটতলার ছবি বলতে আমাদের অশ্রদ্ধারও সীমা নেই!!

বটতলার থিয়েটার

এলতলা বেলতলা থেকে সমস্ত গাছতলা ঘুরে শেষকালে যেন বটতলার সাগরসঙ্গমে কলকাতার সংস্কৃতিগঙ্গার গতিধারার স্বাভাবিক পরিণতি হ'ল। বাংলা ছাপাখানা ও ছাপা সাহিত্যের তাই হয়েছিল। কবি আখড়াই খেউড় হাফ্‌-আখড়াইও বাঁধা বটতলার বুকে যেরকম সুললিত কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছিল, সেরকম আর কোন বেলতলায় বা পিপুলতলায় হয়নি। কলকাতা কালচারের আদিপর্বে সুতানুটির স্বাভাবিক টান ছিল অত্যন্ত বেশী। সেই টানে কলকাতার থিয়েটারও ঐদিকে এগিয়ে গেছে এবং বটতলার বুকে তার বিকাশ হয়েছে।

কবি খেউড় আখড়াই, বাইনাচ ভাঁড়নাচ ইত্যাদি বাৎসরিক পূজাপার্বণে উৎসব-অনুষ্ঠানে বাবুদের হলঘরে ও নাচঘরে ক্রমে আধা-থিয়েটারের রূপ নিয়েছে। রাসলীলায়, রথযাত্রায়, দোলযাত্রায় ও দুর্গোৎসবে এই সব নাচগানের আসর সরগরম হয়ে উঠেছে। প্রেরণাটা প্রধানত এসেছে কৃষ্ণনগর থেকে। নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের উৎসব অনুষ্ঠানই হ'ল তার আদর্শ। বৃটিশ আমলের বাঙালী বড়লোকেরা কলকাতার উৎসবাদিতে অপরিমিত ব্যয় করতে থাকেন অনেকটা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অনুকরণে। শোভাবাজারের রাজবাড়ী, ঠাকুরবাড়ী, সিংহবাড়ী, মল্লিক-বাড়ী, দে-সরকারদের বাড়ী, ভূকৈলাস বাড়ীতে তখন পাল্লা দিয়ে পুজো বিয়ে শ্রাদ্ধ গৃহ-প্রবেশ ইত্যাদি হ'ত। এই সব মহাবাবুদের বাড়ীর বৈঠকখানা, বাগানবাড়ী, হলঘর, পূজামণ্ডপ, নাচঘর এইভাবে প্রায় রঙ্গালয় হয়ে উঠলো। ১৮২৩ সালে দ্বারকানাথ ঠাকুর যে গৃহপ্রবেশের উৎসব করেন তাতে দেশী গান ও ইংরেজী বাদ্য-নৃত্য হয়। কলকাতার সমস্ত সম্ভ্রান্ত সাহেব ও বাঙালীরা উপস্থিত থাকেন। নৃত্যগীতাদির শেষে ভাঁড়েরা সং সেজে আমোদ করেন এবং তার মধ্যে একজন গরুর

বেশ ধারণ ক'রে হাম্বা-হাম্বা রব ক'রে যখন ঘাস চর্বণ করতে থাকেন, তখন উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এই ভাঁড়ামিকে আমরা আধুনিক রঙ্গালয়ের প্রসববেদনা বলতে পারি। যাত্রাগানের যুগের "সভামণ্ডপ" ও "রঙ্গভূমি" দুইই তখন বাবু-দের হলঘরে ও নাচঘরে স্থানান্তরিত হয়েছে। সখের নাট্যশালা ও রঙ্গালয় তারই একটা পল্লবিত রূপ ছাড়া কিছু নয়।

কৃষ্ণনগরের ঢেউ কলকাতায় এসেছিল, আগে বলেছি। অস্ত-মিত নদীয়া-কালচারের সঙ্গে উদীয়মান কলকাতা-কালচারের এক বিচিত্র সংমিশ্রণ হয়েছিল। দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের রচনা থেকে কৃষ্ণনগরের কোর্ট-কালচারের একটু আভাস দিচ্ছি ঃ "এক রাত্রিতে রাজবাটীতে এক অপূর্ব রূপসী ও অসাধারণ সুকণ্ঠা তয়ফাওয়ালীর নৃত্যগীতে সকলেই বিমোহিত হইলেন। কেহ প্রস্তাব করিলেন যে, এই রমণী সুন্দর খেমটা নাচিতে পারে। তখন সুরাপানে সকলেরই হৃদয় প্রফুল্ল ছিল; সুতরাং ঐ সুন্দরী যখন পেশোয়াজ ছাড়িয়া একখানি কালাপেড়ে সূক্ষ্ম ধুতি পরিয়া গৃহে প্রবেশ করিল, যেন স্বর্গবিদ্যাধরী অবতীর্ণা হইলেন দর্শকবৃন্দের ঢুলু ঢুলু নয়নে এইরূপ দৃষ্ট হইল। নিমন্ত্রিত মহাশয়দিগের মধ্যে কি প্রধান, কি বিজ্ঞ, কি পদস্থ প্রায় সকলেই তাহার নৃত্যে বিমোহিত হইলেন। প্রথমে কয়েক অবিজ্ঞ যুবা আপন আপন চরণ নিজ বশে রাখিতে পারিলেন না। তাঁহারা ঐ সঙ্গে নৃত্য আরম্ভ করিলেন! প্রাচীন ও পদস্থ একজনও দণ্ডায়মান হইলেন। এক বিজ্ঞবর প্রথমাবধি গম্ভীরভাবে ছিলেন, তাঁহার পদ শেষে অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি উক্ত প্রাচীনকে নাচাইবার ছলে আপনি নাচিতে লাগিলেন।" এর পর শোভাবাজারের রাজবাড়ীর দুর্গোৎসবের একটু বর্ণনা না দিলে কলকাতা ও কৃষ্ণনগরের "কালচারাল ক্যামারা-দেরির" স্বরূপ বোঝা যাবে না। প্রত্যক্ষদর্শী পাদ্রি ওয়ার্ড সাহেবের বিবরণ থেকে তুলে দিচ্ছি। পাদরি ওয়ার্ড লিখছেন ঃ "১৮০৬ সালে শোভাবাজারের রাজবাড়ীর দুর্গোৎসবে আমি উপ-স্থিত ছিলাম। চার মহল প্রাসাদের মাঝখানে উৎসব-প্রাঙ্গণ, সামনে পূজামণ্ডপ। পূর্বদিকের একখানা ঘরে মদ ও সাহেবী-খানার আয়োজন, আমন্ত্রিত সাহেবসুবোদের জন্য। ঘরের সামনে জন দুই পর্তুগীজ খানসামা অভ্যর্থনার জন্য মোতায়েন রয়েছে। ঠিক তার উল্টোদিকে পূজামণ্ডপে প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত। দুই পাশের

ঘরে আমন্ত্রিত এদেশী অতিথিরা উপস্থিত রয়েছেন। মধ্যে হিন্দু নর্তকীদের নৃত্যগীত চলছে, চারিদিক ঘিরে সাহেব অতিথিরা কৌচে ব'সে তন্ময় হয়ে দেখছেন। মধ্যে মধ্যে মুসলমান বাইজীরা হিন্দুস্থানী গান গেয়ে, বিসদৃশ অঙ্গভঙ্গী ও রঙ্গতামাসা ক'রে সকলকে আপ্যায়ন করছে। রাত দু'টো আন্দাজ বাইজী ও নাচওয়ালীরা চলে গেল, সাহেব অতিথিরাও সকলে চলে গেলেন, কেবল আমরা কয়েকজন রইলাম। পূজামণ্ডপের আলো ছাড়া আর সব আলো নিভে গেল। বাইরের দরজা খুলে দেওয়া হ'ল। তখন হুড়মুড় ক'রে একদল লোক ভিতরে ঢুকল, বিচিত্র তাদের পোশাক, হাবভাব, মাথায় লম্বা লম্বা পাউরুটির মতন টুপি। অশ্লীল গান গেয়ে, নৃত্য ও অঙ্গভঙ্গী ক'রে তারা আমোদ করতে লাগল। এরকম বীভৎস দৃশ্য আমি জীবনে কখনও দেখিনি, বিশেষ ক'রে পূজামণ্ডপে যে এইরকম খিস্তিখেউড় ও বেল্লেলাগিরি চলতে পারে তা আমার কল্পনাতীত ছিল...।”

নৃত্যগীত, রঙ্গ ও ভঙ্গিমা, যা নিয়ে রঙ্গাভিনয়, শেষ পর্যন্ত এই হ'ল তার পরিণতি। রঙ্গালয়ের আগের কথা। কবিগান ও যাত্রাগানেরও রূপ বদলাতে লাগল। ইংরেজদের থিয়েটারে এবং বড়বাবুদের নাচঘরে ও পূজামণ্ডপে তার ককটেল-রূপ দেখে এদেশী যাত্রা ও কবিগান চরম বিকৃতির পঙ্ককুণ্ডে হাবুডুবু খেয়ে বিলুপ্তির পথে এগিয়ে গেল। কত শত এদেশী লোকপ্রতিভা, কবি ও শিল্পী যে কলকাতার হঠাৎ-বড়লোকদের নব্য ক্যালকাটা-কালচারের তীব্র ঝাঁঝ সহ্য করতে না পেরে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, তার ঠিক নেই। **শুধু বাংলার পটুয়ারাই যে কালীঘাটে এসে তাদের কবর রচনা করেছে তাই নয়। বাংলার শত শত লোককবি ও শিল্পী শোভাবাজারে, চোরবাগানে, পাথুরিয়াঘাটায় ও বটতলায় এসে অকাল-অপমৃত্যু বরণ করেছে। তাদের কোন ইতিহাস লেখা নেই।** নিকী বাইজীদের হাজার টাকা মাইনে হ'ল, ইংরেজদের থিয়েটারের অধ্যক্ষ, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা উচ্চ বেতনে অভিনয়-শিক্ষক নিযুক্ত হলেন এবং শিশুরাম, গোবিন্দ, পরমানন্দ, বদন, কৃষ্ণকমল, প্রেমানন্দ অধিকারী ও গোপাল উড়েদের বংশধরেরা একেবারে উচ্ছন্নে গেল।

যাত্রার রূপ বদলাচ্ছিল দ্রুতগতিতে। কৃষ্ণযাত্রা ও বিদ্যাসুন্দর যাত্রার রূপ ঢেলে সাজা হচ্ছিল। আদিরস ও ভাঁড়ামির মাত্রাধিক্যে যাত্রাগান যে-পরিমাণ গেঁজিয়ে উঠেছিল তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

শিক্ষিত বাবুরাই নতুন নতুন যাত্রার দলের অধিকারী হচ্ছিলেন। গোপাল উড়ে ও বদন অধিকারীদের পসার ক'মে যাচ্ছিল। ইংরেজদের থিয়েটার থেকে দেশী যাত্রাগানে স্ত্রীলোক অভিনেত্রীর আবির্ভাব হ'ল। জোড়াসাঁকোর রামচাঁদ মুখুজ্জে যে "নন্দবিদায়" যাত্রা করলেন, তাতে ত্রয়োদশী ছিদামের নাচগানে সকলে মোহিত হয়ে গেল। গোপাল উড়েরা টেক্কা দিতে পারল না বাবুদের যাত্রার দলের সঙ্গে। এমন কি বিদ্যাসুন্দর-যাত্রার মধ্যে যথেষ্ট আদিরসের মাত্রা চড়িয়েও না। বাবুদের মন উঠল না তাতে। কেন উঠল না, তা এদেশী যাত্রার অধিকারীরা বুঝেও বুঝতে পারলেন না। রুশ ব্যবসায়ী লেবেডেফ বুঝতে পেরেছিলেন। তাই ১৭৯৫ সালে লেবেডেফ যে রঙ্গাভিনয়ের আয়োজন করেন তাতে বাঙালী গোলকনাথ দাসের সাহায্যে ইংরেজী নাটক বাংলায় অনুবাদ করান, বিদ্যাসুন্দরের গান ইংরেজী সুরে রচনা করেন এবং এদেশী স্ত্রীলোকদেরও অভিনয়ের জন্য সংগ্রহ করেন। লেবেডেফ যা করতে পারলেন, শিশুরাম অধিকারীর শিষ্য-প্রশিষ্যরা তা পারলেন না।

*　　　*　　　*

বিদ্যাসুন্দর-যাত্রার স্বর্ণযুগ তখন, তার সমাদরও তখন সবচেয়ে বেশী। রুশবাসী লেবেডেফ পর্যন্ত তা বুঝতে পেরেছিলেন, তাই ডোমতলায় তিনি যে রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করেন, সেখানে বিদ্যাসুন্দরও গীত হয়। কিন্তু—

সুন্দরীর করে ধরি　　সুন্দর বিনয় করি
কহে শুন শুন প্রাণেশ্বরি।
আজি দিনে দুপ্রহরে　　দেখিলাম সরোবরে
কমলিনী বান্ধিয়াছে করী॥

—এসব অভিনয় আর কিশোর বালকদের মুখে শুনে বাবুদের ভাল লাগে না। তাই সখের বিদ্যাসুন্দর-যাত্রায় স্ত্রীলোকের অভিনয় শুরু হ'ল।

শ্যামবাজারের নবীনচন্দ্র বসু এক নাট্যশালা স্থাপন ক'রে বিদ্যাসুন্দর নাটক অভিনয় করেন। নবীনবাবুর বাড়ীতেই এই অভিনয় হয়। ১৮৩৫ সালের কথা। শ্যামবাজারে আগে যেখানে ট্রাম কোম্পানীর আস্তাবল (ঘোড়ার ট্রামের আমলে) ছিল, সেখানে ছিল নবীনবাবুর বাড়ী। তখনও রঙ্গমঞ্চ বা দৃশ্যপট ইত্যাদির ব্যবস্থা হয়নি। নাটকের দৃশ্যাবলী বাড়ীর বিভিন্ন স্থানে প্রকৃত

সাজসজ্জাদি দিয়ে সাজানো হয়। একঘর থেকে অন্যঘরে মাটি খুঁড়ে সুড়ঙ্গ করা হয়। বীরসিংহের দরবার হয় নবীনবাবুর বৃহৎ বৈঠকখানায়। বকুলতলার পুষ্করিণীর দৃশ্য বাড়ীর উদ্যানের পুষ্করিণী তীরে সাজানো হয়। উদ্যানের একপাশে মালিনীর কুটীর তৈরী হয়। একস্থানে একদৃশ্যের অভিনয় দেখে অন্য স্থানে দৃশ্য দেখতে উঠে যেতেন দর্শকরা। প্রথম বিদ্যাসুন্দর অভিনয় এইভাবে দর্শকরা ছুটোছুটি ক'রে দেখেন। বিদ্যার ভূমিকায় ষোড়শবর্ষীয়া রাধামণি দাসী ও তার সখির ভূমিকায় রাজকুমারীর অভিনয়, অঙ্গভঙ্গী, নৃত্যগীত দেখে সকলেই মুগ্ধ হন। অভিনয়ের ব্যয়-নির্বাহার্থে নবীনবাবু প্রায় দুই লক্ষ টাকা খরচ করেন। তার জন্য "খাতাবাড়ী" নামে ইংরেজটোলার এক বাড়ী তাঁকে বিক্রী করতে হয়। এখন যে বাড়ীতে 'মিলিটারী এ্যাকাউণ্টস্'-এর অফিস, তাকেই সেকালের খাতাবাড়ী বলা হ'ত।

এইভাবে বাঙালীর উদ্‌যোগে প্রথম বাংলা নাটক অভিনয়ের সূত্রপাত হয়। ইংরেজী থিয়েটার ও যাত্রাগানের সংমিশ্রণে বাংলা রঙ্গাভিনয়ের এক নতুন ধারার প্রবর্তন হয়। বাঙালীর রঙ্গালয় তখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি, সাধারণ জাতীয় রঙ্গালয় তো নয়ই।

With fire in their eyes, and love on their lips,
And passion in each of their elegant skips,
As breathless as angels, as wicked as devils,
Performed at these highly indelicate revels.

—"Lays of Ind."

বাবুদের বাড়ী বাইনাচ আর ভাঁড়নাচ দেখে ইংরেজ কবি "দি নটি নাচ" কবিতা লিখে ফেললেন। নাচানাচির পর্বও ক্রমে শেষ হয়ে এল। সুপ্রীম কোর্টের মামলা-মোকদ্দমা ও পুজো-বিয়ে-অন্নপ্রাশন-শ্রাদ্ধে অপরিমিত ব্যয় ক'রে বাঙালী হঠাৎ-নবাবরা প্রায় নিলেমে ওঠার উপক্রম হলেন। তাছাড়া বাবুদের বংশলোচনদের কিঞ্চিৎ জ্ঞানবৃদ্ধিও হতে থাকল। ধনক্ষয়টা যে প্রায় বর্বরের মতন

১০

হচ্ছে, তা তাঁরা কিছু 'লেটে' হলেও শেষ পর্যন্ত বুঝলেন। রঙ্গালয়ের ইতিহাসের প্রথম একশ' বছর আমাদের সাবালক হতেই কেটে গেল।

গুণতে গেলে একশ' বছরই প্রায় বলতে হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে প্রায় ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত। ১৭৫৬ সালের কিছু আগে ইংরেজদের প্রথম থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতায়। সেই সময় থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত "দি চৌরঙ্গী থিয়েটার" "দি ক্যালকাটা থিয়েটার", "সাঁ সোচি থিয়েটার" ইত্যাদি একাধিক ইংরেজী রঙ্গালয় কলকাতায় স্থাপিত হয়। এই সময় অনেক ইংরেজ অভিনেতা অভিনেত্রী, মঞ্চাধ্যক্ষ ও প্রযোজক কলকাতায় আসেন এবং তাঁদের অভিনয় দেখে বাবুরা রঙ্গালয়ের দিকে আকৃষ্ট হন। তার থেকেই সৌখিন বাবুদের সখের থিয়েটারের উৎপত্তি হয় বলা চলে। বোধ হয় চৌরঙ্গী থিয়েটার (১৮১৩ খৃঃ—১৮৩৯ খৃঃ), ক্যালকাটা থিয়েটার ও সাঁ সোচি থিয়েটারের প্রভাবেই বাঙালী বড়বাবুরা সখের নাট্যশালা খুলতে অনুপ্রাণিত হন। বাঙালী প্রতিষ্ঠিত প্রথম থিয়েটার হ'ল প্রসন্নকুমার ঠাকুরের "হিন্দু থিয়েটার" (১৮৩১ সাল) এবং তাতে প্রথম অভিনয় হয় সেক্সপীয়রের "জুলিয়াস সীজারের" অংশ ও উইলসন অনূদিত ভবভূতির "উত্তররামচরিত"। অভিনয় দেখে একজন "সমাচার চন্দ্রিকা" পত্রিকায় বেশ একখানি মজার চিঠি লেখেন। তাঁর চিঠির বক্তব্য আমি কিঞ্চিৎ মার্জিত ভাষায় বলছি ঃ

> রাঢ়দেশের ক্ষুদ্রলোকের সন্তানেরা কালীয়দমন, রামযাত্রা কৃষ্ণযাত্রা, চণ্ডীযাত্রা ইত্যাদি করত। এখন ভদ্রলোকের সন্তানেরা ঐ ব্যবসা আরম্ভ করলেন। সুখের কথা এঁরা ধনীর সন্তান, প্রতি পদে এঁদের পেলা দিতে হবে না। যাত্রার ছোকরারা সর্বদাই টাকা-পয়সা চাইত, পয়সা সিকি আধুলি না পেলে দর্শকদের কাছে এসে নানারকমের রঙ্গভঙ্গী করত। নিস্তার পাবার জন্য কিছু তাদের দিতেই হ'ত। এখন আর সে আপদ রইল না। ধনীর দুলালরা নিজেদের অর্থ ব্যয় ক'রে নানারকমের বেশভূষা প্রস্তুত করেছেন। ইংরেজ শিক্ষক রেখে অভিনয় অভ্যাস করছেন। আমাদের দেশীয় অধিকারীরা কেবল একরকম বেশ ক'রে অভিনয় করেন। থরকাটা প্রেমচাঁদ অধিকারী শুধু কতকগুলি বাইআনা বেশের সৃষ্টি করেছেন। তার চেয়ে

ইংরেজ অধিকারীদের বেশভূষার সজ্জা হাজার গুণ ভাল। যেমন সং, তেমনি অভিনয় এবং ঠিক অবিকল সেই রকম পোষাক।

এই চিঠির উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। ইংরেজদের থিয়েটার থেকেই বাঙালীবাবুরা সখের থিয়েটারের প্রেরণা পান এবং ইংরেজ অধিকারীর তালিমেই বাঙালীর সখের থিয়েটার গজিয়ে ওঠে। শিল্প-বাণিজ্য যেমন একটা বিশেষ অঞ্চলকে কেন্দ্র ক'রে গ'ড়ে ওঠে, থিয়েটারও তেমনি গ'ড়ে উঠেছে কলকাতা শহরে। প্রথম যুগের রঙ্গালয়-কেন্দ্র ছিল চৌরঙ্গী-পার্ক ষ্ট্রীট থেকে চীনাবাজার-লালবাজার পর্যন্ত। সেটা ইংরেজী থিয়েটারের যুগ এবং চৌরঙ্গী থেকে চীনাবাজারের মধ্যেই প্রধানত তখন ইংরেজরা বাস করতেন। সখের থিয়েটারের যুগে কলকাতার থিয়েটার-অঞ্চল ক্রমে উত্তর দিকে স্থানান্তরিত হতে থাকে, কারণ কলকাতার সৌখিন বড়বাবুদের প্রধান বসবাসকেন্দ্র উত্তর কলকাতা। সখের থিয়েটার থেকে সাধারণ রঙ্গালয় পর্যন্ত থিয়েটারের অগ্রগতি উত্তর কলকাতাতেই হয়। সেই থেকে আজ পর্যন্ত উত্তর কলকাতা-ই শহরের প্রধান রঙ্গালয়-কেন্দ্র হয়ে আছে। দক্ষিণ কলকাতার থিয়েটার শুধু যে ভাল চলে না তা নয়, যেন ভাল মানায়ও না। উত্তর কলকাতার কালচার প্রথম ইংরেজযুগের ও শেষ নবাবী আমলের বড়লোক বাঙালীর কালচার; দক্ষিণ কলকাতার কালচার তার পরবর্তী যুগের ইংরেজী-শিক্ষিত চাকুরীজীবী বাঙালী মধ্যবিত্তের কালচার। তাই দক্ষিণ কলকাতায় "থিয়েট্রিকাল পার্টি" ও "ড্রামাটিক ক্লাব" পর্যন্ত বিকাশ সম্ভব হয়েছে, উত্তর কলকাতার মতন সখের নাট্যশালা থেকে সাধারণ রঙ্গালয় পর্যন্ত থিয়েটারের বিকাশ বা পরিণতি সম্ভব হয়নি।

*　　　*　　　*

বাঙালীর নতুন থিয়েটার ক্রমেই সেই বটতলাভিমুখী হ'ল। এলতলা বেলতলা থেকে সেই বটতলা। ছাত্ররাও ইংরেজী অভিনয় আরম্ভ করল, সেক্সপীয়রের নাটক। ১৮৫১ সালে বটতলার "ডেভিড হেয়ার একাডেমী" প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৮৫৩ সালে তার ছাত্ররা সেক্সপীয়রের "মার্চেন্ট অফ্ ভেনিস" অভিনয় করে। দেখাদেখি "ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর" ছাত্ররাও অভিনয় করতে আরম্ভ করে—ঐ সেক্সপীয়রের নাটক এবং ঐ বটতলায়। বাঁধা বটতলার পাশে এক বৃহৎ বাড়ীতে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী ছিল এবং সেই বাড়ীতে ছাত্ররা ওথেলো অভিনয় করে। কলকাতা মাদ্রাসার ইংরেজী বিভাগের

প্রধান শিক্ষক, সাঁ সোচি থিয়েটারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মিঃ ক্লিঙ্গার ছাত্রদের অভিনয় শিক্ষা দেন। স্কুলের ছাত্রদের এই নাট্যশালা পরে পূর্ণাঙ্গ নাট্যশালায় পরিণত হয়—নাম হয় "ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার"। মিঃ ক্লিঙ্গার ছাড়াও, এলিস নামে এক ইংরেজ মহিলা এখানে অভিনয় শিক্ষা দেন। গড়ের মাঠের কাছে কোথাও এলিসের একটি রঙ্গালয় ছিল বলে মনে হয়, কারণ "সংবাদ প্রভাকর" থেকে জানা যায় যে, "মিস্ ইলিসের গড়ের মাঠের নৃত্যাগার পবনঠাকুরের কৃপায় পতিত হইয়াছে" (১৮৫১, ২৬শে এপ্রিল)। চৌরঙ্গী ও চীনাবাজারের ইংরেজ অধিকারীরা কিভাবে বটতলায় এসে বাঙালী থিয়েটারের অধিকারী ও অভিনেতাদের তালিম দিয়েছিলেন, তা এর থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়। ইংরেজী অভিনয়ে বাঙালীরা যেন প্রথমে খানিকটা রিহার্সাল দিয়ে নিলেন, তারপর বাংলা অভিনয় আরম্ভ হ'ল। প্রথমে ইংরেজী শিখে পরে বাংলা শেখা, অথবা প্রথমে ইংলণ্ডের ইতিহাস মুখস্থ ক'রে পরে বাংলার ইতিহাস পড়ার মতন যেন থিয়েটারের ব্যাপারটাও অনেকটা হ'ল। সেক্সপীয়রের নাটক অভিনয় ক'রে এবং সংস্কৃত নাটক ইংরেজীতে তর্জমা ক'রে বাঙালীর নবযুগের থিয়েটারের সূত্রপাত হ'ল। অভিনয়ের দীক্ষাগুরু হলেন ইংরেজরা। যাত্রার যুগের গোপাল উড়ে বা বদন অধিকারীর বদলে থিয়েটারের যুগে ক্লিঙ্গার, এলিস, রবার্টস, পার্কার প্রমুখ ইংরেজরাই অধিকারী হলেন। বাঁধা বটতলার আশেপাশে ইংরেজ অধিকারী ও অভিনেতার সযত্ন তালিমে বাঙালীর থিয়েটার আরম্ভ হ'ল, অবশ্য ইংরেজী থিয়েটার প্রধানত।

তারপর এল বাংলা নাট্যাভিনয়ের যুগ। সেই বটতলারই আশেপাশে তার মহড়া চলতে লাগল। লেবেডেফ অবশ্য ১৭৯৫ সালে প্রথম বাংলা নাট্যশালা করার চেষ্টা করেন, কিন্তু পণ্ডিত গোলকনাথ দাসের সাহায্য নিয়ে বা স্ত্রীলোক অভিনেত্রী জুটিয়েও তার চেষ্টা সার্থক হয়নি। তার কারণ বাংলা "বিদ্যাসুন্দরের" ইংরেজী সুর রচনা, এবং ইংরেজী "ডিজগাইজের" বাংলা তর্জমা, কোনটাই আসল বাংলা অভিনয় নয়। সংস্কৃত নাটক বাংলায় রূপান্তরিত ক'রে বাংলা নাটকের অভিনয় শুরু হয় ১৮৫৭ সালে—সিমলায় সাতুবাবুর বাড়ীতে। তার অল্পদিন পরে ১৮৫৭ সালেই চড়কডাঙ্গায় রামজয় বসাকের বাড়ীতে প্রথম বাংলা সামাজিক নাটক "কুলীনকুলসর্বস্বের" অভিনয় হয়। এই অভিনয়ে মহেন্দ্রনাথ

মুখোপাধ্যায় কুলাচার্য সেজেছিলেন। চড়কডাঙ্গা রোডে (বর্তমানে টেগোর কাসল রোড) রামজয় বসাকের বাড়ীর উঠানে স্টেজ বাঁধা হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানীর এজেণ্টের অফিসের বড়বাবু রাজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত করেন। রাজেনবাবু ও জগৎদুর্লভবাবু দিব্যি ভুঁড়ি নিয়ে মাথায় লম্বা টিকি ঝুলিয়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সাজেন। রাজেনবাবুর হাতে একটি শামুকের নস্যাধারও ছিল। তাঁরা দু'জনে যখন তর্কাতর্কি করতেন তখন শ্রোতারা হেসে গড়াগড়ি যেত। পরে বড়বাজারের গদাধর শেঠের বাড়ী এই নাটকের আরও অভিনয় হয়। অভিনয় দেখে উৎফুল্ল হয়ে একজন "সভ্যতাপথের পথিক" 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় লেখেন (১৮৫৮, ২৫শে মার্চ) ঃ

বঙ্গদেশে আজকাল বড় ধুমধাম।
যেথা সেথা শুনা যায় অভিনয় নাম॥
বঙ্গদেশে রঙ্গবিদ্যা হোতেছে প্রকাশ।
সকলে উৎসাহ করে এই মম আশ॥
নাটক লইয়া সবে রঙ্গরসে থাক।
কালিদাস হোয়ে সবে কালীনাম ডাক॥

ক্রমে বেলগাছিয়া নাট্যশালা, বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ, পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গ নাট্যালয়, শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিকাল সোসাইটি, জোড়াসাঁকো নাট্যশালা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নাটুকে রামনারায়ণের পর মাইকেল মধুসূদন ও দীনবন্ধু মিত্রের মতন নাট্যপ্রতিভার আবির্ভাব হয়। বাংলা নাটক, বাংলা অভিনয় ও বাংলা থিয়েটারের দ্রুত বিকাশ হ'তে থাকে। এর মধ্যে অবশ্য নতুন রুচিসম্পন্ন শিক্ষিত বাঙালী দর্শকগোষ্ঠীও তৈরী হয়েছে এবং রঙ্গালয়ের প্রয়োজনীয়তাও তাঁরা বোধ করেছেন। কিন্তু প্রাইভেট রঙ্গালয়ে সেই প্রয়োজন মিটছে না। বাংলায় সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার সময় হয়েছে। ১৮৬০ সালে আহিরীটোলার রাধামাধব হালদার ও যোগীন্দ্রনাথ "দি ক্যালকাটা পাবলিক থিয়েটার" নাম দিয়ে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ হন। ব্যর্থ হলেও, সেটা সাময়িক, কারণ ক্ষেত্র তৈরী, অর্থাৎ বাংলা নাটক ও নাট্যকার তৈরী, বাঙালী অভিনেতা তৈরী এবং বাঙালী দর্শকরাও তৈরী। বাগবাজার এমেচার থিয়েটার দীনবন্ধুর নাটক অভিনয় শুরু করেন— "সধবার একাদশী", "লীলাবতী"। অভিনয়ের আশাতীত সাফল্যে

উৎসাহিত হয়ে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা চলতে থাকে। "নীলদর্পণ" নাটকের মহড়া আরম্ভ হয়। ১৮৭২ সালের কথা।

সেই বটতলা। ১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর। "কলিকাতা ন্যাশনাল থিয়েট্রিকাল সোসাইটি" নাম দিয়ে চিৎপুরে মধুসূদন সান্যালের বাড়ীর বাইরের উঠানে মঞ্চ বেঁধে "নীলদর্পণ" নাটকের অভিনয় হয়। এই হ'ল বাঙালীর সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রথম অভিনয়। চৌরঙ্গী ও চীনাবাজারে ছিল ইংরেজের থিয়েটার। বটতলায় প্রথম ইংরেজের তালিমে বাঙালীর সখের থিয়েটার আরম্ভ হ'ল, শুধু সৌখিন ধনী বাবুদের নয়, স্কুল কলেজের ছাত্রদেরও। বাঙালীর থিয়েটার, কিন্তু ইংরেজী অভিনয়। তারপর তৃতীয়পর্বে বটতলায় সাধারণ রঙ্গালয়ের বিকাশ হ'ল। **সার্থক হ'ল কলকাতার বটতলার জীবন। 'কলকাতা কালচারের' একটা বিরাট অধ্যায় জুড়ে রইল বটতলা। এতদিন পরে স্বতন্ত্র একটা "বটতলা কালচারের" যেন সার্থক পরিণতি হ'ল।**

বটতলার কবি

কালীঘাটে বাঙালী পটুয়ার শিল্পপ্রতিভা উন্মার্গগামী হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে, বটতলায় বিলুপ্ত হয়েছে বাঙালী স্বভাবকবির কাব্যপ্রতিভা। ইংরেজ আমলের বাঙালী হঠাৎ-রাজা ও হঠাৎ-বাবুদের প্রবর্তিত এক ধরনের বিকৃত 'কলকাতা কালচারের' ঘূর্ণাবর্তে সাধারণ বাঙালীর লোকপ্রতিভার অপমৃত্যু হয়েছে। আধুনিক কবিদের মতন বটতলায় তখন কোন বাঙালী কবিগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়নি। ইংরেজী বা ফরাসী সাহিত্যের সমাদরও তখন বিশেষ ছিল না এদেশে। আধুনিক শিক্ষাদীক্ষারও প্রসার হয়নি তেমন। মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্রের মতন কবিও তাঁরা নন। তাঁরা কবিয়াল। কবিতা রচনা করতেন এবং ঢোল কাঁসি বাজিয়ে সেই কবিতা আসরে গেয়ে বেড়াতেন। আসর বসত মাঠেঘাটে, হাটে-বাজারে, পূজাপার্বণে উৎসবে। কিন্তু সে হয়ত অতীত কোনকালে। গ্রামের সাধারণ লোক সেই কবিগান শুনে খুশী হয়ে দক্ষিণা ও পুরস্কার দিতেন এবং কবিয়ালরা তাতেই জীবনধারণ করতেন। রাজারাজড়া, জমিদারবাবুরাও বাড়ীতে ডেকে এনে তাঁদের গান শুনতেন। বর্ধমান, কৃষ্ণনগর, মুর্শিদাবাদ, কাশীমবাজার, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলী, চব্বিশ-পরগণা প্রভৃতি অঞ্চলে রাজা-মহারাজা ও ধনী জমিদার তখন যথেষ্ট ছিলেন। তাঁদের সখ ছিল, সম্পদও ছিল। সখ মেটাবার জন্য কবিয়ালদের প্রায় ডাক পড়ত। কবিগান গেয়ে কবিয়ালদেরও বেশ দু'মুঠো অন্ন জুটতো। নবাবী আমলের শেষে ছোটবড় একাধিক নবাবের চিত্তবিনোদন ক'রে কবি-গানের মধ্যে বিকৃতির লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এমন সময় কলকাতার নতুন বাঙালী রাজামহারাজা ও ধনীলোকরাও সখ মেটা-বার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন। কবিয়ালদের ডাক পড়ল কলকাতা শহরে। কলকাতাতে ও তার কাছাকাছি যাঁরা জন্মালেন তাঁরা বাঁধা বটতলার আশেপাশে রাজবাড়ী ও জমিদারবাড়ীতে আসর জমিয়ে

বসলেন। দেখাদেখি চব্বিশ-পরগণা, হুগলী, বর্ধমান, বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলের আরও অনেক কবিয়াল কলকাতামুখো রওয়ানা হলেন। কলকাতার বাবুদের বাড়ী কবিগান গেয়ে বেশ দু'পয়সা রোজগার করা যায়, তোয়াজে থাকা যায়, বাহবা পাওয়া যায়। কি হবে গ্রামে থেকে, গ্রামের ঘরে ঘরে, মেলায় মেলায় ঘুরে? গ্রাম ছেড়ে শহরে যাবার যুগ এসেছে। শহরের সর্বময় প্রাধান্যের যুগে গ্রাম্য কবির কোন সমাদর নেই। গ্রামের সাধারণ লোকের বাহবাও গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ। শহরের হাততালির মতন তার প্রতিধ্বনি দেশ-ব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে না। লোকে বলবে "কলকাতার কবিয়াল", বর্ধমান ও বীরভূমের কবিয়ালের চেয়ে তার খাতির বেশী, মূল্যও বেশী। কলকাতার শোভাবাজার রাজবাড়ীতে কবিগান গাইলে, কৃষ্ণনগর রাজবাড়ী থেকে ডাক পড়বে, বর্ধমানের মহারাজাও আমন্ত্রণ জানাবেন, কাশীমবাজার, মুর্শিদাবাদ থেকেও ডাক আসতে দেরী হবে না। সুতরাং কবিয়ালরা কলকাতার দিকে চললেন।

হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী ওরফে হরুঠাকুর কলকাতার সিমুলিয়াতেই জন্মেছিলেন (১৭৩৯ খৃঃ অব্দে), তাঁকে বাইরে থেকে আসতে হয়নি। কিন্তু আরও অনেক ঠাকুর, বৈরাগী, ফিরিঙ্গী, মোদক, বণিক কলকাতায় এসেছিলেন। ফরাসডাঙ্গা থেকে এসেছিলেন রাসু ও নৃসিংহ দুইভাই, কবিয়ালদের মধ্যে মাণিকজোড়। বর্ধমান জেলার অম্বিকা-কালনার কাছে সাতগেছে গ্রাম থেকে এসেছিলেন বিখ্যাত ভবানী বেণে। ফরাসডাঙ্গার কাছে গরিটি থেকে এসেছিলেন সুপ্রসিদ্ধ হেন্সম্যান আন্টনি ওরফে 'এন্টুনি ফিরিঙ্গী'। শাল্‌খে থেকে এসেছিলেন রামমোহন বসু ওরফে 'রাম বসু'। গুপ্তিপাড়া থেকে এসেছিলেন কবিয়াল-চূড়ামণি ভোলানাথ মোদক ওরফে 'ভোলা ময়রা'। চন্দননগর থেকে এসেছিলেন নিত্যানন্দ দাস ওরফে 'নিতাই বৈরাগী'। নিতাইয়ের দলে বারাসাত থেকে এসে যোগ দিয়েছিলেন বংশীধর, ধরণীধর প্রভৃতি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের লোক-প্রিয় কবিয়ালরা। বারাসাত মহকুমার দত্তপুকুর থেকে এসেছিলেন মধুসূদন সিংহ ওরফে 'মধু', মহেশকাণা ও ছাতু রায়ের সমসাময়িক বিখ্যাত কবিয়াল। হুগলি জেলার পিয়াসপাড়া থেকে এসেছিলেন বলাই বৈষ্ণব, একেবারে জাত-কবিয়ালের বংশ থেকে। প্রপিতামহ বংশীবদন, পিতামহ কৃষ্ণকমল, পিতা রামকমল রাঢ় অঞ্চলের প্রসিদ্ধ কবিয়াল ছিলেন।

ছবিতে উমাচরণ
কবিতে বংশীবদন।

সেই বংশীবদনের বংশধর বলাই বৈষ্ণব। উত্তর-রাঢ়, দক্ষিণ-রাঢ়, ২৪-পরগণা, নদীয়া প্রভৃতি অঞ্চল থেকে এইরকম আরও অনেক কবিয়াল এসেছিলেন কলকাতায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত তাঁরা কলকাতায় কবি-গানের আসর জাঁকিয়ে বসেছিলেন। বিশেষ লক্ষণীয় হ'ল, এই কবিয়ালদের অধিকাংশই তথাকথিত 'উচ্চবর্ণজাত' নন। পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, সদ্‌গোপ, মোদক, তন্তুবায় লোকসমাজ থেকেই তাঁদের আবির্ভাব হয়েছিল। বাংলার লোকশিল্প ও লোকসংস্কৃতির ধারক ও বাহক যাঁরা, তাঁরাই বাংলার স্বভাবকবি কবিয়াল। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ কবিয়াল যে ছিলেন না তা নয়, হরু ঠাকুর, রাম বসু তো নিশ্চয় ছিলেন। কিন্তু তাঁদের সংখ্যা বেশী ছিল না। কবিয়ালদের কবিত্ব পটুয়াদের পটুত্বের মতন বংশগত ও স্বভাবসিদ্ধ। 'প্রতিভা' ও 'মৌলিকতা' তাঁদেরও ছিল, তবে ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে মাজা-ঘষা প্রতিভা নয়, একেবারে খনিজাত কাঁচা প্রতিভা। অর্থগত বা শ্রেণী-গত গৌরবে সে-প্রতিভা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠার অবকাশ পায়নি। ধনী ও শিক্ষিত বাবুদের ফাঁকা বাহবা পেয়ে, কিছুদিন টবের ফুলের মতন তাঁদের বৈঠকখানা ও পূজামণ্ডপের শোভাবর্ধন ক'রে, বাঙালী লোককবিরা নীরবে লোকচক্ষুর অন্তরালে চ'লে গেছেন। আজও যাঁরা ২৪-পরগণা, হুগলি, বর্ধমান, বীরভূম অঞ্চলে কায়ক্লেশে বেঁচে আছেন এবং কবিগানের ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধ'রে রয়েছেন, কলকাতার আধুনিক কবিদের দিকে চেয়ে তাঁদের দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়া ভিন্ন উপায় নেই।

* * *

প্রত্যেক কবিয়ালের কথা বলা সম্ভব নয় এখানে, দু'একজন বিশিষ্ট প্রতিভাবানের কথা বলছি। হরু ঠাকুরের গুরু ছিলেন 'রঘু তাঁতী' বা রঘুনাথ দাস। গান লিখে তিনি গুরুকে দিয়ে সংশোধন করিয়ে নিতেন এবং সেগুলির ভনিতা গুরুর নামেই দিতেন। হরু ঠাকুরের অনেক গান রঘুনাথের নামে চলে। প্রধানত মহারাজা নবকৃষ্ণের রাজবাড়ীতেই হরু ঠাকুরের গান হ'ত পাল-পার্বণে। তাতেই তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে এবং বর্ধমান, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি রাজবাড়ী থেকে বায়না আসে। হরু ঠাকুরের প্রতিভার

একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। মহারাজা নবকৃষ্ণ পণ্ডিতমণ্ডলীর এক সভায় (শোভাবাজার রাজবাড়ীতে নিয়মিত এইরকম সভা হ'ত) একবার বলেন ঃ "আমার এই সমস্যাটি আপনারা পূরণ করে দিন-- 'বড়শী বিঁধিল যেন চাঁদে'।" পণ্ডিতরা তো ভেবেই আকুল-- "বড়শী বিঁধিল যেন চাঁদে" কি আবার! হরু ঠাকুরের ডাক পড়ল; তিনি তখন স্নানে যাচ্ছিলেন। সেই অবস্থায় ফিরে এলেন সভায় এবং সমস্যাটি এই ব'লে পূরণ ক'রে দিলেন—

একদিন শ্রীহরি মৃত্তিকা ভোজন করি,
ধূলায় পড়িয়া বড় কাঁদে।
রাণী অঙ্গুলি হেলায়ে ধীরে, মৃত্তিকা বাহির করে,
বড়শী বিঁধিল যেন চাঁদে।

আশ্চর্য কবিপ্রতিভা ছিল ভোলা ময়রার। গুপ্তিপাড়া থেকে বাগবাজারে এসে তিনি মিষ্টান্নের দোকান করেছিলেন ঃ

আমি ময়রা ভোলা, ভিঁয়াই খোলা,
বাগবাজারে রই।

বাল্যকালে গ্রাম্য পাঠশালায় কিছুদিন পড়ে, কলকাতায় এসে ভোলানাথ রামায়ণ মহাভারত গান, সংকীর্তন শুনে বেড়াতেন। অল্পবয়স থেকেই তিনি কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন। বালক বয়সে 'তাম্বূল' (পান) সম্বন্ধে তিনি একটি কবিতা লেখেন—

পানকে তাম্বূল বলে পর্ণ সাধুভাষা।
বরুজে বিরাজ করে, চাষার বড় আশা॥
বুড়ো বুড়ি ছেলেমেয়ে যুবক-যুবতী।
পান পেলে মন খুলে বাড়ায় পীরিতি॥
মোষের মত মুন্সীবাবু মসীর ন্যায় কালো।
পান খেয়ে ঠোঁট রাঙগায় চেহারাখানা ভালো॥
পূর্বজন্মের পুণ্যবলে পান খেতে পাই।
লক্ষ্মীছাড়া, বাসি মড়া, যার পানের কড়ি নাই॥

কবিয়ালদের মধ্যে ভোলা ময়রার মতন স্বাধীনচেতা আর কেউ ছিলেন কি না সন্দেহ। প্রত্যেকেরই এক একজন "পেট্রন" ছিলেন এবং তাঁদের মোসাহেবী ক'রেই তাঁদের চলতে হ'ত। ভোলানাথের কিছুরই বালাই ছিল না। একবার মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত জাড়া গ্রামে 'রায়' পদবিধারী এক ধনিক ব্রাহ্মণ জমিদারের বাড়ী কবিগান হয়। জাড়ার কাছে মাণিককুণ্ডু গ্রাম মুলোর জন্য বিখ্যাত।

ভোলা ময়রা ও যজ্ঞেশ্বর ধোপা জাড়ার জমিদারবাড়ী কবি গাইতে যান। খোশামুদে যজ্ঞেশ্বর জাড়ার জমিদারবাবুদের প্রশস্তি গেয়ে বলেন, 'জাড়া গ্রামটা ঠিক যেন গোলকবৃন্দাবন'। শুনে ভোলানাথ ক্রুদ্ধ হয়ে জবাব দিলেন—

কেমন ক'রে বললি জগা,
জাড়া গোলকবৃন্দাবন!
এখানে বামুন রাজা, চাষা প্রজা,
চৌদিকে তার বাঁশের বন॥
জগা! কোথা রে তোর শ্যামকুণ্ড,
কোথা রে তোর রাধাকুণ্ড
ঐ সামনে আছে মাণিককুণ্ড,
কোরগে মুলো দরশন।
কেমন ক'রে বললি জগা,
জাড়া গোলকবৃন্দাবন॥
ওরে বেটা, 'কবি' গাবি, পয়সা লবি,
খোশামদি কি কারণ ?
কেমন ক'রে বললি জগা,
জাড়া গোলক-বৃন্দাবন॥
পিঁপড়ে টিপে গুড় খায়,
মুফতের মধু অলি।
মাপ করো গো রায় বাবু,
দুটো সত্যি কথা বলি॥
জগা ধোপা খোশামুদে,
অধিক বলব কি।
তপ্ত ভাতে বেগুন পোড়া,
পান্তা ভাতে ঘি॥

ভোলার সৎসাহসের পরিচয় এই গান থেকেই পাওয়া যায়। যজ্ঞেশ্বরকে খোশামুদে বলেই ক্ষান্ত হননি, জমিদার রায়বাবুদের চরিত্রের উপর টিপ্পনিও কেটেছিলেন। ভোলার পরিচয় তার নিজের মুখেই শুনুন—

নহি কবি কালিদাস, বাগবাজারে করি বাস,
পুজো এলে পুরি মিঠাই ভাজি।

বসন্তের কুহু শুনে, ভক্তির চন্দন-সনে
মনঃফুল রামচরণে করি রাজি॥
তবে যদি কবি পাই, হ'টে কভু নাহি যাই,
হোক্ বেটা যতই মন্দ।
জাহাজ ডোঙ্গা সোলা নাও, যাহাতে মিলাইয়া দাও,
ভোলা নহে কিছুতেই জব্দ।

বাস্তবিকই ভোলানাথ কবির লড়াইয়ে হঠবার পাত্র ছিলেন না। তাঁর স্বাভাবিক কবিত্বশক্তি, রসবোধ, তীব্র শ্লেষ ও ব্যঙ্গবাণ, অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখে সকলেই মুগ্ধ হয়ে ভাবতেন, যে-লোকটা পুরি-মিঠাই ভাজে, কোনদিন ইংরেজী শেখেনি, চাকরী করেনি, মোসাহেবি করেনি, তার এমন কাব্যপ্রতিভা কোথা থেকে এল? এরকম একাধিক ভোলানাথ ছিলেন বাংলাদেশে। কলকাতায় তাঁদের প্রতিভার শেষ সমাধি রচিত হয়েছে। নতুন ধনিক ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর ''কলকাতা কালচারের'' হাওয়ায় তাঁদের প্রতিভার পাপড়ি শুকিয়ে ঝ'রে গেছে মাটিতে। মাটিতে নয়, কলকাতার খোয়াভাঙা শানবাঁধানো পথে।

স্বীকৃতি

'কলকাতা কালচারের' রচনাগুলি যখন ধারাবাহিকভাবে দৈনিক 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তখন সুধী পাঠকগোষ্ঠীর মধ্যে অনেকে আমাকে তাঁদের মূল্যবান মতামত জানিয়ে উৎসাহিত করেছেন। বিভিন্ন দিকে আলোচনার ধারা প্রধানত তাঁদেরই অনুরোধে ও আলোচনার ফলে পরিচালিত হয়েছে। অবশেষে 'কলকাতা কালচার' শেষ হয়েছে 'বটতলায়'। যাঁদের জন্য হয়েছে, তাঁদের কাছে আমি ঋণী। 'যুগান্তর' পত্রিকার সম্পাদক ও কর্মীবৃন্দের কাছে আমার ঋণ পরিশোধ করবার মতন নয়।

এ-ছাড়া বহু গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের কাছ থেকে যে সাহায্য পেয়েছি তাও সবিস্তারে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ও পত্রিকাদির একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দিচ্ছি ঃ

পত্রিকা ও পত্রিকা-সংকলন

W. S. Seton-Karr : Selections from Calcutta Gazettes Vol. I (1784-1788), Vol. II (1789-1797), Vol. III (1798-1805).

Bengal Past and Present.

The Bengal Spectator.

The Calcutta Review (ঊনবিংশ শতাব্দীর)

সংবাদ-প্রভাকর

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

বিবিধার্থ-সংগ্রহ

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সংবাদপত্রে সেকালের কথা (১ম ও ২য় খণ্ড)

ইংরেজী গ্রন্থ ও সংকলন

J. Z. Holwell : Interesting Historical Events (Lond. 1766).

Rev. J. Long : Selections from Unpublished Records (1748 to 1767) relating mainly to the Social Condition of Bengal. (Calcutta 1869).

C. R. Wilson : Early Annals of the English in Bengal. 2 Vols (Calcutta 1895).

W. H. Carey : The Good Old Days of Honorable John Company (1600-1858)—2 Vols. (Calcutta 1906).

Talboy Wheeler : Early Records of British India.

W. Hedges : Travels in India—1780 to 1783 (London 1794).

Rev. W. Ward : A View of the History, Literature and Mythology of the Hindus.

H. H. Wilson : Essays on the Religion of the Hindus (London 1862).

R. M. Martin : The History, Antiquities, Topography and Statistics of Eastern India—3 Vols. (London 1838).

W. W. Hunter : Statistical Account of Bengal, Vol. I

T. Roebuck : Annals of the College of Fort William. (Calcutta 1819).

C. Lushington : The History, Design and Present State of the Religious, Benevolent and Charitable Institutions (1824).

A. Spencer (Edit) : The Memoirs of William Hickey—4 Vols.

M. E. M. Jones : Warren Hastings in Bengal, 1772-74.

J. M. Holtzman : The Nabobs in England—a study of the returned Anglo-Indian, 1760-1785 (N. Y. 1926).

L. Hutchinson : The Empire of Nabobs.

W. H. Sleeman : Rambles and Recollections (Constables Oriental Miscellany, 2 Vols) Edited by V. A. Smith.

Dennis Kincaid : British Social Life in India.

Fanny Parkes : Wanderings of a Pilgrim etc. (London 1850).

J. C. Marshman : The Life and Times of Carey, Marshman and Ward (1859).

G. Smith : The Life of William Carey.

Emma Roberts : Hindostan, with Sketches of Anglo-Indian Society 3 Vols. (London 1835).

An Artist : An Anglo-Indian Domestic Sketch (Cal. 1849).

Craufurd : Sketches chiefly relating to the History Religion, Learning and Manners of the Hindoos (London 1790).

Cotton : Calcutta, Old and New.

Busteed : Echoes from Old Calcutta.

Blechynden : Calcutta, Past and Present.

Lokenath Ghose : Indian Chiefs, Rajas and Zamindars, Vol. II.

Ramgopal Sanyal : A General Biography of Bengal Celebrities (1889).

S. C. Bose : The Hindoos as they are.

N. N. Ghose : Memoirs of Maharaja Nabkissan (Calcutta 1901).

B. Chatterji : A short sketch of Maharaja Sukhomoy Roy Bahadur and his family.

Yule and Burnell : Hobson—Jobson (London 1886 & 1902).

বাংলা গ্রন্থ

সাহিত্য সাধক চরিতমালা ... বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

আবদুল করিম ... বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ

শিবরতন মিত্র ... বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ

বসন্তরঞ্জন রায় ও তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য... বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় .. মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং

কার্তিকেয়চন্দ্র রায় ... ক্ষিতীশবংশাবলিচরিত

বিপিনবিহারী মিত্র ... মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের জীবনচরিত

শিবনাথ শাস্ত্রী ... আত্মচরিত

রাজনারায়ণ বসু ... আত্মচরিত

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ... আত্মজীবনী

ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায় ... বঙ্গীয় নাট্যশালা

সুকুমার সেন ... বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (দুই খণ্ড)

সুকুমার সেন ... ইসলামি বাংলা সাহিত্য

পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাদি

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী ... বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বাংলা পুঁথি (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৪৮শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা)

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী ... পুঁথির শেষ কথা (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৫৭শ বর্ষ, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা)

শ্রীসুকুমার সেন ... বটতলার বেসাতি (বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৩৫)